প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

তৃতীয়াংশ—৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর,

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল

করকমলেষু,

এই পুস্তকের অধিকাংশ রচনা আপনার সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং আপনি আমার প্রবন্ধের বিশেষ অনুরাগী। সেজন্য আপনাকেই শ্রদ্ধাভরে এই পুস্তক অর্পণ করিলাম। ইতি—

সন্ধ্যার কুলায়,
টালিগঞ্জ।

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীকালিদাস রায়

সূচিপত্র

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

তৃতীয়াংশ—৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের এই রাগানুগ ভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারের সময়ে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল যেমন— ১। রামানুজের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মমত। ২। মধ্বাচার্য্যের প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মমত। ৩। বল্লভাচার্য্যের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদ। ৪। নিম্বার্কের প্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব। ৫। রামানন্দ স্বামীর প্রচারিত রামাইত বৈষ্ণবমত ইত্যাদি। নিম্বার্ক ছাড়া দক্ষিণাপথেই এই সকল সাধুসন্তের জন্ম হয়। তাহার ফলে দক্ষিণাপথই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত জন্মভূমি। এই সকল সাধুসন্তের প্রচারিত বৈষ্ণবমত ছাড়া প্রাচীন কাল হইতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আলোয়ার বা আলভার সাধক বলিয়া এক শ্রেণীর বৈষ্ণব তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃষ্ণবেণ্বা ইত্যাদি নদীর তীরে বাস করিতেন। ইঁহারা রাগানুগা (শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে কল্পনা) ভক্তির দ্বারা সাধন ভজন করিতেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত (সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথেই রচিত) গ্রন্থে ঐ শ্রেণীর সাধকদের উল্লেখ আছে।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান সাধনা ভক্তি-মার্গ মূলক নয়, জ্ঞান-মার্গ-মূলক। এই জ্ঞান-মার্গও ক্রমে কতকগুলি বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানপালনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে সেজন্য যাগযজ্ঞেরই প্রাধান্য ছিল। এই আচার-অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব গতানুগতিক স্মার্ত্ত ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হ'ন—মহাবীর ও বুদ্ধদেব। ইঁহারা কর্ম্মমূলক অহিংসাত্মক নৈতিক ধর্ম্ম

আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার করেন। ফলে, আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ঘটে। এই দুই ধর্ম্ম কর্ম্মমূলক, ভক্তিমূলক নয়।

পরে আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, তাহা পৌরাণিক ধর্ম্ম। ইহা ভক্তিমূলক বটে, কিন্তু এই ভক্তি সকাম অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক কাম্য বস্তুলাভের জন্য বহু দেবদেবীর উপাসনা।

এই সময়ে এদেশে ইস্‌লামের প্রাদুর্ভাব হয়। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ ও নিষ্কাম ভক্তিনিবেদন প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজে একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। তখন এদেশে কতকগুলি সাধুসন্তের আবির্ভাব হয়। এই সাধুসন্তগুলির নাম রামানন্দ, নানক, কবীর, দাদু ইত্যাদি। ইহারা ইস্‌লাম ও হিন্দুত্বের মধ্যে একটা সন্ধি স্থা' করেন। ইঁহারা একেশ্বরবাদপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভক্তিবাদ, প্রধানতঃ এক ভগবানে শান্ত বা ভাবের ভক্তি—অর্থাৎ দাস যেমন প্রভুকে সেবার মধ্য দিয়া ভক্তি ক' অক্ষম শক্তিহীন জীব সর্ব্বশক্তিমানকে যে ভাবে ভজনা করিতে পারে, ইহা সেই প্রকারের ভক্তি-সাধনা। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে এই সকল মহাপুরুষের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। ইঁহারা জাতিভেদ মানিতেন না। সকল মানুষই ভগবানের কাছে সমান, মানুষকে ঘৃণা করা মহাপাপ, শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানে কোন লাভ নাই, তাহাতে কেবল মানুষে মানুষে ভেদের সৃষ্টি হয়, মানুষকে কিংবা মূর্ত্তিপ্রতিমাকে পূজা করিয়া কোন লাভ নাই। ইঁহাদের ধর্ম্মমতে এই সকল সত্যের স্থান হইয়াছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মাধবেন্দ্র পুরীকেই নিষ্কাম প্রেমধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর বলিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন 'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।' ইনি বাৎসল্যভাবের সাধনা প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহারই

শিষ্যসেবকগণ গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, ঈশ্বরপুরী, মাধব মিশ্র, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পরমানন্দ, গঙ্গাধর, শ্রীবাস ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যের অগ্রদূতগণ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাবেই এদেশে বৈষ্ণবভাবে সাধনভজন করিতেন। মুরারি গুপ্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন, রামানন্দী সম্প্রদায়ের ভক্ত না হইলেও, রামকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া ইনি উপাসনা করিতেন। যবন হরিদাস প্রেমভক্তির পরম সাধক ছিলেন। মোটকথা, বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের বীজবপনের ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে জ্ঞানমার্গের অনুবর্ত্তী লোকও অনেক ছিলেন। নবদ্বীপ ছিল জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল। এখানে বেদান্ত, যোগ, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠিত ও পঠিত হইত অনেকে মায়াবাদী বৈদান্তিক ছিলেন। সংসার অসার জানিয়া কেহ কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীও হইতেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নানা লৌকিক ধর্ম্মমতও চলিতেছিল। একশ্রেণীর লোকেরা লৌকিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ দেব-দেবীদের পূজা করিত খুব ঘটা করিয়া। এই পূজা ছিল কতকটা ভীতিমূলক—মনসা, শীতলা, চণ্ডী ইত্যাদি দেবীর এবং অন্যান্য বহু দেব-দেবীর পূজা। আর একশ্রেণীর লোক অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিত। ইহারা ধর্ম্মরূপী বুদ্ধদেবের পূজা করিত, বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে নানা প্রকার গুহ্য সাধন করিত, বৌদ্ধ যোগসিদ্ধ পুরুষদের গুরু বলিয়া মানিত। ইহা হইতে গুরু-পূজাও দেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

আর এক শ্রেণীর লোক হিন্দু সেনরাজদের প্রবর্ত্তিত নব বৈদিক ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিত। এই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-প্রধান। স্মার্ত্ত পথের বর্ণাশ্রমী

ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালন করিতেন—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি নিবেদনকেই ধর্ম্ম মনে করিত এবং তাঁহাদের আচার অনুষ্ঠানের সহায়তা করিত।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বেও এদেশে বৈষ্ণবসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কবি জয়দেব জন্মিয়াছিলেন। ইনি পুরীধামে বিবিধ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবতার সংসর্গে আসেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বনে পদাবলী রচনা করেন। এই পদাবলী মিথিলা অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশেও বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। দ্বিজচণ্ডীদাসের বহুপদ রাগানুগা ভক্তিমূলক। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইগুলি সাহিত্য-রসপ্রধান বলিয়াই গণ্য হইত বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবই এই সাহিত্যে প্রেমভক্তিমূলক অভিনব ব্যাখ্যা সংযোগ করেন।

শ্রীচৈতন্য ভাবাবেগমূলক প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, স্বরূপদামোদরের মত দিগ্‌গজ বৈদান্তিক, নিত্যানন্দ, প্রকাশানন্দের মত তত্ত্ববাদী সন্ন্যাসী, রূপসনাতনের মত মুসলমানসংসর্গে আচারভ্রষ্ট লক্ষ্মীসরস্বতীর বরপুত্রগণ, পুণ্ডরীক ও দাস-রঘুনাথের ন্যায় বিলাসী ধনিগণ, হরিদাসের মত মুসলমান নরবেশ—এইরূপ অনেকেই তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হ'ন।

শ্রীচৈতন্য প্রচার করিলেন—কলিযুগে হরিনামই পরিণামের গতি, হরিনামই মহাযজ্ঞ, অন্য কোন যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই। "সর্ব্ব মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম"। ঐহিক ইষ্টসাধনের জন্য দেবদেবীর উপাসনা

ধর্ম্ম নয়, ভয়ে ভক্তিও ভক্তি নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্কাম প্রেমই । ঐহিক কোন ইষ্ট ত নয়ই—পারমার্থিক ইষ্ট, এমন কি মুক্তি-মোক্ষও প্রার্থনীয় নয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তপ, দান, ব্রত ইত্যাদি কোনটাই প্রয়োজনীয় নয়। কেবল চাই প্রেম,—"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।"

ন দানং ন তপোনেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বিত্তং ন বহুজ্ঞতা॥

নরনারীর মধ্যে যে গভীর নিষ্কাম প্রেম এই প্রেম তাহারই ভাগবত রূপ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়রসের আস্বাদন। 'কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ'। নামকীর্ত্তনের মধ্য দিয়াও এই প্রেমকে আস্বাদ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যের মতে উপাস্য নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন—তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান; ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ তিনি। যাঁহা হইতে জীবলোকের উৎপত্তি, যাঁহার দ্বারা তাহা জীবিত এবং যাঁহাতে তাহা প্রাপ্ত হয়—(যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি) এই শ্রুতিবাক্য মানিলে তিনি নির্বিশেষ কিরূপে? সচ্চিদানন্দের চিদংশে সংবিৎ, সদংশে সন্ধিনী, আনন্দাংশে হ্লাদিনী—এই তিন শক্তি বর্ত্তমান। ষড়ৈশ্বর্য্য এই চিচ্ছক্তির বিলাস। অতএব তিনি নির্বিশেষ নহেন।

তিনি মায়াধীশ রূপে ব্রহ্ম, কিন্তু মায়াবশ রূপে জীব। ব্রহ্ম ও জীব মূলতঃ এক হইলেও ব্রহ্মে ও জীবে ভেদ রহিয়াছে। অতএব যাহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বলে শ্রীচৈতন্য সেই মতেরই অনুবর্ত্তী হইলেন।

যে বৈদান্তিক ভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মানে না—তাহাতে

আর শূন্যবাদী বৌদ্ধে তফাৎ নাই। শ্রীচৈতন্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিতেন। *

নির্বিশেষের প্রতি ভক্তি সম্ভবে না—তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াই ভক্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনা সম্ভব। তাঁহাতে ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। বেদে যিনি ইন্দ্রাদি দেবতা, উপনিষদে ব্রহ্ম, সাংখ্যে পুরুষ, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিশাস্ত্রে তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্। তিনি নির্বিশেষ হইয়াও জীবের উদ্ধারের জন্য সবিশেষ, তিনিই ভক্তির দ্বারা উপাস্য। তিনি অন্য যাহাই হউন, জীবের পক্ষে তিনি সবিশেষ ভগবান্। তত্ত্ববিশ্লেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মে এমন কি শূন্যে পরিণত করা যায়, কিন্তু তাহা বুদ্ধির অধ্যবসায় মাত্র, তাহাতে জীবের কল্যাণ নাই। ইহাকে পণ্ডিতেরা বলেন,—জ্ঞানমার্গ, এই জ্ঞানমার্গের সাধনাতেও মুক্তি মিলিতে পারে। কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বড় যে ভক্তির অলৌকিক রসাস্বাদ, তাহা ঐ

* সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে শ্রীচৈতন্য নিজের দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস। হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥

"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে—যাঁহার বশে মায়া তিনি ঈশ্বর, আর মায়ার বশই জীব।

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥

শ্রীবিগ্রহ যে মানে না সেইত নাস্তিক। বৌদ্ধরা বেদ মানে না বলিয়া নাস্তিক আর তুমি বেদাশ্রয়ী হইয়াও নাস্তিক। তোমার বিবর্ত্তবাদ কল্পনা মাত্র।

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর মাত্র। জীবদেহে পরমাত্মবুদ্ধি মিথ্যা॥

পথে নাই। ভুক্তিস্পৃহা থাকিলেও যেমন—মুক্তিস্পৃহা থাকিলেও তেমনি উহা পাওয়া যায় না।

কবিরাজ গোস্বামী এ বিষয়ে একটি উপমা দিয়াছেন—কোন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া কোন দরিদ্রকে যদি বলেন, 'তোমার পিতা প্রচুর ধন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছে—খুঁজিয়া দেখ।' তাহা হইলে দরিদ্রের কোন লাভ হয় না, সে সারা জীবন মাটি খুঁড়িয়াই মরে। কিন্তু তিনি যদি কোথায় সে ধন আছে তাহা বলিয়া দেন, তাহা হইলে দরিদ্র সেই পিতৃ-ধন পাইতে পারে। জ্ঞানমার্গের সাধকরা ভগবানের স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানই দিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহার নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। ধর্ম্মপিপাসু নানা পথে ঘুরিয়া মরে। ভক্তিপথের সাধকই বলিতে পারেন—ইহাই একমাত্র পথ যে পথে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ভক্তিপথে মুক্তি প্রার্থনীয় নয়। মুক্তির জন্য যে ভক্তি তাহাও সকাম ভক্তি। নিষ্কাম ভক্তিতে কি তবে মুক্তি হয় না? মুক্তি আপনা হইতেই আসে।

"প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়।"

বাঙ্গালী পরধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করিত, তাহাদের ধর্ম্মে অধিকার স্বীকার করিত না। শ্রীচৈতন্য যে উদার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন—তাহাতে জাত্যা-ভিমানের স্থান থাকিল না। আচণ্ডাল সকলেরই এই ধর্ম্মে অধিকার জন্মিল। অভিমান ও অসহিষ্ণুতাই মহাপাপ—সেজন্য তিনি 'তরোরিব সহিষ্ণু' ও 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে বলিয়াছেন, অমানীকেও মান দিতে বলিয়াছেন। বৌদ্ধ জৈনদের অহিংসার বাণীও এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাই নামে রুচির সঙ্গে জীবে দয়ারও যোগ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন—"অন্য দেব, অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।" এই উদার ধর্ম্মমতে পরধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার স্থান নাই!

বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে—কোথাও শ্রীচৈতন্য তর্কের দ্বারা দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতেছেন—কোথাও তিনি ঐশ্বর্য্য-বিভূতি দেখাইয়া অবিশ্বাসী বৈদান্তিক বা বিরুদ্ধ-বাদীদের পদানত করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ভাবাবেশময় জীবনে প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়াই সকলে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমকে এই কথাই বলিয়াছেন—

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ। মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাও তার দর্শন ॥
তবুও ঈশ্বরজ্ঞান হয় না তোমার। ঈশ্বরের মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভাবে অনুক্ষণ আবিষ্ট থাকার ফলে তাঁহার মনে হইত, তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ। "অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে" নিমাই নিজেই ভাবাবেশে মাধাই হইয়া যাইতেন। ঐতিহাসিকদের মতে—সম্ভবতঃ ইহা হইতেই সকলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যও ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতেন—আবার 'বাহ্যজ্ঞান' লাভ করিয়া নিজেকে কেবল ভক্ত বলিয়াই জানিতেন ও জানাইতেন। তখন কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। তাহা ছাড়া, এদেশে অসামান্য ভক্ত হইলেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করার একটা প্রবণতাও ছিল! নিত্যানন্দ অনন্তদেব বলভদ্রের এবং অদ্বৈত মহাবিষ্ণু ও মহাদেবের অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের মূর্ত্তিও পূজিত হয়। আজিও অসামান্য ভক্তদের ভগবান বলিয়া পূজা করার পদ্ধতি

চলে। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণকেও ভগবানের অবতার মনে করা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করিয়া ভক্তিসাধক ও ধর্ম্মপিপাসুদের অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইলেন—কিন্তু অনেকে আবার বিরোধিতা করিতেও লাগিল। বঙ্গদেশ তখন মুসলমানের অধিকারে। তাঁহার প্রতি সুলতান হোসেন শা'র ভক্তি ছিল, তবু মুসলমানের অধিকৃত দেশে এই প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পদে পদে বাধা ঘটিতে পারে,—এই আশঙ্কায় হয়ত তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পুরীধামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা তখনও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। তাহা ছাড়া, রাজা ও রাজপুরুষগণ এ ধর্ম্মগ্রহণ করিলে সহজে দেশের মধ্যে এ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। পুরী তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ—জগন্নাথদেবের মন্দির সেখানে, সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মঠ ও আশ্রম সেখানে বর্ত্তমান ছিল। পুরীতে থাকিলে বৈষ্ণবতার জন্ম-ভূমি দক্ষিণাপথের সাধুসন্তগণের সঙ্গে সংযোগ ঘটিবে। এসব কথা তাঁহার মনে থাকিতে পারে।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ভার তিনি তাঁহার শিষ্যসেবক ও পার্ষদগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত বঙ্গদেশেই ছিলেন, পুরী হইতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন এই উদ্দেশ্যে। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন—প্রভুর আজ্ঞায় তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরিয়া প্রৌঢ়বয়সে সংসারী হ'ন। গৃহস্থগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মগুরুকে গৃহস্থ হওয়ার প্রয়োজন- এই সত্য তিনি বোধহয় পরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পুরীতে অবস্থানকালে পুরীর রাজমন্ত্রী দক্ষিণাপথের বিদ্যানগরবাসী রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রী হয়। এই মৈত্রীর ফলে মহাপ্রভুর ধর্ম্মজীবনে একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। নবদ্বীপ-লীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইতেন—রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের ফলে এবং

দক্ষিণাপথের রাগানুগ ভক্তিমার্গের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার জীবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা উভয়ভাবের সমাবেশ ও আবেশ দেখিয়া তাঁহাকে রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত লীলাবতার বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরী হইতে দক্ষিণাপথ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। ইহা ঠিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নয়—দক্ষিণাপথের বৈষ্ণবভক্তগণের বিশেষতঃ আলোয়ার সাধকগণের সহিত ভাবের আদানপ্রদানের জন্যই প্রধানতঃ তাঁহার এই পরিক্রমা। বৈষ্ণব গ্রন্থাদির সন্ধানও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতে তিনি যে রসের আস্বাদ পাইয়াছিলেন—তাহারই পূর্ণাস্বাদ লাভ করাও হয়ত তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর ভক্তসেবক হইলেন। মন্ত্রী রায় রামানন্দ ত তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেনই। সমগ্র উড়িষ্যায় গৌড়ীয় ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে এই যোগাযোগেরও সম্পর্ক আছে।

সম্রাট্ সেকেন্দার লোদীর অত্যাচারে মথুরামণ্ডলে তীর্থযাত্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—বৃন্দাবনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃন্দাবন সত্যই বন হইয়াই ছিল। এই বৃন্দাবনকে আবিষ্কার করিবার জন্য মহাপ্রভু প্রথমে ভূগর্ভ ও লোকনাথ স্বামীকে পরে রূপ ও সনাতনকে তীর্থ উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। রূপসনাতন ও তাঁহার সহযোগী ভক্তগণ বৃন্দাবনকে আবার বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত করেন। বৃন্দাবন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালে এবং তাঁহার তিরোধানের পর দলে দলে বাঙ্গালী বৈষ্ণবসাধকগণ বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালীর সংস্কৃতিও আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে নিত্যানন্দই প্রধান প্রচারক। তাঁহারই প্রয়াসে বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর উপেক্ষিত হিন্দুগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণেরও অধিকাংশ এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ এই ধর্ম্মমন্ত্রে আজিও দীক্ষাদান করেন। আসামে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই বৈষ্ণব ধর্ম্মগুরু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আসামের মণিপুরে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত। বাকি অংশে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম চলিতেছে তাহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব ভাবাবেগময় জীবন, তাঁহার সাধনা ও বাণী বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব্ব রূপ দান করিয়াছে। পরাধীন দেশের ত কথাই নাই, কোন স্বাধীন দেশে কোন ধর্ম্মগুরু, কোন জাতির অদৃষ্ট-বিধাতা দিগ্‌বিজয়ী বীর বা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাংলার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের মত সাহিত্য সৃষ্টির এমন উর্জ্জিতা প্রেরণা দান করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যকেই বুঝায়। পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের তিনভাগ তেমনি রাধা এবং 'রাধাভাব-দ্যুতি-শবলিত' গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেমাশ্রু-জল। ইহার দুইটি ধারা। একটি ধারায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সহচর ও অনুবর্ত্তীদের জীবন ও সাধনার কথা বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। অন্য ধারার নাম 'পদাবলীসাহিত্য'। এই পদাবলী সাহিত্যের দুইটি শাখা। একটি শাখা গৌরাঙ্গদেবের জীবনের লীলামাধুর্য্য অবলম্বন করিয়া রচিত—আর একটি শাখা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রসাদর্শে বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে আবিষ্ট কবিগণের মধ্যে—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরহরি, নরোত্তম, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, উদ্ধব দাস, যদুনন্দন, রায়শেখর, কবিরঞ্জন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম বঙ্গসাহিত্যে যে রসের বন্যা আনিয়াছিল তদ্ভব উর্ব্বরতা আজিও নষ্ট হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব মন্দীভূত হয়। সমাজে কেবল ব্রাহ্মণরাই শ্রদ্ধেয় থাকিলেন না, ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবরাও শ্রদ্ধেয় হইলেন। এমন কি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধযুগের শ্রমণভিক্ষুদের মত বৈষ্ণবদের সেবাও গৃহীর ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইল। হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রদের ব্রাহ্মণরাও ভক্তি করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেতর জাতির ভক্তবৈষ্ণবরাও গুরুর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন —উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁহাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দেশে জাত্যভিমানের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইল। অস্পৃশ্য বলিয়া নিম্ন-শ্রেণীর লোকে আর পূর্ব্বের মত ঘৃণিত হইত না। দেশে সঙ্গীতের দ্বারা উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাতে সঙ্গীতকলারও চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। নামসংকীর্ত্তন ও পদাবলী-কীর্ত্তন ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল। হিন্দুর বহু অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে নামকীর্তন অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিল। বৎসরের নানা তিথিতে নানা উপলক্ষে বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে নগর-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল—আজিও সে প্রথা চলিতেছে। আপামর সাধারণ সকলেরই যে এই ধর্ম্মে সমান অধিকার—নগর-সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজিও ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই এই নগরকীর্ত্তনে যোগ দিয়া এককণ্ঠে শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকে —জাতিভেদের কথা এই সমবেত উপাসনায় সকলে ভুলিয়া যায়—কীর্ত্তন গায়কদের চরণপাতে পবিত্র পথের ধূলি ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির লোক ভক্তিভরে মাথায় তুলিয়া লয়।

গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্চ বৈষ্ণবতার চিহ্ন বহন করিতেছে। রাস,

দোল, ঝুলন, রথযাত্রা ইত্যাদি উৎসবের ঘটা শ্রীচৈতন্যের পর বাড়িয়া গিয়াছে। দাস্য-বাৎসল্যময়ী দেবসেবার সঙ্গে অতিথিসেবা, অন্নকূট, অনাথ আতুরদের অন্নদান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান সংযুক্ত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ প্রভু যে অভিনব বৈষ্ণবসমাজ গঠন করেন—তাহাতে জাতিভেদ ছিল না—সকল জাতির লোকই সে সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত। ফলে, বৈষ্ণবজাতি বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতিরই সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাতির বৃত্তি, গৃহে গৃহে হরিনাম শুনাইয়া ভিক্ষা। নিত্যানন্দ যে সর্ব্বজাতির সমন্বয়ে বাঙ্গালী জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

কালক্রমে বৈষ্ণবসমাজের অধঃপতন হইল। গোস্বামী গুরুগণ অভিনব আভিজাত্যের সৃষ্টি করিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে গোস্বামিত্বের সংযোগ হইল—সেখানে আভিজাত্যের অহমিকা দ্বিগুণিত হইল। ইহা অর্থ ও ভোগ্যবস্তুর আহরণের অভিনব পন্থায় পর্য্যবসিত হইল। বৈষ্ণবগুরুগণ ভোগবিলাসী হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণবের আখড়াগুলি নৈতিক অধঃপতনের আস্তানা হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব-তীর্থগুলিতেও নানাবিধ পাপ প্রবেশ করিল। হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্-ভাগবতের ব্যাখ্যা, রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দান ইত্যাদি অভিনব ব্যবসায়ের মূলধন হইয়া উঠিল। বহু লোকই গুরুগিরির নামে এবং দেবালয়কে আশ্রয় করিয়া অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিতে লাগিল। ফলে বৈষ্ণবতা অধঃপতিত হইয়া দেশের কর্ম্মোদ্যম শ্রমশক্তি, পৌরুষ, তেজস্বিতা ও স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তিকে বহুল পরিমাণে মন্দীভূত ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে।

বেশিদিন পরে নয়, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলেই অধঃপতনের সূত্রপাতের আভাস ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবধর্ম্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম *

ভক্তিমার্গীয় সাধনার লীলাভূমি দক্ষিণাপথে। আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তে স্মার্ত্তধর্ম্মেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ড প্রবল হইয়া ক্রমে জ্ঞানকাণ্ডকেও গ্রাস করিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম ক্রমে যাগ-যজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বহু দেবদেবীর শাস্ত্রসম্মত উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড নিষ্প্রভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নূতন কর্ম্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। দশশীলসম্মত নৈতিক সদাচরণই বৌদ্ধমতের ধর্ম্মসাধনা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনে নানাপ্রকার তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর সাধনা ও নানাপ্রকার আত্মনিগ্রহের দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার জন্য যে সকল যোগীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভও করিতেন—তাঁহারাই সাধারণ লোকের উপাস্য ও গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধমতের প্রভাবে একপ্রকার তান্ত্রিক সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইরাছিল।

ইঁহারা সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্ম্মজীবনের সর্বপ্রকার সংস্কার হইতে মুক্তি লাভকেই নির্বাণলাভের উপায় ও সহজ আনন্দ উপভোগকে মুক্তিজনিত মহাসুখবাদের পূর্বাভাস বলিয়া ঘোষণা করিতেন। প্রাচীন

* এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীমন্ মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি সংকলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে সে কিছু কিছু সহায়তা পাইয়াছি। তজ্জন্য ঋণ স্বীকার করিতেছি—লেখক।

বঙ্গ সাহিত্য এবং অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

দক্ষিণাপথে জ্ঞানমার্গের যে প্রাধান্য হয় নাই তাহা নহে—স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যইত দক্ষিণাপথে জন্মিয়াছিলেন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানও দক্ষিণাপথে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজিও সে দেশে স্মার্ত্ত ও শাক্ত, শৈব ও পঞ্চোপাসক লোকের অভাব নাই। তামিল নাইডু ব্রাহ্মণরা আজিও অক্ষরে অক্ষরে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করেন। বৌদ্ধপ্রভাব দক্ষিণাপথে পূর্ণরূপে আপতিত হয় নাই। দক্ষিণাপথে সকল প্রকার ধর্ম্মসাধনাই অবাধ প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত সাধনাকে ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ভক্তিধর্ম্ম। যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ ভক্তিধর্ম্মের বেদ—তাহা দক্ষিণাপথেই রচিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

জ্ঞানমার্গ যেমন আর্য্যদের নিজস্ব, ভক্তিমার্গ তেমনি দ্রাবিড়জাতির নিজস্ব মুখ্য পথ। কালক্রমে আর্য্যগণ দ্রাবিড়-ভক্তিধর্ম্মের দ্বারা ও দ্রাবিড়গণ আর্য্যগণের জ্ঞানধর্ম্মের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড়জাতির মধ্যে আলোয়ার নামক একশ্রেণীর সাধক জন্মিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে রাগানুগ বৈষ্ণবসাধকদের উল্লেখ আছে—তাঁহারাই ইঁহারা। ইঁহারা কেবল ভক্তিমার্গের সাধক-মাত্র ছিলেন না, ইঁহারা ভক্তিরসকে মধুর বা উজ্জ্বল রসে পরিণত করিয়া ভক্তিমার্গের চরম লক্ষ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে মধুর ভাবের সাধনা গৌড়বঙ্গে প্রচার করিয়াছেন—ইঁহারা অতি প্রাচীনকালেই তাহা অধিগত করিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় ইঁহাদের যে রসসাহিত্য আছে—তাহা পাঠে দেখা যায় ইঁহারা ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ

জীবাত্মাকে নায়িকা রূপে কল্পনা করিয়া মধুররসের সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সাহিত্য তামিল-ভাষায় রচিত বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। ইঁহারা যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে দক্ষিণাপথে বৈদিক স্মার্ত্তধর্ম্মের বড়ই প্রভাব—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই শৈব। ইঁহারা নীচ দ্রাবিড় জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ ইঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই—কিন্তু অব্রাহ্মণ্যসমাজ ইঁহাদিগকে অবতার বলিয়া মনে করিয়া ঐ ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যসমাজ এই রসসাধনাব ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণ্য-সমাজের উপর ইঁহাদের প্রভাব-সম্পাত হইয়াছিল। বেদবেদান্তের সহিত ভক্তিসাধনার সামঞ্জস্য-সাধন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সামঞ্জস্য-মিলনেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সৃষ্টি। আলোয়ারদের তামিল ভাষায় রচিত রস-সাহিত্য সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃতে আভিজাত্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিল।

ঐ আলোয়ার সাধকগণের মধ্যে শঠকোপ ছিলেন অগ্রগণ্য। পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্রীরঙ্গাচার্য্য বা নাথমুনি নামে একজন সাধক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিচিনপল্লীর নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ইনিই শঠকোপের ভক্তিরসাত্মক রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া আলোয়ার সাধকদের সমস্ত রচনা সংগ্রহ করেন,—শঠকোপের বৈষ্ণব-দর্শন বা 'দ্রাবিড়বেদ'কে আর্য্যসমাজে প্রচার করেন এবং ইঁহারই চেষ্টাতেই আলোয়ারদের স্তোত্রাবলী শ্রীরঙ্গমে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আবৃত্ত ও গীত হইতে থাকে। এই নাথমুনির পুত্র ঈশ্বরমুনি—ঈশ্বরমুনির পুত্র

যামুনাচার্য্য। ইনি দক্ষিণাপথে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই যামুনাচার্য্যের শিষ্য শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজ।

এই যামুনাচার্য্যই শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ভগবানের চিদ্‌বিগ্রহত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যামুনাচার্য্য হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎপত্তি। ইঁহার উপর আলোয়ার সাধকগণের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। সেজন্য ইনি কেবল বৈধী ভক্তি নয়—রাগানুগা ভক্তিরও প্রচারক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের সহিত ইহার মিল ছিল বলিয়াই রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে, জীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার স্তোত্রাবলী হইতে স্ব স্ব রসধর্ম্মের পোষকতার জন্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রামানুজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মান্দ্রাজের চেঙ্গপৎ জেলায় শৈবব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজ শৈব ব্রাহ্মণ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদান্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি মায়াবাদে আস্থা রাখিতে পারেন নাই। কেবল তিনি বৈষ্ণব যামুনাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন বলিয়া নয়—তাঁহার গুরুভাই কাঞ্চীপূর্ণের পূর্ণ প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। এই কাঞ্চীপূর্ণ হীন দ্রাবিড়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সে সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, শঠকোপের রচিত শঠারিসূত্র তাঁহার ধর্ম্মমতের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

শঙ্করের ব্রহ্মকে রামানুজ ভক্তের ভগবান করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়, তাঁহার রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। এই শ্রীভাষ্যে তিনি অপ্রাকৃত রূপগুণযুক্ত অদ্বৈত ঈশ্বরকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিদানস্বরূপ

স্বীকার করেন। তাঁহার দার্শনিক মতকে তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। বেদান্তের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া তিনি বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীভাষ্যে তিনি শঙ্করের মায়াবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন এবং অনেক শৈব ও বৌদ্ধ তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেন।

রামানুজসম্প্রদায়ের দুইটি শাখা, একটি শাখা আচারী—আর একটি রামানন্দী। আচারী সম্প্রদায় বর্ণাশ্রমী—স্মার্ত্তমতের সহিত বৈষ্ণবমতের সমন্বয়ে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। আর একটি সম্প্রদায় তাঁহার প্রশিষ্যের প্রশিষ্য রামানন্দ স্বামীর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইল। আচারীরা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক—রামানন্দী সম্প্রদায় রামসীতার উপাসক।—ইঁহারা রামকেই ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, এবং জাতিভেদ মানিতেন না। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে তুলসীদাসের রামায়ণ আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বহু উপসম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্ত ছাইয়া ফেলিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিল। কবীরপন্থী, রুইদাসীপন্থী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাদূপন্থী, রামসেনেদী ইত্যাদি শাখার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কোন কোনটিতে মুসলমান প্রভাব সম্পাতিত হওয়ায় বিষ্ণু বা রামের বদলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্থান হইয়াছে। শ্রীসম্প্রদায়ের আচারী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে সেজন্য বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গৃহস্থ অনেক ছিল। রামানন্দী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশে যে জাতিভেদের শিথিলতা ঘটিয়াছিল তাহা বৌদ্ধ প্রভাবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিসাধনার তুলনায় এবং আলোয়ার বৈষ্ণবদের ঐকান্তিকী রাগানুগা ভক্তিধর্ম্মের তুলনায় শ্রীসম্প্রদায়ের শান্তদাস্যভাবের ভক্তিধর্ম্ম অনেক নিম্নস্তরের। এই ভক্তিধর্মের প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সঙ্গে বরং মাধ্ব সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্বাচার্য্য মান্দ্রাজে পাপ-নাশিনী নদীর তীরে উডুপকৃষ্ণ নামক গ্রামে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—তাহাকে মাধ্বসম্প্রদায় অথবা ব্রহ্মসম্প্রদায় বলা হয়। এই সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, এই সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। মধ্বাচার্য্য জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে বড় করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সম্পর্ককে ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক বলিয়াছেন, শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া অবশ্য তিনি স্বীকার করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাথমিক ধর্মমত এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের দ্বারা পরিকল্পিত। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধকগণের জীবনে অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মমতের ছায়পাত হইয়াছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্য ঐ সম্প্রদায়ের যে সকল সাধকদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন তাঁহারা ভক্তিপথে বহুদূর অগ্রসর। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোক—তাঁহারই শিষ্য অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও ঈশ্বরপুরী। এই ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার গুরু। কেশবভারতীও মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক—ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসদীক্ষার গুরু। মেঘদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীকৃষ্ণভ্রমে ভাবাবেশ হইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

'ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর।'

ঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবাবেশ দেখিয়াই গয়ায় নিমাই পণ্ডিতের মনে প্রেমভক্তির প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল—ঈশ্বরপুরীকেই মহাপ্রভু প্রেমভক্তির

গুরু বলিয়া ভক্তিভরে পুরীর জন্মভূমি কুমারহট্টের মাটি তুলিয়া বহির্বাসের অঞ্চলে বাঁধিয়াছিলেন। অদ্বৈত পূর্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

'পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমুল বিকাশিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তিকল্পতরুর যে নয়টি মূলের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক। অতএব দেখা যাইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের একটি শাখা অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠাকে পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবকে মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধক বলেন, মাধ্বসম্প্রদায় না বলিয়া বরং 'মাধবসম্প্রদায়' বলা যাইতে পারে। কারণ, মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যের যোগসূত্র।

আর একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম 'রুদ্রসম্প্রদায়'। ইহার প্রবর্ত্তক বিষ্ণুস্বামী। ইনি বাৎসল্যভাবের সাধনারও প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার সম্প্রদায়ের দর্শনমত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, উপাস্য বালগোপাল। পরে সাধনার রসের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মীরাবাই এই সম্প্রদায়ের উপাসিকা। শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদনই এই ধর্ম্মমতের মূলসূত্র। এই সম্প্রদায়ের একজন সাধকের নাম ছিল বল্লভাচার্য্য। ইনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন। কথিত আছে ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক ছিলেন এবং ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ইঁহাকে খুব মানিতেন। বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের মহিমা ঠিক বুঝে নাই—তাঁহারা নানাস্থলে মঠমন্দির গড়িয়া বহু শিষ্যসেবক সৃষ্টি করিয়া গুরুগিরি করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। শিষ্যেরাও ধনসম্পদ গুরুচরণে নিবেদন করিয়াই ধন্য হইতেন এবং খুব ঘটা করিয়া উৎসবাদি সম্পাদন করাকেই ধর্ম্মকার্য্য মনে করিতেন। এই সকল গোস্বামীদিগকে 'পুষ্টিমার্গী' বলে—পশ্চিম ভারতেই ইঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল।

আর একটি সম্প্রদায় আছে তাহার নাম নিম্বার্কসম্প্রদায়। নিম্বার্ক উত্তর ভারতেরই লোক এবং সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্ম্মমত শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে কিংবা পরে প্রচারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীচৈতন্যের পুরীধামে বাসকালে তাঁহার ভক্তিধর্ম্মের ও ভজনপদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণাপথের মিলনভূমি ছিল নীলাচল বা জগন্নাথ-ক্ষেত্র। দক্ষিণাপথের সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল পুরীধামে। পুরীধামে আসিয়া তাঁহার অদ্বৈতভাব অচিন্ত্য-ভেদাভেদে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন—তারপর নবদ্বীপলীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া দাস্য ও সখ্য ভাবের ব্রজলীলার মাধুরী উপভোগ করিতেন। পুরীধামে কিছুকাল বাসের পর তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন—আবার নিজের মধ্যেই কৃষ্ণেক পাইয়া দিব্যানন্দে মগ্ন হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের মাথুরপ্রবাসের পর শ্রীরাধিকার যে দশা পদাবলীসাহিত্যে দেখানো হইয়াছে—সেই দশায় আবিষ্ট হইয়া তিনি দিব্যোন্মাদ লাভ করিতেন। পদাবলী

সাহিত্যে শ্রীরাধিকা যেমন ভাবসম্মেলনে উল্লসিত হইতেন—সেইরূপ উল্লাস তিনিও উপভোগ করিতেন।

এই মহাভাবাবেশ, ভাবের ক্রমোন্মেষের নিয়মানুসারে স্বাধীনভাবে যে তাঁহার জীবনে প্রবুদ্ধ হইতে পারে না—একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে মনে হয়—দক্ষিণাপথভ্রমণের ফলেই তাঁহার জীবনে উজ্জ্বলরসের মহাভাবাবেশ প্রকটিত হইয়াছে। রায় রামানন্দ ছিলেন দক্ষিণাপথের লোক, প্রতাপরুদ্রের উপরাজ ও পরে মন্ত্রী। তিনি একজন মহাভক্ত ও বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার জীবনে দক্ষিণাপথের আলোয়ার সাধকদের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। অন্ততঃ তিনি তাহাদের সাধনমার্গের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গোদাবরীতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিজীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, একথা কেহ কেহ বলেন। *

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

* বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম রসতত্ত্ব সম্বন্ধে রায় রামানন্দের পরিপূর্ণ জ্ঞানই ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ভোগী বিষয়ী বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রনেতা শ্রেণীর লোক। তাঁহার জীবনে ঐ তত্ত্ব চরম সার্থকতা লাভ করে নাই—তিনি বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে অসামান্য অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া তিনি সেই তত্ত্বের বীজ বপন করিয়া তাহার ফল দেখিয়া স্তম্ভিত বিমুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন "রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র।" পরে সত্যই ভক্তিধর্ম্মের আদর্শে দুইজনের মধ্যে তফাৎ ছিল না—দৈহিক জীবনেই তফাৎ ছিল অনেকটুকু। রামানন্দ রায় যেন বাংলার নবযুগের রামমোহন রায়েরই তুল্য। দুইজনেরই intellectual realisation হইয়াছিল। রামমোহনে আর ঠাকুর রামকৃষ্ণে এ যুগে যে তফাৎ, সে যুগে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সেই তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয়।

"প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব বস্তু তত্ত্ব সেই মোর জ্ঞানে।
এবে যে জানিল সাধ্যসাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।"

শ্রীচৈতন্যের স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যের কথা বাদ দিলেও চরিতামৃতের এই চরণগুলি পড়িলে মনে হয়,—মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তিধর্ম্মের দশান্তরের জন্য রামানন্দের কাছে ঋণী। যাহাই হউক এই সাধ্য সাধন-তত্ত্ব দুইজনের মধ্যে আলোচনার দ্বারা উন্মেষিত হইয়াছে —ইহা জীবন্ত রূপলাভ করিয়াছে একমাত্র মহাপ্রভুর জীবনে। এই তত্ত্বের সূত্রকার 'স্বরূপ দামোদর' ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন ব্রজের গোস্বামিগণ। রঘুনাথকে বলা হইয়াছে বৃত্তিকার। কবিরাজ গোস্বামী সেই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকে কবিকর্ণপূরের প্রবর্ত্তিত নাটকীয় ভঙ্গীতে মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া ক্রমোৎকর্ষের স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত 'সার' ও ইংরাজি Climax অলঙ্কারে রচিত চরিতামৃতের ঐ অংশ জগতের সাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব বস্তু। প্রেমভক্তির যে চমোৎকর্ষের কথা কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—তাহার অধিকারী বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র শ্রীরাধা, জগতের ইতিহাসে একমাত্র শ্রীচৈতন্য।

রামানন্দের কথা ছাড়িয়া দিলেও—দক্ষিণাপথভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য বহুশ্রেণীর সাধকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জীবনে মধুররসের সাধনার ধারা ও মহাভাব-তন্ময়তার বিলাস নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি যাহা সন্ধান করিতেছিলেন তাহাই পাইয়া ছিলেন। দক্ষিণাপথে মহাপ্রভু ধর্ম্মপ্রচার করিতে নিশ্চয়ই যান নাই, —তাঁহার নিজের দেশ মহাপাপে দগ্ধপ্রায়—যে দেশের ধর্ম্মের গ্লানির

জন্য প্রধানতঃ তাঁহার অবতরণ সে দেশকে ফেলিয়া, যে দেশে সকলপ্রকার ধর্ম্মমতের চরম বিকাশ, সেই দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইবার কথা নয়। তিনি জানিতেন—সকলশ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্ম্মমত দক্ষিণাপথেই জন্মিয়াছে—সে দেশে বহু বৈষ্ণবসাধক আজিও বর্ত্তমান। দক্ষিণাপথ এক হিসাবে তাঁহার কাছে মহাতীর্থ। সেই তীর্থপরিক্রমা, সাধক ভক্তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, নব নব ভাবরস-সংগ্রহ ইত্যাদি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, ও বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নিশ্চয়ই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঐশ্বর্য্যশিথিল ভাবে পরিপূর্ণ—তবু তিনি বোধ হয় তাহাও উপভোগ করিতেন। নবদ্বীপলীলায় ইহা সহ্য করা চলিত—নীলাচলে এই রসাভাসমূলক রচনা তাঁহাকে আনন্দ দিত কি? বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐশ্বর্য্যভাব নাই বটে, কিন্তু ভক্তির বা প্রেমের গভীরতাও নাই। তবে বিদ্যাপতির সাহিত্যপ্রধান রচনায় সম্ভবতঃ তিনি মধুররসের ব্যঞ্জনা লাভ করিতেন। দক্ষিণাপথে প্রকৃত মধুররসের বহু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চয় তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এবং বোধ হয় তিনি অবিমিশ্র মাধুর্য্যরসের বহু রচনার সাক্ষাৎ লাভও করিয়াছিলেন। যে কোন ভক্তিরসের রচনা পাইলেই স্বরূপদামোদরের দ্বারা পরীক্ষিত হইলে তিনি তাহার পাঠ শুনিতেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—এই পুঁথি দুইখানি পাইয়া তিনি নকল করাইয়া আনিয়াছিলেন। তামিলভাষায় রচিত আলোয়ারদের পুস্তক নকল করিয়া আনা হয় নাই—সম্ভবতঃ তাহার মর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

যে গভীর আকুতির জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমজীবন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত বঙ্গসাহিত্য অপূর্ব্ব—সেই গভীর আকুতি পরিপূর্ণরূপেই আলোয়ারদের রচনায় বর্ত্তমান ছিল। চৈতন্যদেব রসের সন্ধানে দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিলেন. আর ঐ চমৎকার সম্পদটি তাঁহার চোখে পড়িল না বা মর্ম্মস্পর্শ করিল না ইহা হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের মূলতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলসূত্র যাঁহারা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন তাঁহাদের ছয় জনের মধ্যে চারিজনের সহিত দক্ষিণাপথের সম্পর্ক। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রনিবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট ত দক্ষিণাপথেরই লোক ছিলেন—আর রূপ, জীব ও সনাতন গোস্বামীর পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথের কর্ণাটদেশ হইতে বঙ্গদেশ আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা বংশধারায় দক্ষিণাপথের সংস্কৃতি নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের আগে হইতেই ইঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের চিত্ত পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া অসামান্য প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একটা দাক্ষিণাত্য রসধারা ইঁহাদের বংশধারায় নামিয়া আসিয়া গৌড়ীয় রসধারায় মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়—শুধু রসধারা নয়, সংস্কৃতির ধারাও যেন বিদেশাগত বলিয়া মনে হয়। আর গোপালভট্টের সাহচর্য্যে তাঁহারা কতটা যে পাইয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। তবে জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ, যাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের গীতা,—তাহার বক্তা গোপাল ভট্টই, জীবগোস্বামী ব্যাখ্যাতা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যের বাণী

শ্রীচৈতন্যদেব যে অলৌকিক প্রেম ভক্তিসাধনা তাঁহার জীবনে প্রকটিত করিয়াছিলেন—তাহা কেবল অধিকারীদের জন্য। জনসাধারণের জন্য তিনি সহজ সরল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ লোককে বলিয়াছিলেন—যাগযজ্ঞ করিতে হইবে না, মূর্ত্তিপূজা করিতে হইবে না, শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, তীর্থদর্শনাদি করিতে হইবে না, কেবল হরিনাম কর। মুক্তি চাও? তাহাতেই মুক্তি হইবে। খোলা বেচা শ্রীধর, ভিক্ষুক শুক্লাম্বরই ত আদর্শ ভক্ত। ইঁহারা জীবমুক্ত মহাপুরুষ। এই হরিনামে দ্বিজোত্তম হইতে চণ্ডালাধমেরও সমান অধিকার। মানুষমাত্রেরই ধর্ম্ম এক, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, কলিযুগে নামকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম। নামজপ, নামানুরাগ, নামশ্রবণ, নামগান—এই নামকীর্ত্তনের অঙ্গ। 'কলিযুগে নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

ইহা শ্রীচৈতন্যের বাণী হইলেও ইহা শাস্ত্রেরও উক্তি। ভাগবত ইহাকেই নামযজ্ঞ বলিয়াছেন। এই নামগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন পাত্রাপাত্র-বিচার নাই, তেমনই কালাকালবিচার নাই, সব সময়েই নামগ্রহণ করা চলে। নাম গ্রহণে স্থানাস্থানবিচার নাই—সকল স্থানেই নাম গ্রহণ করা চলে। ভক্তির সহিত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে নামগ্রহণের প্রকৃত অধিকার জন্মে। ভক্তিই মানুষকে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু ও অমানিনে মানদ করিয়া তুলে। এইভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে নামগ্রহণের ফল হয়।

নামগ্রহণ চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে, নির্ম্মল চিত্তদর্পণে সত্য পরিচ্ছন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়, সংসারযন্ত্রণার যে দাবানলে আমরা পরিবৃত

তাহা নির্ব্বাণ লাভ করে। জ্যোৎস্না যেমন কুমুদকে বিকশিত করে—শ্রেয়ঃ তেমনি আমাদের চিৎকুমুদ উন্মীলিত করে। তাহাতে পরাবিদ্যার উন্মেষ হয়, হৃদয়ে দিব্যানন্দ উদ্বেলিত হয়, প্রতিপদে অমৃতের আস্বাদলাভ হয়, মনঃপ্রাণ প্রেমানন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জয়যুক্ত হয়।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনপরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

সংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও এই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া উঠিতে পারেন। তখন কর্ম্ম হইবে ফলস্পৃহাশূন্য, ভোগও হইবে কামনারহিত। তখন তাহার প্রার্থনা হইবে।—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

এই নামমাহাত্ম্যের কথা যবন হরিদাস যাহা বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যেরও বক্তব্যও তাহাই—

"কেহ কহে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ কহে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।"

হরিদাস বলেন—নাম হৈতে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়। পাপনাশ ও মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক ফল। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে অন্য কাম্য বস্তুর ত কথাই নাই, মুক্তিও তুচ্ছ।' "সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে।" শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণ যাঁহারা কেবল নামের পথে ভজন করিতেন—তাঁহাদের বরপ্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ, জীবনের কাম্য,— কৃষ্ণপদে ভক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নাম-পথ কম ত্রুরূহ নয়। কিন্তু কর্ম্মপথ বা জ্ঞানপথের চেয়ে অনেক সোজা। তাহা ছাড়া, কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথ সর্ব্বজনীন নয়। নাম-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভক্তিপথ ঐ সকল পথের তুলনায় সরলতর। ঐ পথে গৌড়জনকে লইয়া যাওয়ার জন্য তিনি নিত্যানন্দের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিপথে অগ্রসর অন্তরঙ্গ সহচরদের জন্য যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা রসসাধনার পথ। এইপথে তিনি নিজে ভাগবত জীবনকে চরম চরিতার্থতা দান করেন।

মানুষের সহিত মানুষের কয়েকটি রসসম্পর্ক আছে—এই গুলির নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যখন আমরা কাহারো ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, শক্তিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া দূর হইতে ভক্তি জানাই, তখন হয় শান্তভাব। যখন কোন ভক্তির পাত্রকে নিকটে পাইয়া আমরা দাসের মত সেবা কবি, তখন হয় তাহা দাস্যভাব। সখার প্রতি সখার যে অসঙ্কোচ সাম্য-ভাব তাহা সখ্যভাব। সন্তানের প্রতি মাতাপিতা অথবা অন্য কাহারো যে স্নেহ বা অনুকম্পার ভাব তাহাই বাৎসল্যভাব। আর প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার, পতির প্রতি পত্নীর যে মনোভাব তাহাই মধুর ভাব। শ্রীভগবানের প্রতি জীবেরও এই পাঁচ প্রকার রসসম্বন্ধ হইতে পারে—এই রসসম্বন্ধের মধ্য দিয়া ভগবানের প্রতি প্রেমই রসরাজের উপাসনা বা রসসাধনা। শান্তভাবকে প্রেমভক্তির প্রাথমিক সোপান বলা হইল—কিন্তু ধর্ম্মসাধনার পথে ইহাও অনেক উচ্চে অবস্থিত। বহু সোপান অতিক্রম করিয়া এই শান্তভাবের স্তরে আরোহণ করা যায়।

রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন হইতে সকল ভাবের স্থান ও স্তরপরম্পরা—নির্ণীত হইয়াছে।

প্রভু কহে কহ শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ ভক্তিসাধ্য হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর॥
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর॥
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার॥

যাঁহারা বর্ণাশ্রম পালন করেন, স্মার্ত্তপথে জাতিবর্ণ সমাজ ইত্যাদির বিহিত আচার ও কৃত্য সাধন করেন, তাঁহারাও ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহারা বহু নিম্নস্তরের ধর্ম্মাচারী। যাঁহারা ঐ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, তাঁহারা ইহাদের চেয়ে অগ্রসর। কর্ম্মফলের দায়িত্ব হইতে মুক্তিই

ভক্তি নয়। জাতিকুলসমাজবিহিত ধর্ম্ম একটা সংস্কারবন্ধন—যেজন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনাকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে করে—সে আরো অগ্রসর। কিন্তু "সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষের" জন্য অথবা ত্রিতাপের বিনাশের জন্য এই উপাসনা, ইহাও সকাম বলিয়া আসল ভক্তি নয়। এই যে উপাসনা, তাহা যে-ভক্তির সহিত সম্পাদিত হয়, সেই ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রা হয় অর্থাৎ ভক্তির মূলে যদি কোন যুক্তি মনে বিরাজ করে তবে ভক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী উপাসকের চেয়ে আরো উন্নত। কিন্তু এই ভক্তি নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ভগবৎ-তত্ত্বানুভূতি-জাত নয়, কাজেই তাহা বাহ্য। এই ভক্তি যদি জ্ঞানযুক্তি-শূন্য হয় অর্থাৎ নির্বিচারে অন্ধভাবে যদি ভক্ত ভগবানকে ভক্তি করে তবে সে উন্নততর স্তরের সাধক। নির্ভেদ ব্রহ্মোপলব্ধির প্রয়াস না করিয়া যাঁহারা সাধু সন্ত ও ভক্তগণের উপদেশে, সাহচর্য্যে ও ভগবদ্ গুণগান শ্রবণে ভাগবত মাধুর্য্য আস্বাদ করেন, তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা বা বৈধী ভক্তির চেয়ে বড়। এই ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে প্রিয়-জ্ঞান হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়—ইহাই শান্তভাব। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সাধকগণ সাধারণতঃ বিবিধ উপচারে ইষ্টদেবের পূজা করিয়াই ভক্তি প্রকাশ করে। ইহার চেয়ে শান্ত ভাবের সাধনা ঢের বড়। তাহাতে বিনা বাহ্য উপচারে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই উপাসনা। এই ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব হইতে উন্নততর, কিন্তু ব্রজভাবের পক্ষে নিম্নতর, ইহাকে অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মের উপক্রমণিকার স্তর বলা যায়।

প্রেমধর্ম্মের প্রথম স্তর দাস্য, এই দাস্য শান্তভাবের উপরে অবস্থিত। ভগবান ইহাতে রীতিমত অন্তরঙ্গ প্রিয়জন—তবে সেবাপরিচর্য্যার দ্বারা দাস্যভাবে প্রেমনিবেদন করিতে হয়। ইহার চেয়ে

উচ্চতর স্তর সখ্যভাব—এইভাবে প্রিয়জন আরো প্রিয়তর। ইহাতে ভগবানের লীলায় সহযোগিতার দ্বারা প্রেমনিবেদন করিতে হয়। তদুপরিস্থ স্তর বাৎসল্যভাবের; লালনের দ্বারা এইভাবে প্রেম নিবেদিত হয়। সর্ব্বোচ্চ স্তরে বিরাজ করিতেছে মধুর ভাব। এই-ভাবে ভগবান প্রিয়তম—কান্তার সঙ্গে কান্তের যে নিবিড় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের। *

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার জরাশ্লথ ছন্দোবন্ধে আসল কথাটা বলিয়াছেন এইভাবে—

> কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুইগুণ।
> পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবীণ।
> কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
> পূর্ণৈশ্বর্য্যে প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে!
> ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর।
> সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
> শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
> অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ॥
> শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
> দাস্যের সংভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
> কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
> কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥

* ভগবানের অনুকল্প কোন প্রতীককে অবলম্বন করিয়াও এই সকল ভক্তিভাবের অনুশীলন চলিতে পারে। মীরাবাই, মাধবেন্দ্রপুরী, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি ভক্তগণ এক একটি মূর্ত্তি প্রতীক আশ্রয় করিয়াই এই সকল ভাবের দ্বারা ভজনা করিয়াছেন।

বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্তের সেবন।
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সনা ব্যবহার॥
আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণে নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্যে হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করান সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥
পূর্ব্বের রসের ভাব পরে পরে হয়।
একদুই তিন গণনে পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাদিক্য বাড়ে সর্ব্ব রসে।
শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
দুই এক গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও বাসনা ত্যাগ শান্তরসের দুইগুণ। গীতায় ইহার বেশি কিছু বলা হয় নাই। শান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে। ইহাতে কেবল স্বরূপজ্ঞানই হইল, ইহার বেশী নয়। দাস্তভাবে ভগবানে পূর্ণৈশ্বর্য্যে প্রভুজ্ঞান হয়। ঈশ্বরের গৌরব বোধ,

ঈশ্বরের প্রতি সসঙ্কোচ ভয়মিশ্র ভক্তির সহিত ইহাতে যুক্ত হইল ভগবানকে আনন্দদানের জন্য সেবা।

সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ ত থাকিলই, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইল গভীর বিশ্বাস ও অসঙ্কোচ। কৃষ্ণকে শুধু সেবা নয়—কৃষ্ণের সেবা-গ্রহণেও সঙ্কোচ নাই। সখারা কৃষ্ণকে শুধু কাঁধে চড়ান নাই, নিজেরাও ক্রীড়াচ্ছলে কৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়াছেন। সখ্যরসের তিনগুণ। এই রসে দাস্যের চেয়ে মমতার পরিমাণ বেশী এবং শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া-সহচরের মত নিজের সমকক্ষ মনে করা হয়। ভগবান এই সখ্যরসের বিশেষ বশীভূত। পদকর্ত্তারা প্রধানতঃ এই সখ্যরসের সাধক।

বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা, সখ্যের অসঙ্কোচ ও গৌরববোধশূন্যতা ও দাস্যের সেবা তিনই বিদ্যমান, তাহাদের সহিত যুক্ত হইল মমতাধিক্যে লালন। দাস্যের সেবা লালনে পরিণত—এই লালনের মধ্যে আছে তাড়ন, ভৎসন এবং নিজেকে পালক ও শ্রীকৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।

মধুর রসের পঞ্চগুণ—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের মমতাধিক্যে লালন এগুলিত আছেই, তাহার সঙ্গে নিজের দেহপ্রাণমন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের জন্য সমর্পণ। ইহাই রস-সাধনার চরম কথা। এই চরম কথাটি কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পঙ্গু ভাষায় ভাল করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া সাংখ্যসূত্রের বরাত দিয়া বলিয়াছেন—

"আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।"

আকাশের গুণ—শব্দ। বায়ুর—শব্দ ও স্পর্শ। তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ। অপের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ক্ষিতির গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পঞ্চরসের ক্রমোন্মেষ ঠিক এইরূপ।

উপরের স্তর নিম্নতর স্তরকে অপসারিত করিয়া নয়, কবলিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ। নিম্নলিখিত কবিতাটিতে দেখানো হইয়াছে সকল রসের মধ্যেই দাস্যভাব নিগূহিত আছে—

নন্দের স্নেহ-নির্ঝর ছুটে গৌরবে-গুরু গিরির বুকে ;
শেষে—গিরিধরপায় প্রপাত-ধারায় গড়ায়ে পড়ে।
জননী যশোদা বক্ষের সুধা দিতে ভুলে নীলমণির মুখে,
ধ্বজ—বজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত ধন বক্ষে ধরে ॥
শ্রীদাম-সুদাম গাঁথি নীপদাম কণ্ঠে সঁপিতে, কি যেন ভাবি',
শেষে—অঞ্জলি পূরি সঁপে সে সখার চরণ' পরে,
বদন-রাজীবে—চরণ-রাজীবে গোপী-মধুপীর সমান দাবি,
তবু—'কোকনদে' যত লোভ, নয় তত 'তত 'ইন্দীবরে'।
ভাষা শুনে তার আশা মেটে বটে হাসি শুনে ব্রজবাসীরা হাসে,
আর—বাঁশী শুনে তার গোপবধূ নীপ-কাননে ছুটে,
পায়ে রুনুঝুনু শুনি নাচে তারা সব ধ্বনি ভুলি রসোল্লাসে,
তার—নৃত্য-মুখর নূপুরে ভৃত্য-হৃদয় লুটে ॥
রসের গোকুলে নানা বরণের যত ফুল ফুটে 'লতা'-বা 'দ্রুমে'
সবি—শ্যামেরি অঙ্গে ঝরি. শেষে পায়ে হতেছে জড়ো।
দাস্যের লোভে, নাহি মানি মানা বিশ্ব তাহার শ্রীপদ চুমে,
করে—নিখিল জীবন 'বলি' হ'য়ে তার বেদীটি বড়।

(ব্রজবেণু)

বংশীশিক্ষার কবি এই পঞ্চরসের মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন এইভাবে—

শান্ত তামা, দাস্য কাঁসা, সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোণা, শৃঙ্গার রত্নচিন্তামণি ॥

এই সকল রসের কে কোনটির সাধক? শান্তরসের সাধক শুক, সনকাদি বহু যোগী ঋষি; রবীন্দ্রনাথের গীতালি, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্যে বহু শান্তরসের গীতি আছে। শান্তরসের নিবেদন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥'—

দাস্তরসের সাধক উদ্ধব, অক্রূর, হনুমান্ ইত্যাদি। সখ্যভাবের সাধক শ্রীদাম, সুদাম, সুবল ইত্যাদি সখা, ভীমার্জ্জুন ইত্যাদি আত্মীয়গণ। বাৎসল্যরসের সাধক নন্দ, যশোমতী, রোহিণী ইত্যাদি। মধুররসের সাধিকা ব্রজ-গোপীগণ ও কৃষ্ণমহিষীগণ।

ধনজন, মানযশ, আয়ু, পুত্রপৌত্র ইত্যাদির প্রার্থনা উপাসনাই নয়, তাহা আলোচ্যের বাহিরে। সাধক ভগবানের কাছে ভক্তি নয়, যখন মুক্তি প্রার্থনা করে, তখন সে খুব জোর শান্তরসের সাধনা করে। পরিত্রাণের জন্য যত প্রার্থনার গীতি সব শান্তরসের গীতি। উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি প্রধানতঃ শান্তরসের সাধনার কথাই বলিয়াছে।

দেববিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে ভক্ত নানা ভাবে দেবসেবা করে, তাহা দাস্যভাবের উপাসনা। পদকর্ত্তারা পদের ভণিতায় সখ্যভাবের হৃদয়াবেগই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের 'সখ্যরসে বশ ভগবান' এই বাণী হইতেই তাঁহারা দীক্ষা পাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে রামানন্দ ও নিত্যানন্দ সখ্যরসের সাধক।

শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল ভাবে কল্পনা করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মত তাঁহার বিগ্রহের লালনপালন বাৎসল্যভাবের উপাসনা। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে পরমানন্দ পুরীর এই ভাব ছিল। পুণ্ডরীক, অদ্বৈত, চন্দ্র-শেখরাচার্য্য, গঙ্গাদাস ইত্যাদি গুরুজনের বাৎসল্যভাবই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ইঁহারা দাস্যভাব আশ্রয় করিয়াছিলেন। নরহরি সরকার

ঠাকুর, লোচনদাস, বাসুঘোষ ইত্যাদি সাধকগণ ব্রজগোপীর (নদীয়ানাগরী ভাবে,) ভাবে বিভাবিত হইয়া মধুররসের সাধনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যসম্পর্কে জগদানন্দ ও গদাধর মধুররসের সাধনা করিতেন।

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধসখ্য গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপে মুখ্য রসানন্দ এই চারিভাবে প্রভু বশ।

মুখ্যরসই মধুররস। পদাবলীসাহিত্যের অধিকাংশই মধুর রসের রচনা।

এই মধুররসের দুইটি ধারা একটি স্বকীয়া-সম্পর্কের ধারা। আর একটি পরকীয়া-সম্পর্কের ধারা। স্বকীয়া সম্পর্কের ধারায় রুক্মিণী, সত্যভামা ইত্যাদি মহিষীগণের পতিপ্রেম আর পরকীয়া-সম্পর্কের ধারায় ব্রজগোপীদের প্রেম। ব্রজগোপীদের পক্ষে কুলশীল-সতীত্বের সংস্কার ইত্যাদি বহু বাধা জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইয়াছে। ইহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা' ছাড়া আর কিছু নয়। সর্ব্ব-সংস্কারমুক্তির মধ্যেই ভগবান বাঁধা পড়েন। ভগবৎপ্রেম মাত্রই পরকীয়া প্রেমের সহিতই উপমিত হইতে পারে। শৈশবকাল হইতে আমরা শিক্ষা পাই—এবং সংস্কারেও ক্রমে বদ্ধমূল হয়—ধন, জন, মান, যশ, ঐহিক সুখসৌভাগ্যই আমাদের স্বকীয়—ইহাদের কেহ-না-কেহ আমাদের মানবপ্রকৃতির বল্লভ। বাকি সবগুলি যেন গুরুজন। ভগবানই পরকীয়। ভগবানের উদ্দেশে যাইতে হইলে ঐ স্বকীয় বল্লভ ও গুরুজন পরিজনদের মায়া ও শাসন কাটাইতে হয়।

মধুরভাবের সাধনার চূড়ান্ত হইল মহাভাব। এই মহভাবের দুইটি রূপ—একটি চন্দ্রাবলীসাধ্য মোদনাখ্য রূপ, আর একটি শ্রীরাধাসাধ্য মাদনাখ্য রূপ। চন্দ্রাবলীসাধ্য মোদনাখ্য রূপে দাস্যের সেবা ও

বাৎসল্যের পালনধর্ম্মের প্রাধান্য আছে। তাহার উপরে হইল মহাভাবরূপা—রাধা ঠাকুরাণী। ইহার পর আর নাই। চন্দ্রাবলীর ভাবেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু নাই—কিন্তু চন্দ্রাবলীর মহাভাব একেবারে সঙ্কোচমুক্ত নয়। রাসনৃত্যের সময় পাছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পা ঠেকে এই ভয়ে চন্দ্রাবলী সাবধানে পদক্ষেপ করিতেন। রাধার প্রেম সর্ব্বসংস্কার ও সর্ব্বসঙ্কোচ হইতে মুক্ত। রাধাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে ধরাইয়াছেন। এই রাধার ভাব একমাত্র শ্রীচৈতন্যে রূপ লাভ করিয়াছিল। এই প্রেমতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। এই প্রেমতত্ত্ব চৈতন্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ইষ্টজনের মনশ্চক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। এই প্রেমতত্ত্বের প্রথম উন্মেষ হয় শ্রীচৈতন্যের সহিত রায় রামানন্দের আলোচনায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাকেই অপূর্ব্ব ছন্দোরূপ দিয়া শ্রীচৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তারা এদেশে তাঁহার গুহ্য বাণী প্রচার করিয়াছেন।

এই সাধনতত্ত্বে যে সাধনা সর্ব্বোত্তম তাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রকটিত। যে সাধনার বলে—ভক্ত ভগবানে পরিণত হয়। তাহারই ক্রমোদ্‌বর্ত্তন দেখানো হইল মাত্র—প্রকৃত পক্ষে ভগবান সকল রসের সাধনারই বশীভূত। কেবল রসের পথ কেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভবাম্যহম্ 'যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।' অর্থাৎ যাহা কোন রসেরই সাধনা হয়, অথচ ভগবদ্ ভক্তি, যে ভক্তি বিধি নিয়মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সে ভক্তি অর্থাৎ বৈধীভক্তির স্থান 'এহো বাহ্য' হইলেও কম উঁচু নয়। তবে বৈধী ভক্তি যেন উজান বাহিয়া বহুক্লেশে নৌ-যাত্রা আর রাগানুগা ভক্তি জোয়ারের প্লাবনের সাহায্যে সেই পথেই ভাটিতে যাওয়া।

নিত্যানন্দ বুঝিয়াছিলেন—ভক্তের পক্ষে সখ্যভাবই চরম, তাহার

বেশী আগানো সম্ভব নয়। পুরীধামে—মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের কথা তাঁহার কানে পৌঁছিত, সম্ভবতঃ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াও থাকিবেন —কিন্তু নবদ্বীপলীলাকেই চরম বলিয়া তিনি জানিতেন। তিনি মধুর ভাব লইয়া স্বরূপ-রূপাদির মত মাথা ঘামান নাই। 'নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।'

পদকর্ত্তারা যে রসের সাধক তাহা সখ্যরস ও মধুররসের মাঝামাঝি। তাঁহারা সাধারণতঃ সখীভাবে বা দূতীভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিলাসে সহায়তা করিতেছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন লক্ষ্য নাই। কাব্যের রসসৃষ্টিতে সঞ্চারী ভাবের যে কাজ, লীলারসসৃষ্টিতে এই সখীভাবেরও সেই কাজ। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন-সাধনে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের ভাব স্মরণীয়। এক্ষেত্রে প্রাকৃত প্রেম বলিয়া কবিগুরু অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে কাব্যের উপেক্ষিতা বলিয়াছেন। ব্রজলীলার অপ্রাকৃত প্রেমের ক্ষেত্রে সখীদের কাব্যের উপেক্ষিতা বলিবার উপায় নাই। তাহাদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহারা রাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমলীলার অঙ্গীভূত। তাহাদের বাদ দিলে লীলাই পূর্ণাঙ্গ নয়। সখীরা কাব্যের উপেক্ষিতা নয় বলিয়াই সখীভাবে বিভাবিত পদকর্ত্তা সাধকরাও বৈষ্ণবজগতে উপেক্ষিত ত নহেনই, বরং বড় বড় সাধকদের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। কেবল ভাবপোষণ নয়—ঐ ভাবের পদে বাণীরূপদানও সাধনভজনের অঙ্গ। আর ঐ পদাবলীর পাঠ, আবৃত্তি—বিশেষতঃ সংকীর্ত্তনে স্বরমূর্চ্ছনার মধ্য দিয়া রসাস্বাদনও সাধনভজনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

শ্রীচৈতন্যের চরিতকারগণের রচনা পাঠে জানা যায়—সে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শুধু প্রেমের বন্যা নয়—একটা ভাবের বন্যাও আসিয়াছিল। ইহার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর শস্যসম্পদের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্য্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।" [সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ]

"মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনই উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিয়া দিল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। এই সময়ে একটা গৌরব সে লাভ করিয়াছিল যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল।" [ঐ]

জাতীয় জীবনে এই রস-প্রাচুর্য্যের ফলে শুধু মৌলিক সৃষ্টি নয়,

অনুবাদ সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। কেবল বঙ্গসাহিত্যের নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও একটা ভাববন্যার প্রবাহ আসে।

শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর ও ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে, তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আদর্শে একই সময়ে ব্রজে ও বঙ্গে নূতন করিয়া কাব্য, নাট্য, অলঙ্কার, রসতত্ত্ব ও দর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন! এই সঙ্গে ব্রজে সংস্কৃতে ব্রজলীলাবিষয়ক গ্রন্থও অনেক রচিত হইয়ছিল।

ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের নূতন করিয়া বহু টীকা, ভাষ্য ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। সনাতন গোস্বামী রচনা করেন, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, এবং ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী নাম্নী টীকা। এইগুলি ছাড়া তিনি সংস্কৃতে পদাবলী রচনা করেন। সেগুলি আজিও লীলাকীর্ত্তনে গীত হয়।

রূপগোস্বামী রচনা করেন— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (রসশাস্ত্রের গ্রন্থ— ভক্তিতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা . উজ্জ্বলনীলমণি (উজ্জ্বল বা মধুর রসের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং অলঙ্কারনির্ণয়), নাটকচন্দ্রিকা (নাটক-সম্বন্ধীয় রসতত্ত্বের গ্রন্থ), বিদগ্ধমাধব (নাটক), ললিতমাধব (নাটক), লঘু ভাগবতামৃত-সিন্ধু-বিন্দু, রাগময়ী কণা, আখ্যাতচন্দ্রিকা, প্রেমেন্দুসাগর, গোবিন্দবিরুদাবলী, দানকেলিকৌমুদী (রূপক নাট্য), উদ্ধবসন্দেশ (কাব্য), হংসদূত (কাব্য), পদ্যাবলী।

জীবগোস্বামী রচনা করেন শ্রীগোপালচম্পু, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপালভট্টের ষট্‌সন্দর্ভের সর্ব্বসংবাদিনী টীকা এবং বহু গ্রন্থের ভাষ্য ও টীকা। শ্রীগোপাল ভট্ট হরিভক্তিবিলাসনামে বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ রচনা

করেন। গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বৈষ্ণবতত্ত্বমূলক পুস্তক। মুরারি গুপ্ত রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ (কড়চা নামে প্রসিদ্ধ)। রায় রামানন্দ লেখেন জগন্নাথবল্লভ নাটক এবং প্রবোধানন্দ লেখেন চৈতন্যচন্দ্রামৃত, কবিকর্ণপূর রচনা করেন—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, অলঙ্কারকৌস্তুভ (অলঙ্কারের ও রসতত্ত্বের পুস্তক) ও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেন—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত এবং আরো কয়েকখানি পুস্তক। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচনা করেন—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা ও ভাগবতের টীকা।

সার্ব্বভৌম রচনা করেন গৌরাঙ্গ-শতক। গৌরাঙ্গ-শতকের মত সংস্কৃতে শ্রীচৈতন্যের স্তবাবলী রচিত হইয়াছিল অজস্র। এই স্তবগুলিতেও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী, চরিত্র ও জীবনকথা অনেক আছে। গোবিন্দদাস সঙ্গীতমাধব নাটক ও নরহরি সরকার শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ রচনা করেন।

এই সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল—কোন কোন গ্রন্থের ভাব লইয়া নূতন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। প্রেমদাস চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী নামে কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের; লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকাবলীর; যদুনন্দন দাস গোবিন্দলীলামৃতের ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ও রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ করেন।

ভাগবতের অনুবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ সর্ব্বাগ্রে ভাগবতের (১০ম-১১শ স্কন্ধের) অনুবাদ করেন। বাঙ্গলার নিজস্ব ভাবধারা তাঁহার অনুবাদের পরিণাতে প্রবাহিত করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে মৌলিক কাব্যের মর্য্যাদা দিয়াছেন। ইহা কেবল অনুবাদমাত্র নয়।

তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া আনন্দ পাইতেন না, কায়া থাকিতে তাঁহার ছায়ায় রতি হইত না।*

রঘুনাথ পণ্ডিত পরে ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী নামে কাব্য রচনা করেন। ভাগবতের অনুবাদকদের মধ্যে মাধবাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের ধারায় ইঁহার কাব্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নামে স্থান পাইতে পারে। ইনি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই; ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিতাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণের বহু ভাব মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের জন্য এই কাব্য রচনা করেন। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল ভাগবতেরই অনুবাদ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মাধবাচার্য্যের শিষ্য কায়স্থ ভৃত্য কৃষ্ণদাস একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন। তাহাতে ভাগবতের উপাখ্যানের সহিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, সুভদ্রাহরণ, পারিজাতহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি উপাখ্যান মিলাইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন। ভাগবত অবলম্বনে যাঁহারা কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে দেবকীনন্দন কবিশেখরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কাব্যের নাম গোপালবিজয় কাব্য। ইনি দানলীলায় ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের দানলীলার অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার বড়ায়ী চরিত্র

---

* ইহা শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় নিখুঁত পয়ারে ইহা রচিত। এই অনুবাদ আক্ষরিক নয়। দানলীলা ও পারখণ্ড ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই—ইহাতে রাধার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভাষার নিদর্শন—

ছাওয়ালের স্তনপান করে কোন জন। নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন॥
হেনহি সময়ে বেণু করিল শ্রবণে। চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেখানে॥

অপূর্ব্ব। এইরূপ বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই দীপান্বিতার মহোৎসব আলোকিত করিয়া মৃন্ময়দীপের ন্যায় তুলসীতলার পাশে রাশীকৃত হইয়াছে—তৈজস প্রদীপের মর্য্যাদা লাভ করিয়া অতিঅল্পসংখ্যক গ্রন্থই দেবালয়ের কুলুঙ্গিতে স্থান পাইয়াছে।

প্রকৃত তৈজসদীপের গৌরব লাভ করিয়ছে শ্রীচৈতন্যের কয়েকখানি জীবনচরিত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২। বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। ৩। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। ৪। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। ৫। গোবিন্দদাসের কড়চা—এই কড়চা লইয়াই অনেক কচকচি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন উহা প্রাচীন গ্রন্থই নয়, উহা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ একটি খণ্ডিত পুঁথি ছিল—শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় উহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন উহা একেবারেই জাল। দীনেশবাবু উহাকে আসল গ্রন্থই মনে করিতেন। আমাদের মনে হয় একটা 'খণ্ডচ্ছিন্নব্যুৎক্রান্ত' পুঁথি ছিল, গোস্বামী মহাশয় উহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের লীলার ইতিহাস তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদগণের জীবনচরিত ও বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর চরিতগ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য—

১। যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ। ২। নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস। ৩। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা। ৪। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ। ৫। নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস। ৬। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল। ৭। বিখ্যাত পদকর্ত্তা গীতচন্দ্রোদয়ের সংকলয়িতা নরহরি (ঘনশ্যাম)

চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনিবাসচরিত ও নরোত্তমবিলাস। ৮। মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী ইত্যাদি। *

এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সামসময়িক। হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে মহাপ্রভুর দানলীলা অভিনয়ের কথা আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা মহাপ্রভু যে উপভোগ করিতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বংশীশিক্ষায় মহাপ্রভুর জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে অনেক আজগুবি কথা থাকিলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে। ইহাতে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক ও আচার্য্যগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম।

এই গ্রন্থে রূপসনাতন, জীবগোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ও পরিচয় দেওয়া আছে। গ্রন্থে বহু শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থে সংগৃহীত পদগুলিও সুনির্ব্বাচিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রমাণের বহু গল্প আছে।

অদ্বৈতপ্রভুর জীবনচরিত অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, এমন কি অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীরও জীবনচরিত আছে। কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর কোন পৃথক জীবনচরিত পাওয়া যায় নাই। চৈতন্যভাগবতের প্রায় অর্দ্ধাংশই নিত্যানন্দের জীবনচরিত। নিত্যানন্দ দাস নিত্যানন্দপ্রভুর একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন—তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

---

* এইগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। জগদানন্দের প্রেম বিবর্ত্ত, মুকুন্দের আনন্দরত্নাবলী ও সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, রাজবল্লভের মুরলীবিলাস, লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র, দাসগোস্বামীর মনঃশিক্ষা, রাঘবগোস্বামীর ভক্তিরত্ন প্রকাশ, বৃন্দাবন দাসের তত্ত্ববিলাস ও তত্ত্বচিন্তামণি, মনোহর দাসের রসমঞ্জরী ও পীতাম্বর দাসের রসকল্পবল্লী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সকল চরিতশাখার পুস্তক হইতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেব নয়—তাঁহার ভক্ত ও অনুচরগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভক্তির ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধরণের প্রয়োজন আছে। চৈতন্যদেবের পার্শ্বচরগণ ও ভক্তগণ যে মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, চরিতকারগণ তাঁহাদের চরিত্র—মাহাত্ম্যকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলেও পারিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা ইঁহারা একপ্রকার হরণ করিয়াই লইয়াছেন। ফলে চৈতন্যদেব আর রক্তমাংসের মানুষ থাকেন নাই। ইঁহাদের কাছে তিনি ভাববিগ্রহ। মানুষ হইয়াই তিনি কত বড়, দেবতাদের চেয়েও বড়, তাহা বুঝিবার বা জানিবার সুযোগ বা অবসর তাঁহারা দেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন—মানুষ নহেন বলিয়াই তিনি এত বড়। নিমাই যে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু পাণ্ডিত্যই তাঁহার জীবনে বড় কথা নয়, জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম যে অনেক বড় এই কথাই তাঁহার জীবনের মূল সূত্র। চরিতকারগণ তাঁহার জীবনে চরম পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। যে মহাজ্ঞান Revealed (আপ্ত) তাহার নিকট অনুশীলন বা অধ্যয়ন হইতে আহৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ। হজরৎ মোহাম্মদের জীবন-কথা স্মরণ করিলেই তাহা বুঝা যায়।

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, নরোত্তম ইত্যাদি সাধকগণ প্রভূত ধনসম্পদ ও মান গৌরব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা সম্যক্‌ভাবেই উপলব্ধ হয়, এরূপ ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের সমারোপে মনুষ্যত্বের মহিমা ক্ষুন্নই হইয়াছে,—

বৃদ্ধি পায় নাই। চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও সহযোগিগণকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা রুক্মিণী, সত্যভামা, ব্রজগোপী ও মঞ্জরীগণের অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের আহার-বিহার, চালচলন সমস্তকেই অমানুষিকী ও অপ্রাকৃত লীলা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে দেবতারই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুচরগণ কেবল ঐহিকসম্পদ কেন—স্বর্গ, 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্মের' আকাঙ্ক্ষা—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা না করিয়া 'পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধনের' জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চরিতগ্রন্থাবলীর ভাববিলাসের আতিশয্য ও স্তাবকতার উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই সত্যটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী চরিতগ্রন্থাবলী হইতে ইহাও জানা যায়,—এই আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। ভক্তির অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির কথা ভুলিয়া শেষে মানুষেরই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষকে জোর করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে দেবতার আসনে তুলিয়া দিয়াছিল। ভক্তের ভক্তিই দেবতার সর্ব্বনাশ সাধন করে—দেবতা ভক্তের পরিচর্য্যায় ক্রমে ভোগবিলাসী হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ীর মুখদর্শন করিতেন না এবং জগদানন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য সংভোগে প্রবর্ত্তনার জন্য তিরস্কার করিতেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায়, যাঁহারা যৌবনে কঠোর সংযম, ক্ষান্তি, শম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিয়া নমস্য হইয়াছেন—পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাদের কেহ কেহ ভক্তের সেবায়, আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে বিষয়ভুঞ্জন করিয়া স্খলৎপাদ হইয়াছেন।

ক্রমে বাংলায় গৌরাঙ্গবাদের প্রচার হয়—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বদলে গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষান্ত না

হইয়া গুরুকেই ভগবান করিয়া তুলিলেন—ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত মহান্ আদর্শ নষ্ট হইল। আবার সেই চিরন্তন গুরুবাদ ফিরিয়া আসিল; সেই মীননাথ গোরক্ষনাথের পুনরভিনয় হইতে লাগিল। কর্ত্তাভজা দলের সৃষ্টি হইল, সহজিয়াবাদ নূতন আকারে দেখা দিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পদাবলীর ভোগানুকুল ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল। যে ধর্ম্ম বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সহিত ভোগের ও ভোগী মানুষের সর্ব্ব-প্রকার দুর্বলতার সন্ধি করিতে হইল!

বাংলার একদল লোক শ্রীচৈতন্যকে যোগসাধক দেহতত্ত্বী, একদল শূন্যবাদী, একদল সহজিয়া বানাইয়াছে। তাহার ফলে বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের সাধনভজন পদ্ধতির সঙ্গে ব্রজের গোস্বামীদের সাধনপদ্ধতির মিল ত নাই-ই, উপরন্তু অনেকক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের বিরোধী। চৈতন্যভাগবত রচনার সময়েই বৈষ্ণবদের মধ্যে পাঁচটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ১। নিত্যানন্দী ২। গদাধরী ৩। অদ্বৈতসম্প্রদায়ী ৪। গৌরনাগরী ৫। নিত্যানন্দবিদ্বেষী—এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তিধর্ম্মের মূলতত্ত্বে মতানৈক্য না থাকিলেও বাহ্য আচার আচরণ ও সাধনভজনের পদ্ধতিতে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। যেমন— বৃন্দাবন দাস সনাতন গোস্বামীর 'হরিরিহ যতিবেশঃ কৃষ্ণচৈতন্য নামার' পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু নরহরির গৌরনাগরী ভাবও অনুমোদন করেন নাই।

চরিতশাখার গ্রন্থ ছাড়া ভক্তিগ্রন্থ ও রসতত্ত্বের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। একা নরোত্তম ঠাকুরই প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, রাগমালা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল ইত্যাদি ১৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর সাহিত্য যাহা রচিত হয়, তাহা পদাবলী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালে যে পদাবলী

রচিত হয় তাহা যৎসামান্য, তাঁহার তিরোধানের পর এই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আসিয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে ভক্তভ্রমরগণ মধুপানেই নিমগ্ন ছিলেন, গুঞ্জন করিবার অবসর বড় পান নাই। গৌরাঙ্গদেবের জীবনকমল মুদিত হইলে ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে মধুপিপাসায় যে আকিঞ্চন ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদাবলী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব যে পদাবলী সাহিত্যের প্রেরণা দিয়াছিল, তাহারই রসপ্রবাহ তিনশত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—পরে ঐ প্রবাহই বাউল গান. সহজিয়া গান. পাঁচালী গান, কবির গান ইত্যাদির মধ্য দিয়া আমাদের সমতলে নামিয়া আসিয়াছে। মুরারি ও নরহরি সরকারঠাকুরই গৌরোত্তর পদাবলী রচনার আদিগুরু। নরহরি সরকার ঠাকুর হইতে কৃষ্ণকমল নীলকণ্ঠ পর্য্যন্ত ঐ ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যের একটি ধারা গৌরগীতি। অন্যটি ব্রজগীতি। গৌরগীতি ধারার পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আর রচিত হয় নাই। প্রাচীন কবিদের গৌরগীতিকাগুলিই আজিও রসকীর্ত্তনের প্রারম্ভে 'গৌর-চন্দ্রিকারূপে উদ্গীত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতে ব্রজ বুলিতে পদরচনার প্রথা ছিল না। তাঁহার তিরোভাবের পর ব্রজবুলিতে অজস্র পদরচনা হইতে থাকে। পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিদের পদ আজিও রসকীর্ত্তনে গীত হয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সহিত জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, উদ্ধবদাস, শশিশেখর, লোচনদাস, যদুনন্দন দাস, জগদানন্দ, রায়শেখর, ঘনশ্যামের পদাবলী কীর্ত্তনে গীত হয়।

ইঁহাদের পদাবলী ঘনশ্যামের গৌরগীতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, বিশ্বনাথের ক্ষণদা গীতচিন্তামণি, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু, রাধামোহনের পদামৃতসমুদ্র, গৌরসুন্দরদাসের কীর্ত্তনানন্দ ইত্যাদি গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজে ধর্ম্মবিষয়ে স্মার্ত্তপথ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রসম্মতভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে চাহিতেন—তিনি দামোদর ও সার্ব্বভৌমকে পদেপদে প্রশ্ন করিয়া শাস্ত্রবিধিও জানিতে চাহিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করিতেন না, কিন্তু সনাতন ও হরিদাস মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একটু দূরে দূরে থাকিলে তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে সুখীই হইতেন। ভক্তিধর্ম্মে সকল জাতির সমান অধিকার তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু জাতিভেদের গণ্ডী তিনি ভাঙ্গিতে চাহেন নাই। জগন্নাথের প্রসাদ সম্পর্কে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করিতেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া 'ঘরভাত' গ্রহণ করিতেন না। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বঙ্গদেশে স্মার্ত্তশাসন অনেকটা শিথিল হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের জাত্যভিমান অনেকটা কমিয়াছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে ব্রাহ্মণসমাজের বহু জ্ঞানী ও গুণী গৃহস্থই সাড়া দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী ও পরিকরদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশি। ইঁহারা স্মার্ত্তপথ একেবারে ত্যাগ করেন নাই, শিখাসূত্রও ত্যাগ করেন নাই। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির পরমভক্তদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে ইঁহাদের আপত্তি ছিল না।

জনসংখ্যার অনুপাতের কথা ভাবিলে বিশেষরূপ বিচলিত হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী ও পশ্চিমবঙ্গ-প্রবাসী বৈদ্যসমাজ। শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্কৃতে প্রথম জীবনচরিত-লেখক মুরারি গুপ্ত ও পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। বাংলা ভাষায় জীবনচরিতের মধ্যে দুইখানি প্রধান গ্রন্থই—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—বৈদ্য-জাতীয় ভক্তকবির রচিত। চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসও বৈদ্য। পদকর্ত্তাদের মধ্যে বৈদ্যভক্তদের সংখ্যা খুব বেশী।

গৌরপারম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ও গৌরাঙ্গমূর্ত্তিপূজা-প্রবর্ত্তনও মুরারি, শিবানন্দ সেন, কবিকর্ণপূর, নরহরি সরকার ও লোচনদাস ঠাকুরের কীর্ত্তি।

কায়স্থজাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সব চেয়ে বেশি সম্পাতিত হয়। ব্রজের ছয় গোস্বামীর একজন (রঘুনাথদাস) কায়স্থ। মহাপ্রভু ইঁহাকে শালগ্রাম পূজার অধিকার দিয়াছিলেন। কুলাই ও কুলীনগ্রামবাসী ভক্তেরা কায়স্থ। কোন কায়স্থের রচিত চরিতগ্রন্থ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পদকর্ত্তাদের অনেকেই কায়স্থকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং নরোত্তমদাস বৈষ্ণবসমাজের গুরুস্থানীয়।

অন্যান্য জাতির লোকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তিধর্ম্ম সঞ্চারিত করেন। এমন কি অন্যান্য জাতির অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বণিক সমাজের ধনী ব্যক্তিরা দেশে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্ধারণ দত্ত, শ্যামানন্দের মত শূদ্রজাতীয় বহুভক্ত সর্ব্ববর্ণের নমস্য হইয়াছেন। ৬৪ মোহান্ত ও ২৪ জন গোপাল উপগোপালের মধ্যে শূদ্রজাতীয় ভক্তদের সংখ্যা অল্প নয়।

সঙ্গীত-লক্ষ্মী উপবীতী কণ্ঠ বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার আসন নির্বাচন করেন না। নীচজাতির বহুলোকও সৌকণ্ঠ্য ও গীতদক্ষতা লাভ করিয়া বড় বড় কীর্ত্তন-গায়ক হইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষপর্য্যন্ত ভক্তের মর্য্যাদা লাভও করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের মানবিকতা

পদাবলী শাখারই একটি প্রশাখা গৌরগীতিকাবলী। এই গৌরগীতিগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেব ভাববিগ্রহে পরিণত হইয়াছেন। চরিতশাখায় শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চরিতগ্রন্থগুলিতে তাঁহাকে একেবারে মানবিকতাবর্জিত করিয়া চিত্রিত করা হয় নাই। এই মানবিকতাটুকু মাঝে মাঝে ফুটিয়াছে বলিয়াই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে 'আপন জন' বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। কেবল ভক্তির স্বর্গে নয়, ভালবাসার মর্ত্যলোকেও তাঁহাকে পাইয়া থাকি।— বাংলার 'ঘরের ছেলের চোখে বিশ্বভূপের ছায়া' দেখিতে পাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকৈশোরে বৃন্দাবনদাস যতই ভগবত্তা আরোপ করুন, তাঁহার প্রথম জীবনে মানবিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিশোর নিমাই সত্যই খুব দুর্দান্ত ছিলেন, কি দুর্ললিত ব্রজগোপালের অনুসরণে তাঁহাকে দুর্দান্ত বানানো হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। রঙ্গপ্রিয়, তর্কপটু, কলহপ্রিয় নিমাই পণ্ডিতের মানবিকতা কোন চরিতকারই হরণ করিতে পারেন নাই। মুরারি গুপ্ত এই নিমাই পণ্ডিতকে হাড়ে হাড়ে চিনিতেন।

পড়ুয়া নিমাই ছিলেন দুর্দান্ত, পণ্ডিত নিমাইকে সকলে উদ্ধত বলিয়া জানিতেন। তাঁহার আটোপ-টঙ্কারে সকলেই সন্ত্রস্ত। তর্ক করিয়া বিদ্যাবলে সকলকে হারাইবার জন্য তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের খুঁজিয়া বেড়াইতেন। জিগীষু নিমাই পণ্ডিতকে সকলেই এড়াইয়া চলিতেন। এদিকে তিনি খুবই রঙ্গপ্রিয় ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গ-রসিকতা তাঁহার চরিত্রে পূরামাত্রাতেই ছিল। নিজে শ্রীহট্টের লোক

হইয়াও শ্রীহট্টিয়াদের ভাষা লইয়া তিনি রসিকতা করিতেন। আসল রসিক লোকের ইহাইত বিশেষত্ব—রঙ্গব্যঙ্গের আঘাত হইতে আপনজন ও আপনাকেও অব্যাহতি দেন না।

জগন্নাথমিশ্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, নিমাইএর বাল্য কৈশোর দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটিয়াছিল। মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন—ধনার্জ্জনের জন্যই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন—পাণ্ডিত্যপ্রচারের জন্য। তখন ধর্ম্মপ্রচারের কথাই ছিল না।

দিগ্বিজয়িপরাভবের পর নিমাইএর খ্যাতি এতই বাড়িয়াছিল যে, চারিদিক হইতে বহু ধনসম্পদ আসিতে লাগিল। নিমাইএর প্রথম বিবাহ নমোনমঃ করিয়াই সারা হইয়াছিল—দ্বিতীয় বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল। নিমাই যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার অবস্থা বেশ সঙ্গতিপন্ন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন বঙ্গ-বিশ্রুত।

মহাভাবাবেশ তাঁহার জীবনে প্রবুদ্ধ হওয়ার পর চরিতকাররা তাঁহার ভগবত্তার কথাই বেশি করিয়া বলিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার জীবনে ভাবাবেশ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে; তখনও তাঁহার জীবনের মানবিকতার উল্লেখ চরিতকারগণ মাঝে মাঝে করিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মক—অনাবিষ্ট অবস্থায় অসাধারণ হইলেও তিনি মানুষ!

চৈতন্যচরিত-পাঠে তাঁহার মানবিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, এই নিবন্ধে তাহারই দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিব।

শ্রীচৈতন্যের সংসারসম্বন্ধে দুইটি বন্ধন ছিল। একটি বন্ধন শচীমাতা, অন্য বন্ধন বিষ্ণুপ্রিয়া। অদ্বৈতের গৃহে শচীমাতার সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইল সন্ন্যাস-গ্রহণের পরই।

কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥

প্রভু বলিলেন—

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হইতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥

"কেহ যাহাতে নিন্দা না করে, যাহাতে দুই ধর্মেরই (গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস) মর্যাদা রক্ষিত হয়, এমন কোন যুক্তি দাও।" শ্রীচৈতন্য এখানে অবতীর্ণ ভগবানের মত কথা বলেন নাই, মানুষের মত কথাই বলিয়াছেন। শচীমাতা শ্রীচৈতন্যের উপযুক্তা জননীর মতই উত্তর দিয়াছেন :—

তেঁহো যদি ইহ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়।
তাতে এই যুক্তি ভালো মোর মনে লয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক-গতায়তি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি-সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥

* শ্রীচৈতন্য জননীর উপদেশমত নীলাচল-বাসই স্বীকার করিয়া সংসারত্যাগের সঙ্গে জড়িত একটি সমস্যার সমাধান করিলেন।

আর একটি সমস্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে ; আগেই তিনি সে সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লোচনদাস ছাড়া অন্য চরিতকাররা কতকটা উপেক্ষাই করিয়াছেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাহুপাশ হইতে শ্রীচৈতন্যের বিদায় চিত্রটি কবিজনোচিত সহৃদয়তার সহিতই অঙ্কন করিয়াছেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত নাই, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের পক্ষ হইতে মানবিক মূল্য আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন :

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দাও হাত সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিয়া যায় হিয়া আগুনেতে প্রবেশিব আমি।
অরণ্যকণ্টক বনে কোথা যাবে কোনখানে কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায়।
ভূমিতে দাঁড়াও যবে প্রাণে মোর ভয় তবে হেলিয়া পড়য়ে পাছে গায়।
কি করিব মুই ছার আমি তোমার সংসার সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া সুখে তুমি বস' এই ঘরে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে তাঁহার স্বামী ভগবান নহেন, মানুষ। তাই তাঁহার চরণে এই নিবেদন। শ্রীচৈতন্য মানবস্বামীর মতই বিষ্ণুপ্রিয়াকে কত বুঝাইলেন, সংসারের অনিত্যতা, জীবজগতের কল্যাণ, মহাব্রত-উদ্‌যাপন ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলিলেন। তিনি চতুর্ভুজ হইয়া নিজের ঐশ্বর্যও শেষ পর্য্যন্ত দেখাইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিবুদ্ধি ঘুচিল না। কেবলা রতির ইহাই লক্ষণ। বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতর ক্রন্দন কিছুতেই থামে না। তখন শ্রীচৈতন্যদেব—

প্রিয়জন আর্তি দেখি ছলছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ।

স্বামীর আদর পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর চতুর্ভুজ মূর্তিকে মায়া মনে করিয়া, দ্বিভুজে তিনি যে বুকে জড়াইয়া আদর করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বিরহিণী-চিত্তের চিরসঙ্গী করিয়া রাখিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ হইতে মানবস্বামীর মতই বিদায় লইয়াছেন, ভগবান স্বামীর মত নয়! তাই লোচনদাসের বিষ্ণুপ্রিয়াই বারমাস্যার বিলাপে বলিতে পারিয়াছেন :—

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রীতি। পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি॥

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভাবাবিষ্ট থাকিতেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিতেন এবং সেই ভাবের প্রেরণাতেই তিনি তদনুসারে কথাও কহিতেন, আচরণও করিতেন। মহাভাবাবিষ্ট ভক্তের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তিনি আবেশমুক্ত অবস্থায় থাকিতেন, তখন তাঁহাকে কেহ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতেন।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার প্রতিবাদোক্তি একাধিক বার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিহ। জীবধামে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ।
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্যোপম॥
জীবে ঈশ্বরতত্ত্ব নহে কদাচন। জলদগ্নিরাশি হৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

এইরূপ প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই। ভক্তগণ তাঁহার মহাভাবাবিষ্ট অবস্থার আচরণকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উক্তি—

"তুমিই শ্রীকৃষ্ণ, তোমার দেহকান্তি পীতাম্বরের মত তোমাকে আচ্ছাদন করিয়া আছে।"

মৃগমদ বস্ত্রে বাঁধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥

শ্রীচৈতন্ম যখন অনাবিষ্ট থাকিতেন, তখন বলিতেন—

কৃষ্ণদাস্য বই মোর আর নাই গতি।
বলিহ আমারে পাছে হয় অনুমতি॥

কিন্তু—

ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন। হেন প্রাণ নাহি কারো করিবে কথন॥

মহাপ্রভু যখন বাহ্যদশায় থাকিতেন, তখন—

নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া। চরণের ধূলি ল'ন সম্ভ্রমে উঠিয়া॥

ইহাতে সকলে মহাপ্রমাদ গণিত। কারণ, তাঁহারা ভাবাবিষ্ট অবস্থার কথাকেই স্বাভাবিক মনে করিতেন।

শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব-প্রচারের গুরুগোঁসাই অদ্বৈত। অদ্বৈতপ্রভু ভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য এত কাল হুঙ্কার করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহারই আহ্বানে ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারই গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিয়া ভাবাবেশে নিজেকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে বার বার ঐশ্বর্য-ভাবাবেশ হইয়াছে।

অদ্বৈত বয়ঃপ্রবীণ গুরুশ্রেণীর মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে নিজের পায়ে হাত দিতে দিতেন না, কেবল তাঁহাকে কেন, বাহ্যদশায় থাকিতে কাহাকেও পদস্পর্শ করিতে দিতেন না। প্রেমাবেশে একদিন প্রভু যখন নৃত্য করিতেছিলেন—তখন অদ্বৈত লুকাইয়া পদ-ধূলি লইয়াছিলেন। বাহ্যদশালাভের পর শ্রীচৈতন্ম এজন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন :

সকল সংসার তুমি করিয়াছ সংহার। তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতীকার ॥
সংসারের অবশেষ সবে আছিআমি। তাহা সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥

* * * *

মহা ডাকাইতী তুমি চোরে মহাচোর।
তুমি যে করিলে চুরি প্রেমসুখ মোর ॥

ইহা কেবল অভিমানের বাণী নয়, শ্রীচৈতন্য বলিতে চাহিয়াছেন—"ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রেম নাই। আমাতে ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়া তুমি আমার প্রেমসুখ হরণ করিলে। আমার প্রেমসুখ-হরণই আমাকে সংহার করা।"

ইহাতে যথেষ্ট দণ্ড হইল না মনে করিয়া, তিনি অদ্বৈতের দুই চরণ মাথায় লইয়া ঘষিতে লাগিলেন। ইহাই প্রচণ্ডভাবে নিজের ঈশ্বরত্ব-অস্বীকার—"লৌকিকলীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষণ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখি—শ্রীচৈতন্যদেব একবার বলিতেছেন

কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥

শুধু তাহাই নয়, জননীর উদ্দেশে তিনি বলিতেছেনঃ

তোমার সেবা ছাড়িয়া আমি করলুঁ ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লয়ো আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥

সত্যই প্রেমসাধনার জন্য সংসারত্যাগের বা সন্ন্যাস-গ্রহণের ত প্রয়োজন হয় না।

বলা বাহুল্য, যিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মনাশ করেন নাই। এই উক্তি তাঁহার সন্ন্যাসবেশের আবরণে প্রচ্ছন্ন মানবিকতার অভিব্যক্তি মাত্র।

মথুরার ঐশ্বর্যমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণকে যেমন প্রকৃত বৈষ্ণব স্বীকার করেন না—একশ্রেণীর ভক্ত তেমনি নীলাচলের বৈরাগ্যমণ্ডলের শ্রীচৈতন্যের ভক্ত নহেন। ইঁহারা শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়াছেন—তাঁহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া হাহাকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁহার লোকাপেক্ষতায়।

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥

সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁহার খর লক্ষ্য ছিল। সন্ন্যাসধর্ম্মে বিধিনিষেধ কি কি আছে সন্দেহ হইলেই তিনি সার্ব্বভৌম অথবা স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

জগদানন্দ প্রভুকে গন্ধ-তৈল মাখাইতে চাহেন, প্রভুর কাছে সব তৈলই সমান, কিন্তু তিনি লোকমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন :

পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যেই পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি' আমারে কহিবে॥

শ্রীবাস সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন লইয়াই থাকিতেন, অর্থার্জ্জনের জন্য গৃহের বাহির হইতেন না। তাঁহার সংসারযাত্রা কি করিয়া চলে তাহা জানিবার জন্য তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। বাসুদেব দত্তের যত্র আয় তত্র ব্যয়—বিশেষতঃ বাসুদেব প্রতি বৎসর কয়েকমাস পুরীতে কাটান। শিবানন্দ সেনকে মহাপ্রভু তাঁহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

সনাতন দুপুর রৌদ্রে সমুদ্রসৈকতের পথে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তপ্ত বালুকার পথে সনাতন আসিয়াছেন শুনিয়া সাধারণ হৃদয়বান্ মানুষের মতই ব্যথা অনুভব করিলেন। গম্ভীরায় শঙ্কর পণ্ডিত থাকিতেন তাঁহার প্রহরী। শঙ্কর এক শীতের রাত্রিতে সেবা করিতে করিতে খালি গায়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রভু তাঁহার নিজের কাঁথা তাঁহার গায় জড়াইয়া দেন। এ সমস্ত হৃদয়-মাধুর্য্যের নিদর্শন, নির্বিকার ভগবানের কার্য্য নয়।

প্রতি বৎসর প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ বহু দুঃখ স্বীকার করিয়া নীলাচলে আসিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের শ্রমক্লেশ ঘটে, সাংসারিক ক্ষতিও হয়। শ্রীচৈতন্য তাহাতে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন:

প্রতি বর্ষে আইস সবে আমাকে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিতে॥

পুরীযাত্রীদের দুঃখক্লেশ তিনি উপলব্ধি করিতেছেন, অথচ সঙ্গসুখের লোভে তাহাদের পুরী-আগমনে নিষেধ করিতেও পারিতেছেন না। ইহা তাঁহার মানবধর্ম্মেরই কথা, ভাগবত-ধর্ম্মের কথা নয়।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রদৃঢ়তার যে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাহা তাঁহার ভগবত্তার নিদর্শন নয়, মানবিকতারই নিদর্শন। নবদ্বীপের ভক্তগণের কাতর প্রার্থনা, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুজল, অসামান্য সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহার

মানবিক চরিত্রদৃঢ়তারই নিদর্শন। গোবিন্দ ঘোষকে অর্দ্ধ হরীতকী সঞ্চয়ের জন্য পরিত্যাগ, কাজীর ভবনে সংকীর্ত্তন-অভিযান, জগাই-মাধাইএর মত দুর্দ্দান্ত মদ্যমত্ত দুর্জ্জনের সম্মুখীন হওয়া, মাধবীর গৃহে চাউল সংগ্রহের জন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ, প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎকারে অস্বীকৃতি ইত্যাদি তাঁহার মানবিক চরিত্রদৃঢ়তার নিদর্শন।

আবার—পরমভক্ত পরমমিত্র রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথকে যখন চাঙে চড়াইয়া প্রতাপরুদ্রের পুত্র খড়্গে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তখন ভক্তেরা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য মহাপ্রভুর কাছে অনুনয়বিনয় করিতে লাগিল। প্রভু তাহা শুনিয়া রাজার কাছে ছুটেন নাই—কোন ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের দ্বারা তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন নাই; বরং বলিয়াছিলেন—যে রাজার প্রাপ্য আত্মসাৎ করিয়াছে—প্রজার অকল্যাণ করিয়াছে, তাহার দণ্ড হওয়াই উচিত। এজন্য তোমরা যদি আমাকে বিরক্ত কর তবে আমি আলালনাথে চলিয়া যাইব। ইহা তাঁহার মানবিক চরিত্রদৃঢ়তার একটি দৃষ্টান্ত।

একাকী বৃন্দাবন-যাত্রায় যেমন, একাকী দক্ষিণাপথ যাত্রাতেও তেমনি তাঁহার চরিত্রদৃঢ়তা সূচিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু যখন একাকী দক্ষিণদেশে যাইতে প্রস্তুত হইলেন,—তখন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। প্রভু উত্তর দিলেন—"নিত্যানন্দ, আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার স্বাধীনতা থাকে না, আমি নিতান্তই তোমার অধীন হইয়া পড়ি, তোমাদের গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ হয়।"

জগদানন্দ-সম্বন্ধে বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী। জগদানন্দ স্নেহবশে আমাকে বিষয় ভুঞ্জাইতে চায়। সে যাহা বলে, তাই করিতে হয়, না করিলে সে তিন দিন অভিমানে কথা কয় না।"

মুকুন্দ-সম্বন্ধে বলিলেন,—"আমি কঠোর সন্ন্যাসধর্ম পালন করি দেখিয়া মুকুন্দ বড় ব্যথা পায়। তাহার ব্যথা দেখিয়া আমার দ্বিগুণ দুঃখ হয়।"

দামোদর-সম্বন্ধে বলিলেন,—"দামোদর সব সময়ে শিক্ষাদণ্ড হস্তে শাসন করে, ইহার সাহচর্যে আমার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সে বলে —কৃষ্ণপ্রেমের কাছে আবার লোকভয় কিসের? কিন্তু "আমি লোকাপেক্ষা কভু ছাড়িতে না পারি।"

শ্রীচৈতন্যের মুখের এই কথাগুলি তাঁহার ভক্তসংঘট্ট এড়াইয়া স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কিছুকাল দেশে দেশে বিহার করিবার পক্ষে যুক্তি। এগুলি ভগবানের মুখের কথার মত নয়, সাধারণ মানুষের মুখেরই কথা।

প্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য, কবিরাজ গোস্বামী বলেন,— প্রেমভক্তি প্রচার। একালের পণ্ডিতেরা বলেন,—তাহা-ত Carrying coal to New Castle.' প্রেমভক্তির মহাতীর্থ দক্ষিণাপথ, ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহার ঐ দেশে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—ঐ দেশের ভক্তদের প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ, তাঁহাদের সঙ্গসুখ-ভোগ এবং ইষ্টগোষ্ঠীর অনুশীলন। প্রেমভক্তি প্রচার করিতে হইলে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গেই লইতেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলের ভক্তদের বলিয়াছিলেন—'সন্ন্যাস লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন, তাঁহার সন্ধানের জন্য ঐ দেশে যাইতেছি'। ইহাই উদ্দেশ্য হইলে একা যাওয়ার কি প্রয়োজন? পাঁচজন সঙ্গে থাকিলেই ত সে সন্ধান সহজ হইত। ইহা তাঁহার ছল মাত্র।

সার্বভৌম যেন মহাপ্রভুর আসল অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন—তাই

যাত্রাকালে উপদেশ দিলেন :—"গোদাবরীতীরের বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যেন ভুলিও না।"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের অধিকারে, স্বয়ং নবাব হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী, ডিহিদার, ফৌজদাররা পর্যন্ত কেহই হিন্দুধর্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের আবেগাত্মক প্রেমধর্ম-প্রচারে রীতিমত বাধা ছিল। বাঙ্গালীরা তখন শাক্তধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান লইয়া প্রমত্ত। নবদ্বীপেও প্রেমধর্ম-প্রচারে বাধা ছিল খুব বেশী। অনেক চিন্তা করিযাই শ্রীচৈতন্য বিচক্ষণ মানুষের মতই বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন। উড়িষ্যা দক্ষিণদেশ, উড়িষ্যা তখনও হিন্দু রাজার অধীন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উড়িষ্যাবাসীর মনোরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিলা দক্ষিণ দেশে॥

উড়িষ্যা ও দক্ষিণাপথে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরাই তাঁহার ভাগবতী বাণীর মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশকেও ভুলেন নাই। বঙ্গদেশে প্রেমাশ্রুসেকে তিনি ভক্তিধর্মের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত পুরীধামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য নিত্যানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেম—'সন্ন্যাসী হইয়া বঙ্গদেশকে প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করা চলিবে না, গৃহী হইয়া এদেশে প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিতে হইবে।' এ সমস্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণ মানবিক বিচক্ষণতার নিদর্শন।

মহাপ্রভু অধিকাংশ সময়ই ভাবাবেশে অপ্রকৃতিস্থ থাকিতেন

তাহার ফলে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হইত। সব সময়ই তাঁহাকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন হইত। ভুল করিয়া ফেলিলে মহাপ্রভু লজ্জাবোধ করিতেন এবং যে ভুল বুঝাইয়া দিত অথবা যে ভুলভ্রান্তি এড়াইবার সাহায্য করিত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেন।

জীবধর্ম্ম রক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্যের শাকান্নের বেশি প্রয়োজন ছিল না। তিনি সবচেয়ে ভাল বাসিতেন শাক। ভক্তদের প্রদত্ত সুখাদ্য-গুলিকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ভাবাবেশে তিনি কি যে খাইতেন তাহা বুঝিতেন না। তাহার ফলে অনেক সময় গুরু ভোজন হইয়াও যাইত। রামচন্দ্রপুরী ইত্যাদি কেহ কেহ তাঁহার ভক্তদের এই গুরুভোজন সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—সন্ন্যাসীর এত বেশি ভোজন বিধেয় নয়। ইহাতে তিনি লজ্জা পাইয়া সুখাদ্য ভোজনে বিরত হইলেন—এমনকি অত্যন্ত অল্পাহার করিয়া শরীরকে শীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে তিনি অতিভোজনের প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মানবিকতার নিদর্শন।

মানবিক দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি একবার প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বলিয়াছিলেন—

> আমিত সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি।
> দর্শন দূরে থাক প্রকৃতির নাম যদি শুনি।
> তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন
> প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন ?

এত বড় পরম সত্য কথা সন্ন্যাসীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীচৈতন্যই বলিতে পারিতেন। তিনি মানবিক জীবধর্ম্মের স্বাভাবিকতার কথা স্মরণ করিয়াই একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সঙ্গেও দেখা করিতেন না। শিখী মাহাতীর ভগিনী বৃদ্ধা মাধবী পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাকে সম্মুখে

আসিতে দেন নাই। তিনি বুঝিতেন মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তিক্ষয় অপেক্ষা দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা এবং তদ্দ্বারা শক্তিসঞ্চয় করা ঢের ভালো। এখানে শ্রীচৈতন্য তার স্বরে বলিয়াছেন—আমি মানুষ।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে তাঁহার ভাগবতী শক্তির অলৌকিক ক্রিয়ার কথার অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। যেমন চতুর্ভুজ বা ষড়্‌ভুজ-প্রদর্শন, কুষ্ঠব্যাধি-হরণ, বরাহমূর্তি-ধারণ এবং শেষে জগন্নাথদেহে বিলয়। এ যুগের ঐতিহাসিকগণ বলেন—"ভক্ত-গণের ভক্তির আতিশয্যে ঐ সকল অলৌকিক ব্যাপার তাঁহার জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। সকল মহাপুরুষের জীবনেই ঐরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনা আরোপিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের জীবনই অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, তাহাতে অলৌকিক ভূষণের কি কিছু প্রয়োজন ছিল?" তিনি দেহধারণের সকল ক্লেশই স্বীকার করিয়াছেন—জৈব জীবনের সকল প্রয়োজনেরই অনুবর্তী হইয়া চলিতেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযম অসামান্য হইলেও তাঁহার পক্ষে সে কথা তুচ্ছ। তবু তিনি একেবারে প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতেন না। কোন বৃদ্ধা রমণীও তাঁহার সাক্ষাতে আসিতে পাইত না। তিনি কামচারী ছিলেন না, অতি ক্লেশেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেন। অবশ্য প্রেমভাবে বিভোর থাকিতেন বলিয়া কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণনা করিতেন না। মানুষের দুঃখ দেখিয়া মানুষের মতই তিনি ব্যথা পাইতেন। গৌড়িয়া ভক্তদের বিদায় দেওয়ার সময় শিশুর মত রোদন করিতেন।

রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনতত্ত্ববিচার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যেভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে যেন বলা হইয়াছে তিনি রামানন্দের কাছে নূতন তথ্য কিছুই পান নাই।

রায় কহে, আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাও তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি'॥

কবিরাজ গোস্বামী আরো বলিয়াছেন :—

সহজে চৈতন্য চরিত ঘনদুগ্ধপুর। রামানন্দ চরিত্র তায় খণ্ড সুপ্রচুর॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার। যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিচার॥

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরমান্নকে রামানন্দ কর্পূরবাসিত মাত্র করেন নাই—তিনিই 'খণ্ড'-সংযোগে সম্পূর্ণাঙ্গই করিয়াছেন। এই তত্ত্ব-বিচারকালে শ্রীচৈতন্যদেব ভুলেন নাই, তিনি মানবদেহধারী।

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি প্রভু সব সঞ্চারিল॥

তিনি এই তত্ত্ববিচারে রামানন্দকেই প্রবক্তা বলিয়া প্রাধান্য দিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবনে যাহাই প্রকটিত হউক, তিনি নিজেকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলিয়া প্রচার করেন নাই। রামানন্দই এই তত্ত্বেরও আবিষ্কারক।

শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ভক্তেরা আগেই স্বীকার করিয়াছিলেন—রামানন্দ দেখিলেন তাঁহাকে মহাভাবে বিভাবিত। তাহা হইতেই রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় যে মহাপ্রভুকে রাধাভাবদ্যুতিশবলিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাহা রায় রামানন্দেরই আবিষ্কার। রামানন্দ বলিয়াছেন :—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

শ্রীচৈতন্যদেব এ সংবাদ রামানন্দের মুখেই প্রথম শুনিলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবনে এ-সংবাদের প্রভাব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দের আবিষ্কারকেই কাব্যরূপ দিবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর দেহে রামানন্দকে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপও দেখাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবসান-সম্বন্ধে নানা মত আছে। জগন্নাথদেব কিংবা টোটার গোপীনাথের দেহে বিলয় ছাড়ামহাসমুদ্রে অন্তর্ধানের কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। মহাসমুদ্রে প্রভু একবার ঝাঁপ দিয়াছিলেন—সে যাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সর্ব্বদা সঙ্গে প্রহরী থাকিলেও দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দেওয়া অসম্ভব নয়।

তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দেহের উপর বহু অনিয়মের অত্যাচার হইয়াছে, কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন এরূপ কথা তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। ব্যাধি হইলে চরিত পুস্তকে উল্লেখ না থাকিবার কারণ নাই। গয়ায় পথে তাঁহার একবার জ্বর হয়। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর
লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥

এইরূপ লোকশিক্ষার জন্যই প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যাধিত হইয়া লীলাবসান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত কিছুই নয়।

জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন—রথাগ্রে সংকীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে একটি ইষ্টকখণ্ডের আঘাত লাগে, তাহাতে তাঁহার জ্বর হয়। সেই জ্বরে তিনদিনের পর তাঁহার জীবনাবসান হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক কথা। রথযাত্রার পর

সাতদিন জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ীতে থাকিবার কথা। অতএব সম্ভবতঃ জগন্নাথদেবের সমক্ষেই গুণ্ডিচাবাড়ীতেই মহাপ্রভুর জীবনাবসান হয়। এখন প্রশ্ন এই—তাঁহার ভৌতিক দেহ কোথায় গেল? তাঁহার দেহকে চিতায় ভস্মীভূত করিবার কথা নয়, সমাধি দিবার কথা। মহাসমারোহেই সে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবার কথা। তাঁহার সমাধিস্থল ভারতের পরম তীর্থ হইত। মহাপ্রভু যখন ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন ভৌতিক দেহধারণের যে অনিবার্য পরিণতি তাহা না হইবে কেন? কোন বিগ্রহে ভৌতিক স্থূলদেহের বিলীন হওয়ার কথা আমরা কখনও কোন পুরাণে বা ইতিহাসে পড়ি নাই। একথা এযুগে কেহ বিশ্বাস করে না। বরং সমুদ্রে হারাইয়া যাওয়া বিশ্বাস্য হইতে পারে; কারণ, সমুদ্রও ত নীলমাধব, জগন্নাথের বারিব্রহ্মরূপ। কিন্তু একবার যিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে ভক্তরা পাহারা দিবে না, তাহাও সম্ভব নয়। মোটের উপর শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানতত্ত্ব রহস্যময় ভক্তি-গুহাতেই নিহিতথাকিয়া গিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা

বুদ্ধদেব হিন্দুদের কাছে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, হিন্দুরা তাঁহাকে ভগবানের নবম অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বৌদ্ধরা ভগবানের বদলে তাঁহারই মূর্ত্তি-পূজা করিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শেষ যৌবনে বোধিলাভের পর। মোহম্মদ ভগবানের অবতার নহেন, ভগবানের প্রেরিত পুরুষ। তিনিও শেষ যৌবনে সহসা একদিন ঐশ্বরিক প্রেরণা (ওহি) লাভ করেন। খৃষ্টকে God the son বলা হয়, সে হিসাবে তিনি জীবের পরিত্রাণের জন্য নরাবতার। তিনি ত্রিশবৎসর বয়সে দীক্ষার পর ভগবত্তা লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে চরিতকাররা মাতৃগর্ভ হইতেই ভগবান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর এবং গয়ার বৈষ্ণব আবেষ্টনীর প্রভাবে শ্রীচৈতন্যের জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহাতেই তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার প্রথম মহাপ্রকাশ ঘটে। নবীনচন্দ্র যেমন তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ভগবত্তার ক্রমোন্মেষ দেখাইয়াছেন, চৈতন্য-চরিতকাররা ঠিক সেভাবে চৈতন্যের জীবনে ভগবত্তার ক্রমোন্মেষ দেখান নাই। মহাপ্রকাশের পর শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া ভক্তেরা চিনিতে পারেন—তাহার আগে নিমাই পণ্ডিতকে কেহ ভক্ত বলিয়াও স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া চরিত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই! নিমাইএর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি অধ্যাপক

হিসাবে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া নয়, তর্কবিচারে অসামান্যতা দেখানোর জন্যই তাঁহাদের এই ধারণা জন্মিয়াছিল।

দিগ্‌বিজয়ি-পরাভবের রহস্যটায় পণ্ডিতগণ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হরিভক্তেরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণে না ভজেন সভে এই দুঃখ পাই॥

মহাপ্রকাশের আগে নিমাই ভক্তির মাহাত্ম্য প্রস্থাহৃত জ্ঞানের দ্বারা স্বীকার করিলেও নিজে ভক্তিপথের পান্থ ছিলেন না। চরিতকাররা ইতিহাস লিখেন নাই, লিখিয়াছেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণে কাব্য। এই কাব্য তাঁহারা রচনা করিয়াছেন চৈতন্যের ভগবত্তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। অধিকাংশ কাব্য রচিত হইয়াছে তাঁহার তিরোধানের অনেক পরে।

এই সকল চরিত-গ্রন্থে—তাঁহার ভগবত্তাকে বাল্য-কৈশোরেও প্রসারিত করা হইয়াছে—(Retrospective orderএ)। নিমাইএর সামসময়িক ভক্তকবি মুরারিগুপ্তের গ্রন্থে কিন্তু বাল্যকৈশোরে ভগবত্তা আরোপ সব চেয়ে কম।

গৌরগতপ্রাণ ভক্তেরা ভক্তিভাবে উন্মাত হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের কবিমনোভূমি শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপের চেয়ে অধিকতর সত্য হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহাদের কাছে শ্রীচৈতন্যই কেবল মাতৃগর্ভ হইতে ভগবান নহেন—তাঁহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও প্রধান প্রধান ভক্তেরাও কাহারও না-কাহারও অবতার।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই নিমাই ভগবান্ নহেন, তিনি পরম ভক্ত মাত্র। কেহ কেহ তাঁহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। যতই ধর্ম্মগ্লানি ঘটুক, বাংলাদেশেও ভক্তের অভাব ছিল না—

নদীয়াবাসীরা মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, যবন হরিদাস ইত্যাদি অনেক ভক্তকেই জানিতেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের অনেক ভক্তের কথাও তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, পুরাণেও বহু ভক্তের কথা প'ড়িয়াছিলেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ, এমন বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য তদ্গত মহাভাব কখনো চোখে দেখেন নাই, কাণেও শোনেন নাই। তাঁহারা চৈতন্যকে সাধারণ ভক্ত মাত্র মনে করিতে পারেন নাই।

ভক্তগণ সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভগবান যুগে যুগে এই ভারতভূমিতে নররূপে অবতীর্ণ হ'ন। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান হয়, তখন সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তাঁহার মর্ত্ত্যধামে আবির্ভাব ঘটে। বলা বাহুল্য, ভক্তের পুণ্যশুচি দৃষ্টিতে দেখিলে এই পৃথিবীতে সকল সময়ই মনে হইবে—ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

ভক্তেরা চারিদিকে চাহিয়া তাহাই দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তখন মুসলমানরা ভারত অধিকার করিয়া শাসন করিতেছে এবং হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণে বাধাও দিতেছে—এমন কি ছলেবলে কৌশলে মুসলমান করিয়াও লইতেছে। বৃন্দাবনদাস ধর্ম্মের গ্লানির কথা যখন বলিয়াছেন, তখন সবচেয়ে বড় গ্লানিটার কথা চাপিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেছিলেন—শ্রীভগবান্ যদি এমন দুর্দ্দিনেও অবতীর্ণ না হ'ন, তবে আর কখন অবতীর্ণ হইবেন? ভগবান যদি অবতীর্ণ হ'ন, তবে তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে—এমন কি বাংলার বাহিরেও ত অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা নবদ্বীপের ধর্ম্মের দুর্দ্দশার কথাই জানিতেন, জগতের অন্য স্থানের কথা জানিতেন না। তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেছিলেন—তাঁহাদের কাছাকাছিই নিশ্চয় তিনি অবতীর্ণ হইবেন—কারণ, তাঁহারাইত

অদ্বৈতের কণ্ঠে বারবার ডাকাডাকি করিতেছেন। এমন ডাকাডাকি জগতে আর কেই বা করিতেছে বা করিতে পারে!

অতএব ভগবানকে বরণ করিবার জন্য তাঁহাদের চিত্ত প্রস্তুত ও উন্মুখ হইয়াই ছিল। যখন নিমাইএর অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, তখনই তাঁহাদের মনে হইয়াছে নিমাই দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছেন নিশ্চয়। ইহার বেশি তাঁহারা আর কিছু ধারণা করেন নাই। চরিতকাররা নিমাইএর বাল্যজীবনে যে সকল ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়াছেন, সে সকলের সহিত ভক্তদের পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেগুলি যদি তাঁহাদের জানা থাকিত, তাহা হইলে বাল্যেই নিমাই বালগোপালরূপে বিষ্ণু-খট্টায় অভিষিক্ত হইতেন। গয়া হইতে নিমাই ফিরিয়া আসিলে ভক্তেরা তাঁহাকে যে ভাবে পাইলেন তাহাতে তাঁহারা অসামান্য প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তচূড়ামণি বলিয়াই এমন কি নিজেদের ধর্ম্মগুরুস্থানীয় বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে বাধা ছিল—ভগবান্ নিজের নামকীর্ত্তন করিয়া কাতরভাবে অশ্রুপাত করিবেন কেন? ভাগবতে চৈতন্যাবতারের যে ইঙ্গিত জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তাহা হয়ত ইঁহাদেরও জানা ছিল। কবিকর্ণপূর গীতার 'যৎযৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত তেজোবা' ইত্যাদি শ্লোক তুলিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—গীতার এই বাণীও তাঁহাদের মনে ছিল। তাহাতে তাঁহাকে 'ভাগবত তেজোঽংশোসম্ভূত' মনে হইতে পারে। তাহাতে সম্পূর্ণ দ্বিধা যায় নাই। তারপর আবিষ্ট অবস্থায় নিমাই বলিতে লাগিলেন—"আমি সেই, আমি সেই। জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নাঢ়ার আহ্বানে আমি গোলোক হইতে নামিয়া

আসিয়াছি," এবং বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া পূজা চাহিলেন, তখন ভক্তগণের ভগবান্ বলিয়া ধারণা হইল। * কিন্তু মহাপ্রভু বাহ্য অবস্থায় নিজের ভগবত্তা স্বীকার করিতেন না। ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভক্তি নিবেদন করিলে বিরক্ত ও সংকুচিত হইতেন।

ইহাতে ভক্তদের মনে ধোঁকা ধরিবার কথা। চরিতকাররা তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের চিত্রের দ্বারা এই ধোঁকা একেবারে দূর করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঐশ্বর্য্যপ্রকাশই মহাপ্রকাশ। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের কথা বাদ দিলেও ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার বাধা থাকিত বলিয়া মনে হয় না।‡

ভক্তের মধ্যে ভগবত্তার উন্মেষ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন—তাহা সুপণ্ডিতের মত—

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ।
তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎ পরাক্রমম্
ভক্তদেহে ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ॥

ভগবদ্‌ধ্যান-কীর্ত্তন এমন কি নামশ্রবণের ফলে সুমহাত্মা

* মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ। মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন॥

* * * *

যত মোর অবতার বেদেও না জানে। সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন কারণে॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস। অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ॥

(চৈতন্যভাগবত)

‡ সার্ব্বভৌম প্রথম দর্শনে চৈতন্যকে মহাভাগবত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—এই মহাপ্রেমাবেশ ভক্তের লক্ষণমাত্র নয়, ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ।

ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ হয়। তখন ভক্তদেহে পরমাত্মা ভগবানের তেজ, পরাক্রম ইত্যাদির অনুকরণ করেন।

ইহা শ্রীচৈতন্যের দেহে হরির প্রবেশ এবং হরির মত আচরণের যুক্তিমূলক সমর্থন।

আমরা দেববিগ্রহের ভগবত্তা সম্বন্ধে বলিয়া থাকি,—লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া যে বিগ্রহের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করিতেছে সে বিগ্রহে ভগবান্ নিশ্চয়ই অধিষ্ঠিত হ'ন। নরবিগ্রহ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। ভক্তদেহে হরি আসাযাওয়া করিতে পারেন—গভীর প্রেমাবেশের সময়ই ভক্তদেহে তাঁহার অধিষ্ঠান হইতে পারে, বাহ্যদশায় ভক্তদেহ ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক যে নরবিগ্রহকে ভগবান বলিয়া ভক্তি নিবেদন করে—সে নরবিগ্রহে ভগবানের স্থায়ী অধিষ্ঠান যদি না হয়, তবে কোথায় সে নির্ব্বিশেষকে পাওয়া যাইবে? যে কোন মূর্ত্তিতে যদি লক্ষ মানবের সমবেত ভক্তি ভগবানকে অবতারিত করিতে পারে—তবে যে কোন মহামানবেই তাহা পারা না যাইবে কেন? শ্রীচৈতন্য ত অসামান্য অনন্য-সাধারণ মানুষ, ভগবৎপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তাঁহার হৃদয়কে বৈকুণ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল—শত শত ভক্ত মিলিয়া তাঁহার মধ্যে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

চরিতকাররা ঠিক এই ভাবে ভগবত্তার ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহারা পুরাণের অনুবর্ত্তী হইয়া ভগবানের অবতারের মূলে বিশিষ্ট অভিপ্রায়ের কথাই বলিয়াছেন।

মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন—কলিকাল-দুষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য নারদের অনুরোধে ভগবান চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কবিকর্ণপূর বলেন—চৈতন্যাবতারের উদ্দেশ্য ত্রিতাপদগ্ধ জীবের

উদ্ধার, নামসংকীর্ত্তন-প্রধান উপাসনার প্রচার ও নির্ব্বিশেষপর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

সংকীর্ত্তনধর্ম্মপ্রচার করিয়া অধর্ম্মের প্রসার দূর করিবার ও পুনরায় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ।

শ্রীজীবাদি ব্রজের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই ভগবত্তাকে সমর্থন করিয়াছেন—ভাগবতের দুইটি শ্লোকের দ্বারা। পরবর্ত্তী সকল চরিতকারই এই শ্লোকগুলি 'উৎকলন করিয়াছেন। একটি শ্লোক—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

সত্যযুগে ভগবানের অবতারের বর্ণ শুভ্র, ত্রেতাযুগে লোহিত, ইদানীং অর্থাৎ দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ—কাজেই বাকি কলিযুগে পীতবর্ণ। গৌরাঙ্গের বর্ণ যখন পীত, তখন তিনিই ভাগবতের উদ্দিষ্ট ভগবদবতার। 'পীতবর্ণকেই' এখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জীব গোস্বামী ভাগবতকে দ্বাপরে ব্যাসের রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিকরা তাহা স্বীকার করেন না।

আর একটি শ্লোক—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

মুখে যাহার কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় কিংবা যাহার নামের অংশ কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের) এবং যিনি ত্বিষা অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ (ত্বিষা+অকৃষ্ণম্) তিনি অঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদগণ সহ সংকীর্ত্তনযজ্ঞের

দ্বারা সুমেধোগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হ'ন। প্রথম শ্লোকে পাওয়া গেল গৌরাঙ্গের বর্ণের ইঙ্গিত, দ্বিতীয় শ্লোকে সন্ধির সুবিধায় পাওয়া গেল অকৃষ্ণ ইহাকেই গৌর ধরা হইল। সবচেয়ে প্রবল যুক্তি পাওয়া গেল সংকীর্ত্তনযজ্ঞের কথায়। এই সংকীর্ত্তনের কথা ভাগবতের আরো তিনটি শ্লোকে আছে কলিযুগের মহিমাবর্ণনার প্রসঙ্গে।

১। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

২। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥

৩। কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনো।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

সংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যের আগে ভারতে অজ্ঞাত ছিল না, দক্ষিণাপথের আলোয়ার সাধকরা সংকীর্ত্তনের দ্বারা উপাসনা করিত। নবদ্বীপেও সংকীর্ত্তন হইত। কিন্তু এখানে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদের কথাও আছে। আর এমনভাবে সংকীর্ত্তন-প্রচার চৈতন্যের পূর্বে কেহ করে নাই। ইহাও লক্ষণীয়। * অস্ত্র কথাটায় অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যের কোন ইঙ্গিত নাই। অস্ত্রের একটা কৃচ্ছ্রকল্পিত অর্থ করিতে হইয়াছে। ইহা গৌরাবতারের সমর্থন হিসাবে পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বাভাস হিসাবে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তদের মধ্যে আলোচিত হইত তাহা জানা যায় না। শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যদেবকে

* পুরীধামে গোপীনাথ আচার্য্যের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাভারতের একটি শ্লোক, শ্লোক দুইটির সঙ্গে সার্ব্বভৌমের কাছে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিপাদনের জন্য প্রয়োগ করেন। সেই শ্লোকটি এই—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, তিনি রূপসনাতনের মুখে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যের অবতার না বলিয়া আবির্ভাব বলিয়াছেন। এই আবির্ভাব জিনিসটির অর্থ Subjective, Objective নয়। তবে কি শ্রীচৈতন্যের চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিভূতি প্রদর্শন ভক্তগণের পক্ষে Subjective ব্যাপার?

ভগবান বৈষ্ণবের কাছে কর্ম্মময় নহেন, লীলাময়, প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের মতে তাঁহার অবতার কার্য্যাবতার হইতে পারে না, লীলাবতারই হইতে পারে। জীবের উদ্ধার, অধর্ম্মের প্রতিরোধ, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়া ভগবানের অবতার ব্রজের গোস্বামীদের মতের বিরোধী। হইবারই কথা, ভগবানের যদি কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। ব্যর্থ হইলে ভগবত্তাই খণ্ডিত হইল। এইরূপ অভিপ্রায়ের আরোপ নিরাপদ নয়।

এই সমস্ত ভাবিয়া স্বরূপ দামোদর ও ব্রজের গোস্বামিগণের অনুবর্ত্তী কৃষ্ণদাস কবিরাজ--এমনকি কতকটা লোচনদাস, পূর্ববর্ত্তী চরিতকারদের কথার পুনরুক্তি করিলেও, লীলার জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবতার এই তথ্যটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহারা এই অবতরণে যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন—তাহা লীলারই অঙ্গ, কোন কর্ম্মের অঙ্গ নয়। "আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।"

সার্ব্বভৌম যখন বলিয়াছিলেন—কলিযুগে ভগবানের অবতার নাই, তখন তিনি গীতার 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' অথবা চণ্ডীর 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদাতদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্'—এই বাক্যের সার্থকতার উদ্দেশ্যসম্মত যে অবতার কলিযুগে তাহাই নাই বুঝিয়াছিলেন। লীলাবতার লীলার মধ্য দিয়া নিজ ভক্তিযোগের বিস্তার। এই অবতার সর্ব্বযুগেই হইতে পারে। কিন্তু

সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর আলোচনায় কবিরাজ গোস্বামী মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বরাহ, বামন ইত্যাদি অবতারকে লীলাবতার কেন বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দামোদরাদি ভক্তেরা তাই রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্যের অন্ত্য লীলা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অবতারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

"শ্রীরাধা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমা কি প্রকার, সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ হয় সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

ইহাকেই আমি লীলাবতার বলিতেছি।

ইহার ফলেই একদেহে শ্রীচৈতন্যরূপে রাধাকৃষ্ণের অবতার। শ্রীচৈতন্য লীলাবতার, লীলার পুষ্টির জন্য সখী ও মঞ্জরীরূপে সহচর, পরিকর ও ভক্তকবিদেরও অবতরণ। সংকীর্ত্তনাদি লীলারই অঙ্গস্বরূপ। ভক্তগণের পক্ষে এই লীলাস্বাদনই চরম ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে আমরা তিন শ্রেণীর গৌরানুবর্ত্তী বৈষ্ণব দেখিতে পাই।

১। একশ্রেণীর মতে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় রাধাকৃষ্ণের লীলা

আস্বাদনই মুখ্য,—সংকীর্ত্তন গৌণ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনসাধনের উপায় মাত্র।

২। একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মতে—শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপেই হউক আর গৌরাঙ্গের মধ্য দিয়াই হউক উপাস্য, কিন্তু গৌর নিত্যানন্দ-গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র উপাসনা।

৩। আর একশ্রেণীর মতে—গৌরাঙ্গই পূর্ণ ভগবান তিনিই উপাস্য। তাঁহার উপাসনা করিলেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা হইল। নররূপে তিনি যখন অবতীর্ণ তখন পূর্বরূপের আর প্রয়োজনই বা কি? গৌরপদাবলীর সংকীর্ত্তন তাঁহার উপাসনা বটে, তবে নাগরীভাবে তাঁহার ভজনাই শ্রেষ্ঠ ভজনা।

নিত্যানন্দ ছিলেন সখ্যভাবের সাধক। তিনি চৈতন্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু দাস্য ভাবে। শিবানন্দ, নরহরি ইত্যাদি ভক্তেরা গৌরনাগরের উপাসক। অতএব ইঁহাদের ভজনা নাগরী ভাবে। এ উপাসনা মধুর রসের। ভাগবতের কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মার্থের সঙ্গে নিত্যানন্দ-প্রচারিত প্রেমধর্ম্মেরই সংযোগ সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ। ব্রজের গোস্বামীদের মতবাদ ও নরহরি সরকার ঠাকুরের মতবাদ দুইই বিশিষ্ট বৈষ্ণব অধিকারীদের জন্য। নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন-প্রধান দাস্যভাবমূলক প্রেমধর্ম্মই সর্ব্বসাধারণের জন্য।

তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবরাই গৌরনাগর, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, গৌর নিতাই, গৌরগদাধর ইত্যাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভোগরাগ আরতির দ্বারা পূজা করিয়া ভক্তিধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

শেষকথা এই—শ্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু সংকীর্ত্তন, প্রেমপ্রচার ও ভাবাবেশের দ্বারা দেশের জ্ঞানবাদী দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ, রাজা ও রাজন্য-

কল্প ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ, বহু যোগী সন্ন্যাসী ইত্যাদিকে সর্ব্বহারা বা আত্মহারা প্রেমে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন—ইহা মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের নিদর্শনগুলিকে ভক্তকবিদের ভাব-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে বর্ত্তমানযুগের অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা জিজ্ঞাসা করেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান্ ভাগ্যহীন ভারতবর্ষের নদীয়ানগরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে দশম সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা তাঁহার ভগবত্তা প্রচারিত হইল—তবু দেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে একটু সাময়িক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই হইল না, সমগ্র ভারতের লোক চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িল না—একজন বিধর্ম্মীও তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, (হরিদাস আগেই বৈষ্ণব হইয়াছিলেন), বিধর্ম্মী শাসকজাতির মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভাব সঞ্চারিত হইল না, পাপের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইল না—ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? বৃন্দাবনদাস আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"যেই নবদ্বীপে প্রভু প্রকাশ পাইল। যতো ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল॥" ভক্তকবি তাই বলিয়াছেন—ভক্তিশূন্য লোকে দেখিতে পায় না, বা দেখিয়াও দেখে না—একমাত্র ভক্তেই দেখিতে পায়। তবে কি ভগবানের অবতার শুধু ভক্তদের জন্যই? দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পর ভগবানের অবতার আর-ত হয় নাই। এ দেশের সামাজিক জীবনে যে আলোড়ন আসিয়াছে—তাহা একজন মহাপুরুষের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, ভগবানের অবতারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানবজীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে একটা মন্বন্তর আসিবার কথা নয় কি? ইহাত একটা পানিপথের যুদ্ধের মত ঘটনা নয়। বহুসহস্র বৎসর পরে এই কাণ্ড। সমগ্র জগৎই

বিচলিত হইবার কথা। এ প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব পণ্ডিতরা দিতে পারেন, আমরা দিতে পারি না। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

বাঙ্গালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

কথাটা কবির রচনা-চাতুর্য্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না! তবে কি চৈতন্য কেবল বাঙ্গালীর ভগবানের অবতার?

বাঙ্গালী যুগযুগ ধরিয়া যে রসধর্ম্মের সাধনা করিয়া আসিয়াছে, সেই পুঞ্জীভূত সাধনা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে শ্রীচৈতন্যের জীবনে। ইহাইত ভাগবতী শক্তি। সমগ্রজগতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যাবতারের সম্পর্ক কি? বিশ্বনাথ যদি অবতীর্ণ হ'ন তবে সমগ্র বিশ্বের জন্যই অবতীর্ণ হইবেন, জনকতক বাঙ্গালীর জন্য নয়। প্রেমময় নারায়ণের একটা ঐরূপ অবতারের জন্য জগতের অদ্বৈতগণ তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে!

ধর্ম্মগুরু কোন এক স্থলে কোন এক সময়ে আবির্ভূত হ'ন, তাঁহার বাণীপ্রচারের স্থানকাল সীমাবদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার বাণীর মধ্যে এমন Dynamic force (Potential কিংবা Kinetic) থাকে যাহা দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশে দেশে যুগে যুগে পরিব্যাপ্ত হয়। কেবল পরিব্যাপ্ত নয়, সক্রিয়তার শক্তিও ঐ মহাশক্তির মধ্যে নিহিত থাকে। অবশ্য মানুষের মানস ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, তাহার তৃষ্ণা ও চাহিদার উপরও কতকটা নির্ভর করে। যদি তাঁহার বাণীতে ঐ মহাশক্তি প্রভূত পরিমাণে না থাকে— তবে পরবর্ত্তী অনুবর্ত্তী সাধক ভক্ত সাধুসন্তেরা ঐ বাণীতে তাঁহাদের নিজস্ব সাধনালব্ধ শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে দুর্ব্বার করিয়া তোলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বাণীর অন্তঃস্থলে যে শক্তি ছিল— তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাসাধকগণ প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের

সাধনালব্ধ শক্তি দ্বারা তাহাকে পুষ্টি ও সঞ্চরিষ্ণুতা দান করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার বাণী আজিও ভারতময় প্রচারিত হইল না। এজন্য ক্ষোভ জন্মে। বাংলাদেশে ধর্ম্মের গ্লানি যতই হউক, জয়দেব, চণ্ডীদাসের বাংলায় রূপান্তরে বৈষ্ণবধর্ম্মেরই প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, উড়িষ্যাতেত ছিলই। ঐ বৈষ্ণবতার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। সনাতনের ভাষায় কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা আবির্ভূত—তাই মনে হয় বাংলা ও উড়িষ্যার পক্ষ হইতে ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তিনি আবির্ভূত এবং ভারতের পক্ষ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি অভিনব সম্প্রদায়েরই তিনি প্রবর্ত্তক। এই সংস্কার অবশ্য খৃষ্টের মত not to destroy, but to fulfil.

চিরকালই কোন জাতিবিশেষের সংস্কারককে জাতীয় জীবনের অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনানুরূপ অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব বলিয়াই মনে করা হয়। ভগবানের অভিপ্রায় ছাড়া কোনটাই সম্ভব নয়, তাহাত শেষ কথা আছেই। অতএব কেহ যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতীর্ণ ভগবান না বলিয়া পুরুষোত্তম-রূপে জাতির ধর্ম্মজীবনেরই অবতার বলে, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক হইতে তাঁহাকে না নামাইয়া বাঙ্গালীজাতির জীবনসিন্ধু হইতে ধন্বন্তরির ন্যায় অমৃতপাত্র হস্তে উত্তীর্ণ বলে—তবে তাহাকে আমরা কি উত্তর দিব? কবি সত্যেন্দ্রনাথের মত অনেকেই ত তাহাই বলিয়াছেন। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারাও ভগবদ্ভক্ত, কিন্তু তাঁহারা ভাগবতী শক্তির সীমাবদ্ধতা, অন্যনির্ভরতা বা মোঘতা স্বীকার করেন না।

তাঁহারা মনে করেন, ভগবান যদি করুণাবশতঃ কোন জাতির মধ্যে অবতীর্ণ হ'ন তাহা হইলে তাহার জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি না হইবে কেন? সমগ্র জগতে সেই জাতিইত ধন্যাতিধন্য।

নির্বিশেষ ব্রহ্মের পক্ষে অধ্যাত্মজীবন ছাড়া অন্য জীবন মায়াময়, সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের কাছে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক জীবন দুইই সত্য। যদি ধরাই যায়, ভগবানের সঙ্গে ধর্ম্মজীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনের সম্পর্ক নাই, তাহা হইলেও বলিতে হয়—স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হইলে এই ধর্ম্মজীবন ব্যাপকভাবে শুচি, নির্ম্মল, কলিকলুষশূন্য হইয়া চির প্রবাহিত হইবে এবং ধর্ম্মজীবনের সকল বাধা বিদূরিত হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন ফল দেখিয়া তরুর বিচার করিতে গেলে শ্রীচৈতন্যদেবকে কল্পতরু বলা যায় কি না তাহা বিচার্য্য।

এই সকল সংশয়াত্মক প্রশ্নের এক উত্তর আছে—ভগবানের কাছে ৪।৫ শত বৎসর অতি সামান্য সময়। একদিন সমগ্রজগৎ শ্রীচৈতন্যের বাণী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। মানবজাতি একদিন মুক্তিপথের সন্ধান পাইবে। ব্যক্ত-মধ্যের দ্বারা সমগ্রের বিচার হয় না। একদিন মানুষ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবে, শ্রীচৈতন্য সমগ্রজগৎ ও মানবজাতির জন্যই অবতীর্ণ।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কি যতি চৈতন্যের স্বরূপাদি ভক্তগণ বলিয়াছেন ?—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই॥"

ইহাই লীলাবতার। লীলার সঙ্গে জাতীয় জীবনের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক নাই। এই অবতার কেবল বিশিষ্টশ্রেণীর ভক্তদের জন্য। আর বাংলার সাহিত্যজগতে তিনি যে সরস্বতীবল্লভ শ্রীবিষ্ণুর অবতার সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

মোহম্মদের জীবনে কোন ঐশ্বর্য্য-বিভূতির প্রকাশের কথা নাই। তাহাতে ইস্‌লাম প্রচারের বাধা হয় নাই, হয়ত তাহাতে ইসলামের গৌরবই বাড়িয়াছে। খৃষ্টের জীবনে অবশ্য ২।৩টি অলৌকিক বিভূতির কথা আছে। যিনি ঐশ্বরিক বিভূতি দেখাইতে পারেন, তাঁহাকে দেশের লোক অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া ক্রুশকাষ্ঠে বিঁধিয়া মারিয়া ফেলে কি করিয়া, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর যিনি ঐশ্বরিক বিভূতির অধিকারী—তিনি ক্রুশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই ইহাই বা কিরূপ? তবে একথা স্বীকার্য্য ঐশ্বরিক বিভূতি-প্রদর্শনের জন্য নয়, ক্রুশকাষ্ঠে জীবনবিসর্জ্জনের জন্যই খৃষ্টের ধর্ম্ম বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভূতি-প্রদর্শনটা 'বাহ্য' হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার জীবন লইয়া লোকশিক্ষার জন্য অনেক গল্প লিখিত হইয়াছিল। সেই গল্পে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের সমাবেশ হইয়াছে দেখা যায়। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ বহু লোক বুদ্ধের নবধর্ম্মের বাণীর জন্য উৎকণ্ঠ ও উদ্‌গ্রীব হইয়াই ছিল। সে বাণী প্রচারের জন্য বুদ্ধের জীবনে অলৌকিকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরে হিন্দু শ্রৌত ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়িলে তাঁহার বাণীপ্রচারের জন্য বুদ্ধের জীবনে অলৌকিকতা আরোপের বোধহয় প্রয়োজন হইয়াছিল। এইভাবে দেখা যায়, যতই দিন যায় জনশ্রুতি ধর্ম্মগুরুদের জীবনকথায় অলৌকিকতা আরোপ বাড়াইয়া দিতে থাকে।

অধ্যাপক বিমান মজুমদার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—মুরারি গুপ্তের মহাপ্রভু মায়ার কথার প্রসঙ্গে কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও শ্রীকৃষ্ণে সেই ফল অর্পণের কথা বুঝাইতে বীজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্ত দেন। মুরারি গুপ্তের অনুসরণে লোচনদাস শ্রীচৈতন্যের দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমের

আঁঠি হইতে পূরা গাছ, তাহাতে ফল জন্মাইয়া দেবতায় নিবেদন করাইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—ঐ গাছ হইতে রক্তপীত বর্ণের দুইশত ফল পাড়া হইল, ঐ ফলে ছাল বা আঁঠি নাই। আমগুলি ফজলিজাতীয়,—

আঁঠ্যংশ বল্কল নাহি অমৃত রসময়।
একফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥
এইমত প্রতি দিন ফলে বারোমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস॥

ভক্তকবির হাতে কর্ম্মফল শেষপর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের উদর পূর্ণ করিয়া প্রভুকে উল্লসিত করিয়াছে। এ যুগের লোকে এত তুচ্ছ ব্যাপারে ভগবত্তা প্রকাশ সুসঙ্গত মনে করে না।

যাহাই হউক, আমাদের দেশে কোন মহাপুরুষের শ্রুতিকথা লিখিতে হইলেই ভক্ত লেখকরা লোকোত্তর-বিভূতি কিছু কিছু সমারোপ করিতেন। ইহা একটা প্রথায় (Convention) দাঁড়াইয়াছিল। লেখকদের ভক্তির মত বিশ্বাস করিবার শক্তিও ছিল অগাধ। বিক্রমাদিত্যের জীবনকাহিনী অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। মীরাবাই, লাউসেন, চণ্ডীদাস, নানক, কবীর, শঙ্কর, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনকথায় বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। ভক্তমাল ত অলৌকিকতার মালা। অতিঅল্প দিন আগে আবির্ভূত রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনীতেও ঐ প্রথারই প্রয়োগ দেখা যায়। আজিও দেশের অধিকাংশ লোক অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে। চিকিৎসায় যাহার রোগ সারে না, সে সন্ন্যাসবেশধারী বা ধর্ম্মগুরুশ্রেণীর লোক দেখিলেই তাহার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং তাঁহাদের কাছে অষ্টসিদ্ধির অলৌকিকতার নিদর্শন প্রত্যাশা

করে। যে কোন ধর্ম্মগুরু বা ধর্ম্মব্যাখ্যাতার অলৌকিক আচরণের কথা শুনিলে লোকে অবিশ্বাস করে না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক শক্তির সমারোপ একটা কাব্যালঙ্কারস্বরূপ, ভক্তি-রসসৃষ্টির ও সতীমহিমা কীর্ত্তনের উপকরণ।

শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্য্য-বিভূতি-প্রকাশ কতটা কাব্যালঙ্কার, কতটা দাস্যরসপুষ্টির উপকরণ, কতটা যথাযথ বাস্তবনিষ্ঠ, তাহা এত কাল পরে বলা কঠিন!

শ্রীকৃষ্ণের রসাত্মক ব্রজলীলায় ত ঐশ্বর্য্য রসাভাস সৃষ্টি করে, চৈতন্যলীলায় এই আদর্শ রক্ষার চেষ্টা দেখা যায় না।

চৈতন্য-চরিতাবলীতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের নয়, তাঁহার কোন কোন ভক্তেরও বিভূতিপ্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন চরিতাখ্যানের মধ্যে এ বিষয়ে মিল নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন লীলার অলৌকিক অবসানের সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

কোন ধর্ম্মগুরু বা মহাপুরুষের জীবন-চরিত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লিখিতে গেলে বর্ত্তমান যুগে ঐশ্বর্য্য-বিভূতি বা অলৌকিকতা বর্জ্জন করা হয়। মনে রাখিতে হইবে, চরিতকারগণ ইতিহাস রচনা করেন নাই, কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যে অনেক সময় বাস্তব-জীবন ভাব বিগ্রহে পরিণত হয়। মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই 'নবদ্বীপের যত ভট্টাচার্য্য একজনাও' যদি না-ই নিঃসংশয় হইয়া থাকে, তবে ভক্তিহীন ধর্ম্মবিমুখ বর্ত্তমান যুগের লোক যদি অলৌকিক বিভূতিপ্রকাশকে কাব্যালঙ্কারই মনে করে তবে কি আর বলা যাইবে? হোরেশিওর প্রতি হ্যামলেটের সেই বাক্যেরই পুনরুক্তি করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥"

বৃন্দাবনদাসের জন্ম ও বাল্যজীবনী রহস্যাবৃত হইয়া আছে। কথিত আছে—৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ই বৃন্দাবনের মাতা বিধবা। এত অল্প বয়সে সেকালেও ব্রাহ্মণকন্যাদেরও বিবাহ হইত কিনা সন্দেহ। যদি তাহাও সত্য বলিয়া ধরা যায়—নিত্যানন্দ ৯।১০ বছরের কন্যাকে পুত্রবতী হও বলিয়া কেন আশীর্ব্বাদ করিবেন? যুবতী কন্যাকেই এই আশীর্ব্বাদ করা চলে। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহোদয় বলেন—১২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনের জন্ম হয়, ১৮ মাস তিনি গর্ভে বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সাড়ে দশ বৎসর বয়সে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয় বলিতে হয়। ইহা বিশ্বাস্য নয়। কথিত আছে, বৃন্দাবনদাস শ্রীহট্টে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয় শ্রীহট্টে নয়, কুমারহট্টে। পরিবারের সমস্ত লোক থাকিলেন নবদ্বীপে কিংবা কুমারহট্টে, আর বিধবা নারায়ণীকে পাঠানো হইল বহুদূরবর্ত্তী শ্রীহট্টে, দূর আত্মীয়দের কাছে, ইহা স্বাভাবিক মনে হয় না।

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, তখন নহিল। হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥' ইহা হইতে মনে হয়—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের আগে বৃন্দাবনের জন্মই হয় নাই। মহামহোৎসব শ্রীচৈতন্যের নদীয়ালীলা। এই মহামহোৎসব নিতান্ত শিশু থাকিলেও দেখা সম্ভব নয়—কিংবা নদীয়া হইতে দূরে থাকিলেও সম্ভব নয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস 'জন্ম হইল না' না বলিয়া 'তখন নিতান্ত শিশু ছিলাম'—বলিতে ত পারিতেন। তাঁহাই বলা স্বাভাবিক ছিল। সম্ভবতঃ

বৃন্দাবনের জন্ম শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের অনেক পরে হইয়াছিল। মহাপ্রভু পুরীতে ১৮ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থির হইয়া ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের সময় বৃন্দাবনের বয়স এত অল্প ছিল যে, সে বয়সে পুরী গিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করাও সম্ভব হয় নাই। সম্ভবতঃ অল্প বয়সে বৃন্দাবনের শ্রীগৌরাঙ্গভক্তির এমন কিছু উন্মেষও হয় নাই, যাহাতে মাতামহদের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া মহাপ্রভুকে দেখিতে যাইতে পারেন। মহাপ্রভু এত অল্প বয়সে অপ্রকট হইবেন—ইহা কেহই ভাবে নাই; বৃন্দাবনদাস ত বালকমাত্র। নারায়ণীও বৈষ্ণবগৃহিণীদের সঙ্গে পুরী যাইতেছেন—একথাও কেহ বলে নাই। শ্রীমুখদর্শনে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া যে বৃন্দাবনদাসের আক্ষেপ, তাহা জন্ম না হওয়ার জন্য নয়, পুরী যাওয়া হয় নাই বলিয়াই।

জগবন্ধুবাবু বলিয়াছেন—১৪।১৫ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন—কিন্তু একটি হরীতকীসঞ্চয়ের জন্য নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে পথেই ত্যাগ করিয়া যান। কারণ, সঞ্চয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়।

গোবিন্দ ঘোষের গল্পটা বৃন্দাবনদাসের ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসী না হইয়া কি মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য পুরী যাওয়া চলিত না? যাঁহারা যাইতেন তাঁহাদের সকলেইত সংসারী; বৃন্দাবন ত বালকমাত্র। তাঁহার সন্ন্যাসের কালও তখন উপস্থিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য রাশি রাশি খাদ্য ভক্তেরা বহিয়া লইয়া যাইতেন, রাঘবের ঝালি যাইত সারা বৎসরের ভোজনবিলাসের জন্য—তাহাতে দোষ হইল না; যত দোষ হইল বালক বৃন্দাবনের একটি হরীতকীসঞ্চয়ে? ইহা বিশ্বাস্য নয়। তাহা ছাড়া, বৃন্দাবনদাস নিজেও ত এত বড় ঘটনার উল্লেখও করেন নাই।

এই সমস্ত অসঙ্গতি দূর করিয়া দিয়াছে প্রেমবিলাসগ্রন্থ। "কুমারহট্ট নিবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ যেঁহো। তাঁহার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ। বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে॥" (প্রেমবিলাস)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়—নারায়ণী বাল বিধবা ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন অন্ততঃ ১৫।১৬ (আরো বেশি হইতে পারে) তখন বৃন্দাবনকে গর্ভে লইয়া তিনি বিধবা হ'ন। ইহাতে নিত্যানন্দের আশীর্ব্বাদ, মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভোজন বা মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজনের দ্বারা শক্তিসঞ্চার ইত্যাদি মূল্য থাকে না। কুমারহট্টে বৃন্দাবনের জন্ম চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ত বটেই—বোধ হয় অনেক পরে। সেকালে বিধবাবিবাহ নিশ্চয়ই ছিল না।

নিত্যানন্দের আশীর্ব্বাদ ও মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বৃন্দাবনদাসকে প্রভুব মানসপুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবভক্তেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া দিয়া উদ্ধবদাসেব পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ইহাতে বর্ত্তমানযুগের অবৈষ্ণব সমালোচকদের নানা প্রকার অনুমান করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে।

জগতের মধ্যে ভক্ত বৈষ্ণবসমাজই সব চেয়ে উদার। সে সমাজের কাছে ভক্তিই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব। ভক্তের পক্ষে জাতিজন্মের মূল্য কিছুই নাই। এই কথা স্মরণে রাখিলে ভক্তচূড়ামণি বৃন্দাবনদাসের জন্ম লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের আদেশে শ্রুতিনির্ভর চৈতন্যচরিত রচনা করেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন---'তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।'

চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর কথা প্রায় অর্দ্ধাংশ, তাঁহার

মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কবির মতে নিত্যানন্দ, অনন্তদেবের অবতার স্বয়ং বলরাম। নিত্যানন্দের মহিমাকীর্ত্তনে তাই কবি অনন্তদেব ও বলরামেরও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং শেষদেব হইলেও শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্তের পূজা ভগবানের পূজার চেয়ে বড়, অতএব নিত্যানন্দের পূজাই আগে বিধেয়। একসঙ্গে গৌরনিতাইএর বন্দনা করিয়া 'যুগধর্ম্মপালৌ সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ' বলিয়া দুইজনকে ভক্তি অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। কবির মতে দুইজনকে পৃথক করিলে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের' দশা হইবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন তাঁহার গ্রন্থে গুরু রঘুনাথদাসকে স্মরণ করিয়া শক্তির বোধন করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস তেমনি নিত্যানন্দকে বারবার স্মরণ করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া লইয়াছেন।

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে অবতরণের কারণ বলিয়াছেন—সংকীর্ত্তন প্রচারের দ্বারা পাতকী জীবের উদ্ধার। রাধার ঋণ পরিশোধ, রাধাভাবে প্রেমাস্বাদন, ব্রজের দেহভেদগত অঙ্গহানির পরিপূরণ ইত্যাদি গৌরাবতারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

তিনি গীতার—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই শ্লোক দুটি তুলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন—বঙ্গদেশে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল এতই প্রবল যে, ভগবানের অবতীর্ণ হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল।

শুধু বাঙ্গালায় নয় সমগ্র ভারতেই ধর্ম্ম, ভক্তিহীন শুষ্ক অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব, পৌরোহিত্যাধীন ও উৎসবপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চ্চনাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। এজন্য ভারতের বহু স্থলেই এই সময় সাধুসন্তগণের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদ ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে ভারতের অন্যান্য স্থানের কোন কথা নাই—বাঙ্গালাদেশের ধর্ম্মের গ্লানির কথাই আছে।

বৃন্দাবনদাস বিশেষ করিয়া নবদ্বীপের কথাই বলিয়াছেন—

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক শুধু এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়।
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥
যেবা সব বিরক্ত ও তপস্বী অভিমানী।
তাংসভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥

*　　　*　　　*

বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্যকোলাহল।

না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥

কবি বলিতেছেন—হোসেন সাহের আমলে লোকের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু পারমার্থিক অধঃপতন হইয়াছিল চরম।

যাহারা সংসারবিরাগী তাহারাও কখনো হরিনাম করিত না। সন্ন্যাস একটা অভিমানের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। সার্ব্বভৌম ইহাই লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য মহাপ্রভুকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। খুব যে ব্যক্তি পুণ্যবান্ সে কেবল স্নানের সময় একবার 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ মাত্র করিত। অধ্যাপকরা গীতা ভাগবত পড়াইতেন, কিন্তু তাহাতেও ভক্তিধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিত না।

নবদ্বীপে ধর্ম্মের এই দুর্গতি দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু অস্থির ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন—তিনি ভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বার বার বলিয়াছেন—

'অদ্বৈতের কারণে তাঁহার অবতার।'

এইভাবে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যাবতারের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ গঙ্গাতীর হইতে দূরে দূরে অশুচি দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—ঐ সব অশুচি অঞ্চলের লোকদের উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে পরম বৈষ্ণব সাধকগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল; অদ্বৈত প্রভু নিজে গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর ও শ্রীবাসের কয় ভাইকে লইয়া শ্রীবাসের বাড়ীতেই কৃষ্ণগুণগান করিতেন। ইহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা রীতিমত ভয় পাইয়াছিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—

যবনরাজ যদি শোনে,—নবদ্বীপে হরিনামকীর্ত্তন হয় তাহা হইলে নবদ্বীপের মহাবিপদ ঘটিবে। সেজন্য তাহারা শ্রীবাসকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইবার সংকল্প পর্য্যন্ত করিয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যাবতারের একটি স্তব রচনা করিয়া শচীগর্ভস্থ শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে ব্রহ্মাদি দেবতার স্তব বলিয়া গ্রন্থে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। সেজন্য সকলেই গঙ্গাস্নানে গিয়া হরিনাম করিয়াছিল, পথে পথে হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল—

যেবা মুখে জন্মেওনা বোলে হরিনাম। সেহ হরিবলি ধায় করি গঙ্গাস্নান॥

ফলে, ভক্তিহীন নবদ্বীপে সেদিনকার মত চন্দ্রগ্রহণের অনুরোধে একটা ভক্তির আবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্যই এই অনুকূল আবেষ্টনীর সৃষ্টি। সুরচিত কতকগুলি পদের দ্বারা বৃন্দাবনদাস এই আবেষ্টনীর সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥

চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে গগনের পূর্ণচন্দ্রকেত মুখ ঢাকিতেই হইবে।

বৃন্দাবনদাস গৌরচন্দ্রের প্রসঙ্গে কোথাও গুরু নিত্যানন্দকে বিস্মৃত হ'ন নাই, শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথির কথা বলিতে গিয়াও বলিয়াছেন—

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী। গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্বযাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি। সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥

চৈতন্যভাগবত ইতিহাস নয়, পূরা কাব্য বা জীবনচরিতও নয়। ইহা 'চৈতন্যপুরাণ'। এই পুরাণের ব্যাসদেব বৃন্দাবনদাস। পুরাণের স্বরেই তিনি বলিয়াছেন—

গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেইজনে। কভু দুঃখ নাহি তার জীবনে মরণে॥

শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে। জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের বাল্যলীলা লইয়া অনেক পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন—ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ইতিহাস বিশেষ কিছু নাই। শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথাই নানা কল্পিত দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখানো হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের নামকরণ অনুষ্ঠানে নারীগণ নিমাই ও পুরুষগণ বিশ্বম্ভর নাম নির্দ্দেশ করেন। শচীদেবীর অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর শ্রীচৈতন্যের জন্ম। যমকে ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে অতিশয় তিক্ত নাম দেওয়া হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন।

ডাকিনী শাঁকিনী হইতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম নিমাই থুইল॥

শ্রীচৈতন্য যে বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন, সে বৎসরে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং দেশ ধন ধান্যে পূর্ণ হয়। সে জন্য পুরুষগণ ইঁহার নাম দিলেন বিশ্বম্ভর।

বাল্যকালে নিমাই সত্যই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন—কি—বৃন্দাবনদাস ব্রজগোপালের দুরন্তপনা নিমাইএ আরোপ করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। চৈতন্যভাগবত অনেকটা শ্রীকৃষ্ণভাগবতের অনুসরণ। ভক্তেরা বলেন—আবাল্য শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া বাল্যে বালকৃষ্ণের মত আচরণ করিতেন। এমন কি—'করয়ে বসন চুরি বোলে বড় মন্দ।' উপক্রুতা বালিকারা শচীমাতার কাছে নিমাইএর নামে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল—

পূরবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার। সেই মত সব করে নিমাঞি তোমার॥

বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্যে ভগবত্তা ক্রমোন্মেষিত হয় নাই—শ্রীচৈতন্য ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে ভাবে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বালক

নিমাইকেই স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া চিনিতে কাহারও বাধা থাকিবার কথা নয়, অতএব চৈতন্যভাগবতে বিজ্ঞানসঙ্গত ঐতিহাসিকতার সন্ধান না করাই ভালো।

বৃন্দাবনদাস বালক চৈতন্যের জীবনে অনেক অলৌকিকতার কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—অতিথি সন্ন্যাসীকে অষ্টভুজরূপ-প্রদর্শন। বহুবার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে রসাভাস ঘটিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বৃন্দাবনদাস বাল্যলীলার বর্ণনায় বাৎসল্যরসের বিলাস দেখাইতে পারিয়াছেন। নিমাইএর উপদ্রবে যাহারা বিব্রত, তাহারা নিমাইএর মাতাপিতার কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু মাতাপিতা শাসন করিতে গেলে তাহাকে স্নেহভরে আগলাইয়া রাখে, শাসন করিতে দেয় না। নদীয়ার নরনারী বার বার বিড়ম্বিত ও উপদ্রুত হইয়াও দুর্ললিত শিশুটিকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এই ভালবাসা নিমাইএর ভগবত্তার জন্য নয়—কারণ, তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া বালককে চিনিতে পারিতেছে না। নিমাইএর অলোকসামান্য রূপের মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয় যাহা অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলের অন্তরে বাৎসল্যের সঞ্চার করিতেছে। কাব্যের দিক হইতে ইহা বড়ই হৃদ্য।

তাহারা বলিতেছে—

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে। তবু তারে থুইলাঙ হৃদয় উপরে॥

সখ্যভাবের কথাও আছে চৈতন্যভাগবতে। ব্রজগোষ্ঠের বদলে গঙ্গা, আর গোচারণের স্থলে সখাদের সঙ্গে জলক্রীড়া। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ব্রজগোপালের গোষ্ঠলীলারই গৌরচন্দ্রিকা।

জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলেন। ইহাতে জগন্নাথ ভাবিলেন—বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্র পড়িয়া সংসার অসার অনিত্য

জানিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল—নিমাইকে আর পড়িতে দেওয়া হইবে না। নিমাইএর পড়া বন্ধ করা হইল, কিন্তু তাহাতে নিমাইএর দৌরাত্ম্য বাড়িয়া গেল। নিমাইএর জেদের জন্য নিমাইকে আবার টোলে পাঠাইতে হইল। যেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘরের সকল ছেলেই পড়াশুনা করে—সেখানে কোন একটি ধীমান বালককে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা চলে না। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকতা আছে।

বৃন্দাবনদাস নিমাইএর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন—জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্নের মধ্য দিয়া। এই স্বপ্ন কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত।

বৃন্দাবনদাস কিশোর নিমাইএর কোপনতা ও দৌরাত্ম্যের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এইরূপ—একদিন গঙ্গাস্নানের আগে নিমাই জননীকে মাল্যচন্দন চাহিলেন। শচীমাতা বলিলেন, 'অপেক্ষা কর, মালা আনিয়া দিতেছি।' ইহাতে নিমাই এত কুপিত হইলেন যে গৃহের সমস্ত দ্রব্য ভাঙ্গিলেন—ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্যাদি নষ্ট করিলেন এবং লাঠি লইয়া ঘর ও গাছপালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ভাঙ্গার পর ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন প্রভু এত যে কুপিত হইলেন, তিনি 'তথাপিহ জননীরে না মারিল গিয়া'।

এই যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার লইয়া একটা দক্ষযজ্ঞ, ভক্তকবির পক্ষে ইহার বর্ণনার সার্থকতা কি? ইহাতে শুধু শচীমাতাকে সর্ব্বংসহা যশোদায় পরিণত করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নাই। জননীর অপরাধ কিছুই নাই। অল্পদিন আগে মিশ্রের তিরোভাব হইয়াছে—জননী শোকসন্তপ্তা—অতিদরিদ্রের সংসার, নিমাই করুণাসিন্ধু। এই অকারণ কোপ নিমাইএর একটা অভিনয় ছাড়া আর কি হইতে পারে? নিমাইএর দ্বারা বহু অপচয় করাইয়া কবি তাহার ক্ষতিপূরণ

করিয়াছেন—নিমাইএর হাতে দুই তোলা সোনা দিয়া। এই সোনা কোথা হইতে আসিল শচীমাতাও ঠিক করিতে পারেন নাই—আমরাও পারিলাম না! এইরূপ চিত্র আমাদের মনে রসাভাস ঘটাইয়া দেয়।

নিমাইএর বাল্যলীলা-বর্ণনার পরে নিত্যানন্দের পূজারী বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দরও একটি কাল্পনিক বাল্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। এই বাল্যলীলা রামায়ণ ও ভাগবতের কতকগুলি লীলার অভিনয়।

নিত্যানন্দের তীর্থপরিক্রমার বর্ণনাচ্ছলে কবি ভারতের প্রত্যেকটি তীর্থের নাম করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র মিলনের চিত্রটি বৃন্দাবন দাস ভক্তিভরে বর্ণনা করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়ন করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের এই কয় চরণে তাহারই দ্যোতনা আছে, মনে হয়।

> তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
> দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥
> জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
> ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
> পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
> বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥

বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী দুইজনেই বলেন নিমাইএর প্রথম বিবাহ পূর্ব্বরাগসঞ্জাত। যে নিমাই কয়েকবৎসর পরে গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁহার প্রথম বিবাহ। ইহাতে মনে করা অসঙ্গত হয় না যে, তখনও তাঁহার জীবনে ভগবত্তা উন্মেষিত হয় নাই।

নিত্যানন্দ কি এই ভগবত্তা উন্মেষের জন্য তীর্থে তীর্থে প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন? অদ্বৈত প্রভু তাই ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেন—'আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।'

নিমাই যখন টোল খুলিয়া ছাত্রদের পড়াইতেন, তখনও নবদ্বীপে হরিগুণগান হইত শ্রীবাসের গৃহে। মুকুন্দ ছিলেন মূল গায়ক। নিমাই তখন পাণ্ডিত্যমদে মত্ত, তিনি তর্ক করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিয়া বেড়াইতেন, ব্যাকরণের কঠিন সমস্যার কথা তুলিয়া পণ্ডিতদের জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি হরিগুণগান এড়াইয়া চলিতেন, মুকুন্দ, মুরারি—এমনকি শ্রীবাসও নিমাই পণ্ডিতের আটোপ-টঙ্কার হইতে আত্মরক্ষার জন্য পলাইয়া বেড়াইতেন। সেকালের পণ্ডিতরাও ভাগবত পড়িতেন ও পড়াইতেন, কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হরিকীর্ত্তনে মাতিতে হইবে তাঁহারা এইরূপ মনে করিতেন না।

কেহ বোলে—কত না পড়িলুঁ ভাগবত;
নাচিব কাঁদিব হেন না পাইলুঁ পথ ॥

নিমাইও এই দলে ছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিমাইএর বাল্য পৌগণ্ডে যতই ঐশ্বর্য্যবিস্তারের নিদর্শন দি'ন—নিমাইপণ্ডিতের আচরণে তিনি ইহা সংবরণ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—নিমাই বিতর্কে সর্ব্বশাস্ত্রেই সকলকে পরাস্ত করেন, কিন্তু কি বিষয় লইয়া তর্ক, তাহার পক্ষ-প্রতিপক্ষ কি, তাহা তিনি কোথাও বিস্তারিত করিয়া বলেন নাই। তাহাতে মহাপ্রভুর বিদ্যাবত্তার কতকটা পরিচয় সকলেই পাইতে পারিত।

কে পরস্মৈপদের স্থলে আত্মনেপদী ক্রিয়া ব্যবহার করিল, সে দিকে তাঁহার খরদৃষ্টি ছিল। প্রভু "পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর।"

বৃন্দাবনদাস নাগর নিমাইপণ্ডিতের নগর-পরিভ্রমণের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—তাহার মধ্যে শ্রীধর-সম্মেলনটি বড়ই রসাত্মক!

বৃন্দাবনদাস দিগ্‌বিজয়ি-পরাভবের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা নিমাইকে 'শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের' অধ্যাপক বলিয়া জানিত। অতএব তাহারা প্রত্যাশাই করে নাই, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ দিগ্‌-বিজয়ীকে নিমাই পরাভূত করিতে পারিবেন। নিমাই অতিযত্নসহকারে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। বাকি সকল শাস্ত্র বৃন্দাবনদাসের মতে ভাগবতী শক্তিতে তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছিল। কি বিষয় লইয়া দিগ্‌বিজয়ীর সঙ্গে নিমাইএর বিতর্ক হইয়াছিল, দিগ্‌বিজয়ীর রচনাবলীর কোথায় কোথায় নিমাই দোষ ধরিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস এসমস্ত কিছুই বলে নাই। মোটের উপর দিগ্‌-বিজয়ীর পরাভব নিমাইএর পাণ্ডিত্যের কাছে নয়, তাঁহার ভাগবতী শক্তির কাছে। দিগ্‌বিজয়ী একথা স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলেন।

দিগ্‌বিজয়িপরাভব প্রসঙ্গটির অবতারণাই হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভাগবতী শক্তিবলে যে সর্ব্বশাস্ত্র অধিগত তাহাই দেখাইবার জন্য। গূঢ়তর উদ্দেশ্য এই,—দিগ্‌বিজয়ী সরস্বতীর বরপুত্র—তিনি ভারতের সকল পণ্ডিতকে জয় করিয়া জয়পত্র অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাকেও নিমাই পাণ্ডিত্যে হারাইলেন। এমন যে পাণ্ডিত্য তাহাও 'এহো বাহ্য', তাহাও তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর প্রেমের কাছে! নিমাইএর এই হিমাচলোপম পাণ্ডিত্য—বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নয়, দিগ্‌বিজয়ী অশ্বকে আবদ্ধ করিয়া প্রেমের অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস ইহা করিলা বিস্তার। স্ফুট নাহি করে দোষগুণের বিচার॥

কবিরাজ স্ফুট করিয়া বিচার করিয়াছেন। ইহাতে নিমাইএর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তৃত্ব প্রমাণিত হয় নাই, আলঙ্কারিক কৃতিত্বেরই প্রমাণ হইয়াছে। দিগ্‌বিজয়ী বলিয়াছিলেন—'তুমি ব্যাকরণ' জানো স্বীকার

করি—অলঙ্কারের কি জানো ?' সেজন্য আলঙ্কারিক ক্ষেত্রেই নিমাই দিগ্‌বিজয়ীকে পরাজিত করিলেন। দিগ্‌বিজয়ী একশত শ্লোক অনর্গল বলিয়া গেলেন—নিমাই শ্রুতিধর, তিনি তন্মধ্যে একটি শ্লোক উদীরণ করিয়া তাহার অলঙ্কার বিচার করিয়া পাঁচটি দোষ বাহির করিলেন—তাহাতেই দিগ্বিজয়ীর পরাভব। ইহা কোন সমস্যা লইয়া বিতর্ক নয়, একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভবের পক্ষে ইহা যথেষ্ট-ত নয়ই—অকিঞ্চিৎকর বলা যাইতে পারে।

মোটকথা, নিমাইএর ভাগবতী শক্তির কাছে দিগ্‌বিজয়ীর সারস্বতী শক্তির পরাভব। শ্রীচৈতন্য পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্যই অবতীর্ণ। নানাভাবেই তিনি এই দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন ঐশ্বর্য্য না দেখাইয়া দোষ দেখাইয়া দর্পচূর্ণ করিতেছেন—তাহাই দেখানো হইতেছে। অবশ্য বিভূতিও ছিল বিচারের অন্তরালে—পরে সরস্বতীর স্বপ্নের অন্তরালে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভগবত্তা-প্রকাশের আগে ইহাই তাঁহার দৈবীশক্তি-প্রদর্শনের দ্বারা পাণ্ডিত্যের অভিমানের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

বৃন্দাবনদাসের মতে দিগ্বিজয়ি-পরাজয়ের পরে, কবিরাজ গোস্বামীর মতে উহার আগে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন। বলা বাহুল্য, ইহা প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নয়, নবদ্বীপের জ্ঞানগৌরব-প্রচারের জন্য। সে দেশে গিয়া তিনি শতশত পড়ুয়া লাভ করেন এবং বহু ধনসম্পদ লইয়া আসেন। পূর্ববঙ্গে থাকিতে তাঁহার সহিত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্রকে তিনি জ্ঞানোপদেশ দান করেন, তিনি যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবেন—সেই প্রেমধর্ম্মের মহিমা বুঝাইয়া তাঁহাকে কাশীবাসী করান। ইহাও তাঁহার প্রেমবিজয় নয়, জ্ঞানেরই বিজয়।

তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানকালে লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ

করেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—প্রভুর বিচ্ছেদ-বেদনায়, কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 'বিরহসর্পের দংশনে।'

দিগ্‌বিজয়ি-পরাভবের পর হইতে নিমাই পণ্ডিতকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিমাই সমস্ত প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্র-সেবায় ও অতিথিসেবায় ব্যয় করিতেন।

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন বটে—নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে। সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥ কিন্তু গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহের বর্ণনা অনাবশ্যক বিস্তারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন। জীবন চরিতের দিক হইতে ইহার মূল্য যৎসামান্য, কাব্যের দিক হইতে কিছু সার্থকতা আছে। কিছুদিন পরে যিনি সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, তাঁহার বিবাহের ঘটা ও ঐশ্বর্য্যের ছটার অসারতা ও মায়াময়তা প্রদর্শনে একটা গূঢ় অভিপ্রায় থাকিতে পারে। যে বস্তু অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহার গুরুত্ব দেখাইলে ত্যাগেরই গুরুত্ব দেখানো হয়।

বৃন্দাবনদাস যবন হরিদাসকে যে-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—তাহাতে হরিদাসই মহাপ্রভুর অগ্রদূত—অদ্বৈত আমন্ত্রক মাত্র। হরিদাসই মহাপ্রভুর পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

হরিদাস সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস একাধিক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—হরিদাস বৈষ্ণবভক্ত হওয়ার জন্য লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এই লাঞ্ছনালাভেও তিনি হরিনাম ছাড়েন নাই। ইহাতেই বিচারকের শ্রদ্ধা উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং হরিদাস স্বাধীনভাবে ধর্ম্মসাধন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

অলৌকিকতার ফল একটা এই হয়—অলৌকিক কিছু দেখিলে লোকে দলে দলে বিভূতিমানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, ধর্ম্মোপদেশের প্রয়োজন হয় না। হরিদাসের অলৌকিকতা যাহারা চোখে দেখিয়াছে তাহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিবে কেন? হরিদাসের অসামান্য প্রেমভক্তি কি সহস্রসহস্র নরনারীর মতিপরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তনের দ্বারা নামধর্ম্ম ও ভাবাবেশের দ্বারা প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে হরিনাম-সংকীর্ত্তন চলিতেছিল--তবে তাহা নগরসংকীর্ত্তনে পরিণত হয় নাই। মহাপ্রভু এই সংকীর্ত্তনকে দেশময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ খৃষ্টের মত নদীয়ায় মুখে মুখে কোন ধর্ম্মোপদেশ দেন নাই। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহার ঐশ্বরিক বিভূতি দেখিয়াছিল, তাহাও তাঁহার আদেশে গোপনই রাখা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রকাশ্যভাবে কোন অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তবে বিভূতিপ্রকাশের কথা কি গোপন থাকে? কিন্তু অভক্তের কাছে যে ঐ সবই যেন ভেল্‌কি!

নিমাইপণ্ডিতের দিগ্বিজয়ি-পরাভবে যে টুকু অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার ফল ফলিয়াছিল এই যে,—নিমাইকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া বিদ্বৎসমাজ জানিতে পারিয়াছিল, নিমাইএর পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা সারাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে শচীমাতার গৃহ ধনসম্পদে ভরিয়া গিয়াছিল। নিমাইএর দ্বিতীয় বিবাহের বর্ণনায় কবি তাহার আভাস দিয়াছেন।

মহাপ্রভু পিতৃপিণ্ড-দানের জন্য গয়া যাত্রা করিলেন। গয়ার পথে তাঁহার জ্বর হইল।* বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন "লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।" কোন ঔষধে জ্বর ছাড়িল না। বিপ্রপাদোদক-

পানে জ্বর ছাড়িল! ব্রাহ্মণের মহিমা (ভক্তের মহিমা নয়) বুঝাইবার জন্য এবং এইভাবে লোকশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এই জ্বরলীলা। দেশের লোক ব্রাহ্মণের মহিমাইত ভাল করিয়া বুঝিত, ভক্তের মহিমা তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে শিখে নাই।

গয়াধামের পবিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাতের ফলে তাঁহার মহাভাবাবেশের সঞ্চার হইল। ইহা যতটা আকস্মিক মনে হয়, বৃন্দাবনদাসের মতে তাহা ততটা আকস্মিক নহে। পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীধরের সহিত রঙ্গরস, তপনমিশ্রের সহিত মিলন, দিগ্বিজয়ীকে উপদেশদান ইত্যাদির মধ্যে নিমাই-এর ভগবদ্‌ভক্তির নিদর্শন কবি আগেই দিয়াছেন। আগে একবার নিমাই পণ্ডিতের প্রেমাবেশ হইয়াছিল—তাহা অবশ্য স্থায়ী হয় নাই। ইহাকে লোকে বায়ুব্যাধি মনে করিয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের মতে মহাপ্রভু আত্ম-প্রকাশের যথাযথ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর প্রভাব যেন তাঁহাকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করিল—ইহাই কবি বলিতে চাহিয়াছেন। মহাপ্রভুর আত্ম-প্রকাশের আলোক পশ্চাদ্‌দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া কতটা সেই আলোকে কবি আদি খণ্ডকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন—তাহা বলা শক্ত।

বৃন্দাবনদাস বলেন—বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ থাকায় নবদ্বীপের লোক এত কাল তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। বিষ্ণুমায়ামুক্ত নয়নে দেখিলে জন্মকাল হইতেই মহাপ্রভুর আচরণ ঐশ্বর্য্যময়। ঐতিহাসিকরা বলেন—ভগবদ্‌ভক্তির অঙ্কুর অধ্যয়ন অধ্যাপনার জঞ্জাল ও ব্যাকরণের সূত্রের লূতাজালের অন্তরালে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, স্থানকালপাত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশের ফলে তাহা অন্ধকার হইতে আলোকে শ্যামল গৌরবে সহসা উদ্ভিন্ন হইল।

আত্মপ্রকাশের পর মহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া গদাধরকে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিল হয়।

প্রভু বোলে—"গদাধর, তোমার স্বকৃতি
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলে দৃঢ় মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন দোষে॥"

প্রেমোন্মাদে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই গয়া হইতে ফিরিলেন। উদ্ধত নিমাই আজ তৃণাদপি স্বনীচ। বৃন্দাবনদাস তাঁহার ঐ অবস্থার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন—

"নিরবধি শ্লোক পঢ়ি করয়ে ক্রন্দন।
কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বোলে অনুক্ষণ॥
কথনো কথনো যবে হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥

তাঁহার মুখের বুলি হইয়াছিল—

'কৃষ্ণ রে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।'
'কৃষ্ণ রে বাপরে মোর পাইমু কোথায়?'
'কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে'।

শচীমাতাকে প্রভু বলিয়াছিলেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

এই সকল উক্তি হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেশের প্রাথমিক স্তরে

শ্রীভগবান সম্বন্ধে কি রসরূপ ছিল তাহা অনুধাবনীয়। প্রভু দাস্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া স্নানার্থীদের সেবা করিয়া বেড়াইতেন।

নিমাইএর প্রেমাবিষ্ট উন্মত্তভাব দেখিয়া অনেকে ভাবিল—পূর্ব্বের বায়ুরোগ যাপ্য ছিল, প্রকট হইয়াছে। শ্রীবাস বুঝিতে পারিলেন—প্রভুর শরীরে মহাভক্তিযোগ। অদ্বৈত স্বপ্নে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত। তখনও—'প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ'।

তারপর একদিন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে শ্রীবাসের সম্মুখে প্রকট হইলেন এবং বলিলেন—

তোর উচ্চসংকীর্ত্তনে নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্বপরিবারে॥

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ক্রমে নিমাই একে একে চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ, বরাহমূর্ত্তি, নরসিংহমূর্ত্তি, শঙ্করমূর্ত্তি ইত্যাদি বিবিধরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীবাসের গোষ্ঠীর সকলেই চতুর্ভুজরূপ দেখিল।

এইবার মুরারির পালা। মুরারিগুপ্তের সমক্ষে বরাহমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশের একটি চিত্র আছে। তারপর নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলন এবং ষড়্ভুজরূপে আত্মপ্রকাশ।

পুরাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কবি বলিয়াছেন—নিত্যানন্দ বলদেবভাবে আবিষ্ট হইয়া 'মদ আনো, মদ আনো' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ এক ঘটী গঙ্গাজলকে মদ বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এই ব্যাপারটি কাব্যালঙ্কার মাত্র—ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাতে রস পান।

বিষ্ণুখট্বায় আরোহণ করিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে অদ্বৈতের কাছে মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু আর আত্মগোপন

করিতে পারিলেন না—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনের ফলে তাঁহার পূর্ণাবির্ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

এইমত সর্ব্বসেবকের ঘরেঘরে। কৃপায় ঠাকুর জানালেন আপনারে ॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার। আনন্দস্বরূপচিত্ত হইল সবার ॥

পুণ্ডরীক-প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়—অনাসক্ত ভাবে যে বিষয় ভুঞ্জন করে, সেও ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়। রায় রামানন্দের মত পুণ্ডরীক ছিলেন বিলাসী, ভোগী ও বিষয়ী। তিনিও মহাপ্রভুর প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন। অন্তরঙ্গে ভক্তি থাকিলে বহিরঙ্গের রূপে বা বহিরুপাধিতে কিছু আসে যায় না—বিদ্যা-জাতিকুলের মত বেশভূষা ও ভোগাড়ম্বরও 'বাহ্য' মাত্র। শ্রীধরকেও কৃপা করিয়া প্রভু নিজমূর্ত্তি দেখাইলেন। শ্রীধর মহামূর্খ খোলাথোড় বেচিয়া কোন প্রকারে একবেলা অন্নসংস্থান করে। নিমাই পরিহাস করিয়া বলিতেন 'তোমার অনেক গুপ্তধন আছে'—এই গুপ্তধন যে কি তাহা মহাপণ্ডিতেরা একদিন দেখিলেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে শ্রীধরের কাহিনীটি অপূর্ব্ব কবিত্বময়, প্রেমধর্ম্মের এমন চমৎকার নিদর্শন আর নাই।

ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এসকল চৈতন্যের ভৃত্য ॥
কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ বেশকুলে।
অহঙ্কার বাড়ি যায় পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥
খোলা বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি ॥

যবন হরিদাসের কথা এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখযোগ্য। বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভক্তদের চেয়ে এই হরিদাস ঢের বড়। হরিদাস ইস্‌লাম (সেকালের রাজধর্ম্ম) ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। সহজে কেহ

ইস্‌লাম ত্যাগ করে না, তাহার উপর ভীষণ রাজকীয় শাসন। ভক্তি-ধর্ম্ম আশ্রয় করার জন্য এত লাঞ্ছনা, এত নিগ্রহ কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের মহাভাবাবেশ জন্মিবার আগেই হরিদাসের মহাভাবাবেশ হইয়াছে। সেজন্য হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যের অগ্রদূত বলিয়াছি। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

জাতিকুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁহার বিলাস॥
হরিদাসস্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের অজস্রবার ঐশ্বর্য্যবিভূতি-প্রকাশের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সারা দেশে না হউক নবদ্বীপে একজনেরো অভক্ত থাকিবার কথা নয়। একজনেরও শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সম্বন্ধে অবিশ্বাস থাকিবার কথা নয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

যেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ পাইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল॥

শ্রীবাসের দাসদাসী, মুরারিগুপ্তের দাসদাসী যে প্রসাদ পাইল, 'কেহো মাথা মুণ্ডাইয়া' তাহাও দেখিল না।

যে ভট্টাচার্য্যদের প্রতিবেশের গণ্ডীর মধ্যে এত বড় কাণ্ড হইল, সেই ভট্টাচার্য্যদের কেহই দেখিল না কেন? ইহার একটি উত্তর কবি মুকুন্দের মুখে দিয়াছেন—

বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তিশূন্যের কারণ ॥

কবি বলিয়াছেন ভক্তিশূন্যতাই ইহার কারণ। দুর্য্যোধন বলিয়াছিল —ও সব ইন্দ্রজাল—ও সব ইন্দ্রজাল আমিও দুই চারিটা জানি। দুর্য্যোধন শুধু ভক্তিশূন্য ছিল না, ভীতিশূন্যও ছিল! কিন্তু নদীয়াবাসীরা ত ভীতিশূন্য ছিল না, লোভশূন্যও ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে লোকে যদি কাহারও মধ্যে কোনরূপ অলৌকিক শক্তির একটু আঁচও পায়, তাহা হইলে তাহারা ভয়ে, ভক্তিতে কিংবা লোভবশতঃ দলে দলে তাহার চরণে আশ্রয় লয়। এই বাঙ্গালীইত সেকালেও ছিল। তাহাদের মধ্যে কি স্বাভাবিক বিস্ময়মুগ্ধতাও ছিল না?

জগাই-মাধাই-উদ্ধার নিমাই-নিতাইএর প্রেমসাধনার অনন্য-সাধারণ কীর্ত্তি। বৃন্দাবন দাসের রচনায় চক্রের আবির্ভাবে ও চতুর্ভুজ মূর্ত্তিপ্রকাশে গৌরাঙ্গের মহিমা বাড়ে নাই। কবি প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইয়াছেন—কেবল অসামান্য মাধুর্য্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। জগাইমাধাই উদ্ধারের প্রসঙ্গে আসিয়াছে যমরাজ-সংকীর্ত্তন। ইহাতেও গ্রন্থের মহিমা কিছুই বাড়ে নাই। গৌরাঙ্গ সকল ভক্তের সম্বন্ধেই কিছু না কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, বিশুদ্ধ মাধুর্য্যে কিনিয়াছেন শুক্লাম্বরকে তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে মুঠামুঠা ক্ষুদ খাইয়া। আমাদের প্রাণের গৌরকে শ্রীধরের হাত হইতে কলার খোলা এবং শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে ক্ষুদ কাড়িয়া লওয়ার মধ্যে যেমন করিয়া পাই, তেমন করিয়া পাই না কোন বিভূতি-বিস্তারে! শ্রীকৃষ্ণ-সুদামার মধুর মিলনটি এখানে মনে পড়ে।

অদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুরে এবং মুরারিগুপ্তের সঙ্গে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর রঙ্গলীলার বর্ণনা সাহিত্যেরও সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্যভাগবতের গৌরাঙ্গদেব প্রায় সব সময়েই ঐশ্বর্য্যভাবে আবিষ্ট। নগরভ্রমণকালে শুঁড়ির দোকানের পাশ দিয়া যাইবার সময় মদের গন্ধ পাইয়া তাঁহার বলরাম-ভাবের আবেশ হইল। তিনি শুঁড়ির দোকানে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন—শ্রীবাস পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে থামাইলেন।

এখানে নিত্যানন্দের পক্ষে যাহা হইবার কথা তাহা বিশ্বম্ভরে আরোপিত হইয়াছে। বলরামের সঙ্গেই বারুণীর সম্বন্ধ পৌরাণিক ঐতিহ্যে অপরিহার্য্য হইয়া আছে।

সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনদ্বেষী কাজীর ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে ঘরে আগুন দিতেও চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তদের অনুনয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কাজীর দর্প চূর্ণ করিয়া মহাপ্রভু বিজয়ী হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছু থাকিতে পারে, কারণ, এটা হোসেনশার আমল, মুর্শিদকুলিখাঁর আমল নয়। কিন্তু কাব্যের দিক হইতে এই চিত্রে রসাভাস ঘটিয়া যাইতেছে না?

শ্রীবাসের অঙ্গনই গৌরচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান লীলাস্থল—তাঁহার অঙ্গনই কীর্ত্তনের মূর্চ্ছনায় ও কীর্ত্তনীয়াদের ভাব-মূর্চ্ছায় পবিত্র। শ্রীবাসের প্রেম-ভক্তির ও চরিত্রের অসামান্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে—নিম্নলিখিত ঘটনায়। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—এদিকে গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন ও প্রেমনৃত্য চলিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়া উঠিতেছে। শ্রীবাস তাহাদের বলিলেন— "তোমরা রোদন সংবরণ করিয়া শান্ত হইয়া থাক—ঠাকুরের নৃত্যসুখ ভঙ্গ না হয়।

কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুদৃশ্য দেখার পর হইতে মহাপ্রভুর চিত্ত চঞ্চল হইল। তারপর ক্রমে তাঁহার মনে হইল—গৃহস্থ থাকিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে না। নবদ্বীপেই দিন দিন ভক্তিধর্ম্মদ্বেষীর সংখ্যা না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী না হইলে এদেশের লোক ধর্ম্মকথা শুনিতে চায় না—

"সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোক করে নমস্কার।" তাহা ছাড়া নবদ্বীপে কতকগুলি অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত জীবন কাটাইলে জীবের উদ্ধার হইতে পারে না—সমগ্র দেশে প্রেমধর্ম্ম বিলাইতে হইবে। তাহা করিতে গেলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। এই সমস্ত ভাবিয়া গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের কিছুদিন পূর্ব হইতে গৌরাঙ্গদেব ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিয়াছিলেন। ভগবানের আবার সন্ন্যাস কি? সন্ন্যাসের সার্থকতা দেখাইবার জন্যই যেন বৃন্দাবনদাস সন্ন্যাসের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে গৌরাঙ্গকে সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শচীমাতাকে গৌরাঙ্গদেব কপিলের ভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তবু শচীমাতা ত মানবী। যশোদার মত তাঁহার বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসে ঐশ্বর্য্যভাব একেবারে নাই। তাঁহার বেদনার কথা কবি বর্ণনা না করিয়া পারেন নাই। কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ একেবারেই তোলেন নাই। হয়ত এবিষয়ে কবির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। লোচনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট নিমাইএর বিদায়দৃশ্য বড়ই করুণ। কাটোয়ায় গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের চিত্রের মত করুণ

চিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নাই। বৃন্দাবনদাসের কাজ এইখানেই একরূপ শেষ। এখানেই বৃন্দাবনের পক্ষে মাথুর।

ভারতময় প্রেমধর্ম্ম প্রচার ও জীবের উদ্ধারের জন্য এই সন্ন্যাসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তদের পক্ষে ইহা বজ্রশেল। তাঁহারা-ত যাহা পাইবার তাহা পাইয়া ছিলেন—সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহাদের কাছে গৌরাঙ্গের মহিমা কিছুই বাড়ে নাই। তাঁহারা হাহাকার না করিবেন কেন? বহু ভক্তই বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় ভক্তেরা মথুরার শ্রীকৃষ্ণের মত সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে প্রাণের ঠাকুর মনে করেন না।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। এখানে তাঁহার মাতৃদর্শন হইল। ভক্তগণ প্রভুর বিরহে একেবারে মৃতপ্রায়। তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভুর অন্তরে করুণার উদ্রেক হইল। তাঁহারও ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইতে কম বেদনাবোধ হইতেছিল না। চৈতন্যের এই মানবিক হৃদয়-ধর্ম্ম আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। বৃন্দাবনদাস ভক্তগণ ও তাঁহাদের ভগবানের মর্ম্মবেদনার বর্ণনা করিয়াছেন বড় করুণ স্বরে। ফলে, এই অংশ কবিত্বের দিক্ হইতেও চমৎকার হইয়াছে। 'চিরদিনের জন্য যাইতেছি', শ্রীচৈতন্য প্রাণ ধরিয়া একথা বলিতে পারিলেন না। নীলাচল-যাত্রার আগে তাই বলিলেন, "আমিও আসিব দিন কথোক ভিতরে।"

শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রা করিলেন—নিঃসম্বল হইয়া, "নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ" * * *

জগন্নাথদর্শন করিয়া মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্রীচৈতন্যকে গৃহে লইয়া আসিলেন। সার্ব্বভৌম বুঝিতেই পারিলেন না—জগন্নাথ দেখিয়া এমন করিয়া আছাড়

পড়ে কোন্ মানুষ! তিনিত প্রত্যহই জগন্নাথ দেখিতেছেন, তিনিত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও বেশ স্থির হইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহচরগণ আসিয়া পৌছিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদেরও জগন্নাথ দেখাইতে লইয়া গেলেন। পথে সাবধান করিয়া দিলেন—

স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা।
পূর্ব্ব গোসাঞির মত কেহো না করিবা।
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে।

জ্ঞানযোগী সার্ব্বভৌম কখনও এমন দৃশ্য দেখেন নাই, প্রেম-যোগীর ভাবাবেশ কিরূপ তিনি জানেনই না।

মহাপ্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, আমি তোমার আশ্রয় লইলাম। তুমি আমাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দাও।" সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তুমি সন্ন্যাসী হইলে কেন? সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিলেই ত মুক্তি। সন্ন্যাসী হইলে দেশশুদ্ধ লোক প্রণাম করে, তাহাতে অহঙ্কার জন্মে। সকলের প্রণাম লওয়া অপরাধ। ক্রমে সন্ন্যাসীর বিশ্বাস হয়—সে নিজেই ভগবান। সন্ন্যাসী হইতে হয় বুড়া বয়সে। যৌবনের প্রারম্ভে কেন সন্ন্যাসী হইলে?" প্রভু বলিলেন—"আমি সন্ন্যাসী নই। কৃষ্ণ-বিরহে শিখাসূত্র ঘুচাইয়া পাগল হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছি।" কৃতপক্ষে চৈতন্য সে-সন্ন্যাসী নহেন যে-সন্ন্যাসী নিজের মুক্তির জন্য গৃহত্যাগ করেন। তিনি নিজে চিরমুক্ত, লোকসংগ্রহের জন্য তাহার সন্ন্যাসবেশ—কবিকঙ্কণ ঠিকই বলিয়াছে—'কপটে সন্ন্যাসী [illegible]জি।' সন্ন্যাসবেশ ধারণ না করিলে লোকে প্রেমভক্তির কথা শোনে —গৃহস্থ সাধুর প্রতি লোকের ভক্তি নাই। দেশময় প্রেম বিলাইতে ও

জীব উদ্ধার করিতে এই 'ভেখ' তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ধরিতে হইয়াছে। সে কথা তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন না।

সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের ১৩ রকমের ব্যাখ্যা করিলেন। —তারপর মহাপ্রভু নিজের বহুবিধ ব্যাখ্যা দিলেন। এসব ব্যাখ্যা কি তাহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—তাহাও সনাতনে শক্তিসঞ্চারের সময়ে। বৃন্দাবন চৈতন্যের ষড্‌ভুজ মহাপ্রকাশ দেখাইয়া সার্ব্বভৌমবিজয় সমাপ্ত করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্য দেবকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া চিনিলেন, প্রভুর আদেশে গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাও প্রভুর বিভূতির বিজয়, প্রেমভক্তির বিজয় নয়। বৃন্দাবনদাস কোথাও বড় শ্রীচৈতন্যের অসামান্য মনুষ্যত্বের বিজয় দেখান নাই—সর্ব্বত্রই তাঁহার ভগবত্তারই বিজয় দেখাইয়াছেন।

পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী, কিন্তু বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসী নহেন—তিনি বনে বা পর্ব্বতগুহায় সাধনভজন করিতে যান নাই—তাঁহার সাধনভজনের স্থান জনারণ্য, ঘনারণ্য নয়। চির জীবন তিনি লোকালয়েই ছিলেন। পুরীধামেও শ্রীবাসের গৃহের মত ভক্তবৃন্দের সমাগম হইল। পরমানন্দ আসিলেন, দামোদর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, প্রদ্যুম্নমিশ্র, ভগবান আচার্য্য, নরসিংহ ইত্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।

* * * *

বৃন্দাবনদাস তারপর প্রভুর মথুরা যাইবার পথে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌড়ে আসিয়া নবদ্বীপের নিকটেই বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আশ্রয় লইলেন। লোকসংঘট্ট এড়াইবার জন্য মহাপ্রভু গোপনে ফুলিয়া আসিলেন।

ফুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে আসেন।

এ অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল সব চেয়ে বেশি। হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া রাজ্যে হুকুম জারি করিলেন—কেহ যেন এই হিন্দু সন্ন্যাসীর উপর কোন উপদ্রব না করে। তিনি যেখানে খুসী সংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতে পারেন।

রামকেলি হইতে চৈতন্য ফিরিয়া শান্তিপুরে আসিলেন, তাঁহার মথুরা যাওয়া হইল না। কেন? তাহা কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী বরং বলিয়াছেন। রামকেলির পথে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে দেখা হয় নাই—তাহাদের টানেই কি ফিরিয়া আসিলেন? অদ্বৈতের গৃহে প্রভুর মাতৃদর্শনও হইল। এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত।

অদ্বৈতের গৃহে ভোজনোৎসবের বর্ণনা আছে—এই ভোজনোৎসবের কথা অন্যত্রও আছে। বহুপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য চৈতন্যের ভোজনের জন্য নানা স্থান হইতে আসিত। কিন্তু একটি কথা ভুলিবার নয়—

আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত ভক্ত অনুচর।
শাকের মহিমা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥

পানিহাটিতে রাঘবের গৃহে খাইতে বসিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—'এমত কোথাও আমি খাই নাই শাক।' মনে রাখিতে হইবে শাক-অন্নই মহাপ্রভুর কাছে সকল ভোজ্যের রাজা। দেহধারণের জন্য তাহার বেশি তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহার রসনায় অনবরত কৃষ্ণনামের মাধুরী, পৃথিবীর কোন খাদ্য তাঁহার রসনায় রুচিকর হইতে পারে না। ভক্তবৎসল প্রভু কেবল ভক্তমনোরঞ্জনের জন্যই শাকান্ন ছাড়া অন্য খাদ্যও গ্রহণ করিতেন।

শান্তিপুর হইতে প্রভুর আগমন কুমারহট্টে শ্রীবাসের ভবনে। অদ্বৈতের গৃহে কবি ভোজ্যসম্পদের প্রাচুর্য্যের বর্ণনা করিয়া শ্রীবাসের গৃহের অকিঞ্চন অবস্থার আভাস দিলেন। পাশাপাশি দুই গৃহের বিপরীত-ভাবাপন্ন চিত্রপ্রদর্শনের একটা সার্থকতা আছে।

গৌড় হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। পুরীধামে প্রতাপরুদ্র উদ্ধারের কাহিনী চৈতন্যভাগবতের চেয়ে চৈতন্য চরিতামৃতে কবিত্বময় ও নাটকীয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে রাজা প্রেমাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের পদসংবাহন করিতেছিলেন, —সহসা তাহা শুনিয়া প্রভুর বাহ্যদশা হইল। তিনি বলিলেন—

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাই দিনু আলিঙ্গন ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

রায় রামানন্দ যাঁহার সখা, সচিব, উপদেষ্টা তাঁহার মন যে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চৈতন্যভাগবতের শ্রীচৈতন্য প্রীত হইয়া রাজাকে বলিয়াছেন—"তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়। তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ হেথায়। সবে একখানি বাক্য রাখিবা আমার। মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার।" মহাপ্রভু সকলকেই নিজের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের কথা গোপন রাখিতে বলিতেন, কিন্তু নিজে গোপন রাখিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—

তব আহ্বান আসিবে যখন সে কথা কেমনে করিব গোপন।
সকল বাক্য সকল কর্ম্ম প্রকাশিবে তব আরাধনা।

ভক্তের পক্ষে যে কথা, ভগবানের পক্ষেও সেই কথা॥ ভগবানের পক্ষে, 'তব আহ্বান'—ভক্তের আহ্বান।

গৌড়দেশের মূর্খ নীচ দরিদ্র পতিত অধমদের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্য

নিত্যানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন কিনা তাহা চৈতন্যভাগবতে নাই।/ নিত্যানন্দ গৌড়দেশে ফিরিয়া নানারূপ অলৌকিক বিভূতি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ শিষ্যগণসহ গঙ্গার দুইতীর ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহচরগণ সকলেই গোপরাখালভাবে আবিষ্ট। "বেত্রবংশী শিঙা ছাঁদ দড়ী গুঞ্জাহার। তাড়খাড়ু হাতে পায়ে নূপুর সভার।" চোরদস্যুরাও প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ গঙ্গার দুইতীরে একটা বিরাট বৈষ্ণবসমাজও গড়িয়া তুলিলেন। নিত্যানন্দের চরিত্রে একটা স্বাতন্ত্র্যভাব ছিল, মহাপ্রভু বরাবর এই স্বাতন্ত্র্যভাবের সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাহচর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া নিত্যানন্দ নিজের স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিতে প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ করিয়া বিলাসী নাগররূপ ধারণ করিলে অনেকে আবার নিত্যানন্দকে ভাবক ভক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে অভিযোগও পৌছিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোকের পক্ষে এই ছদ্মবেশের মর্ম্ম বুঝা বড় কঠিন। বিশেষতঃ তাহারা গৌরাঙ্গদেবকে মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়াছে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—'পদ্মপত্রে কভু যথা না লাগয়ে জল। এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল।'

গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥

জনসাধারণ তাহা কি করিয়া বুঝিবে ?

চৈতন্যভাগবতের নীলাচল-লীলা গৌড়ীয় লীলারই পরিশিষ্ট।

নীলাচলের কথা ইহাতে সামান্যই আছে—বৃন্দাবন-গমন, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, রামানন্দমিলন ইত্যাদি ইহাতে নাই। রামকেলি হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীচৈতন্যের গৌড়বিহারের কথাই অন্ত্য লীলার অনেকাংশ—তাহার চেয়ে বেশি নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রেমপ্রচারের কথা। নীলাচলের কথা সামান্য যাহা আছে, তাহারও অধিকাংশ গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী। অতএব চৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ গৌড়ীয় এবং অর্দ্ধেক গৌরীয়; বাকি অর্দ্ধেক গৌড়ীয় ভক্তদের, বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দের মহিমার কথায় পরিপূর্ণ।

চরিতামৃতকার যেমন গুরু দাস-রঘুনাথের চরণ স্মরণ করিয়াছেন বার বার,—বৃন্দাবনদাস তেমনি নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ না করিয়া কোন পরিচ্ছেদ আরম্ভ বা শেষ করেন নাই। শ্রীবাসের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে।
তথাপি আমার চিত্তে নহিবে অন্যথা। সত্যসত্য তোমায় কহিনু এই কথা।

নিত্যানন্দ প্রভু আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন প্রৌঢ় বয়সে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গ চ্যুত হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া দুইটি বিবাহ করেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন। এই কারণেও কেহ কেহ বোধ হয় তাঁহার নিন্দা করিত।

কবি নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাই বলিয়াছেন—
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ। নিত্যানন্দনিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন। গঙ্গাও তাহারে দেখে করে পলায়ন।

শ্রীচৈতন্যের মুখের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে॥"

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দচরিত্রে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য তিনটি

ভাবের সমাবেশ দেখাইয়াছেন—নিত্যানন্দ নিমাইএর সঙ্গে সখ্যভাবেই মিলিত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বলদেবের অবতার—ভ্রাতৃভাব সখ্য ভাবেরই অন্তর্গত। 'সঙ্গী, সখা, নয়ন, ভূষণ বন্ধু, ভাই,' হইয়াও দাস্যভাবে তিনি গৌরাঙ্গের সেবা করিতেন, তিনি যখন বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিতেন, তখন লক্ষ্মণভাবে বিভাবিত হইয়া মাথায় ছত্র ধরিতেন, আবার বাল্যভাবে তিনি শচীমায়ের কাছে আবদার করিতেন, শ্রীবাসপত্নী মালিনীর স্তন্যপান করিতেন। মালিনী ভাত খাওয়াইয়া দিলে তবে নিত্যানন্দ ভাত খাইতেন।

তাঁহার বালচাপল্যের অনেক দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন—দিগম্বর হইয়া লম্ফঝম্প দিতেও তাঁহার লজ্জা হইত না, নিত্যানন্দ ছিলেন যেন বিশ্বম্ভরের চেয়েও বাহ্যজ্ঞানহীন। তাই বিশ্বম্ভর অনেক সময় নিত্যানন্দকে তিরস্কার করিতেন।

হরিদাসও তাঁহার চাপল্যের অনেক পরিচয় দিয়াছেন—যেমন কুম্ভীরে ভরা গঙ্গায় সাঁতার, ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়া শিব সাজা, গোরুর দুগ্ধ দুহিয়া খাওয়া, গোয়ালের দধি মাখন কাড়িয়া খাওয়া ইত্যাদি।

নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের প্রায়ই কলহ হইত—এ কলহ কর্ণের সঙ্গে ভীষ্মের কলহের মত নয়, ইহা রসকলহ। দুই জনের মধ্যে গভীর প্রেম মান-অভিমানের মধ্য দিয়া রস-কলহে পরিণত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসকলহ উপভোগ করিতেন—যেমন উপভোগ করিতেন চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসকলহ। ইহাকে তরজা-কলহ বলা যাইতে পারে। তর্জা সঙ্গীতের অঙ্কুর ইহাতে নিহিত আছে।

আগে নিত্যানন্দকে নমস্কার না করিয়া মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে নমস্কার করিয়াছিলেন—সে-জন্য গৌরাঙ্গ তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং যথোচিত শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষা লাভ করিয়া—

আনন্দে মুরারিগুপ্ত ঘরেতে চলিলা। নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥

পুরীধামে নিত্যানন্দ কিছুকাল মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে কখন কি করিয়া বসেন, এই ভয়ে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে জগন্নাথ দেখিতেন—তাহার বেশি আগাইতেন না। বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দ একদিন বেদীর উপর উঠিয়া বলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার গলার মালা নিজের গলায় পরিলেন। তিনি যে জীবন্ত বলরাম পুরীধামেও বৃন্দাবনদাস তাহা প্রচার করিলেন।

চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে, এক-এক স্থলে মনে হয় গৌরচন্দ্রমা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যেখানে নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে আসিয়াছে, সেখানে বলিবার কিছু নাই—কিন্তু কারণে অকারণে যথাস্থানে অযথাস্থানে সর্ব্বত্রই নিত্যানন্দের কথা আসিয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে নিত্যানন্দের স্তব আছে। তাহা ছাড়া ভণিতায় গৌরনিতাইএর নাম যুগনদ্ধভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

বৃন্দাবনদাস বলিতে চাহিয়াছেন—নিত্যানন্দকে বাদ দিলে গৌরচন্দ্র অপূর্ণ। আদি-মধ্যলীলায় তাহা সত্য হইতে পারে, অন্ত্যলীলায় তাহা নয়। গৌড়ীয় আদর্শে তাহা সত্য হইতে পারে, ভারতীয় আদর্শে তাহা নয়। রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপের পাশে বলরামের স্থান নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালায় লিখিত হইলেও সারা ভারতের সম্পদ, চৈতন্যভাগবত সারা বাঙ্গালার প্রাণের সম্পদ। চরিতামৃত প্রধানতঃ বিদ্বৎ-সমাজের জন্য রচিত, চৈতন্যভাগবত জনসাধারণের জন্য। ইহা

কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত লোকশিক্ষার বাহন, গ্রামে গ্রামে পঠিত, গৃহে গৃহে অভ্যর্চিত।

অনেকের মতে চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক, দুইয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণাঙ্গ 'গৌরচরিত।' চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলাই বা গৌড়ীয় লীলাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ঐ লীলার কথা সূত্রাকারে বলিয়া বহির্বঙ্গের লীলার কথাই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। চরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিষ্কর্ষ, চৈতন্যচরিত-সিন্ধুবিমথিত অমৃত।

বৃন্দাবনদাসের গৌরাঙ্গদেব ঠিক নরহরি সরকার ঠাকুরের নদীয়া-নাগর না হইলেও, নবদ্বীপই তাঁহার প্রধান লীলাক্ষেত্র। নদীয়ালীলাই তাঁহার কাছে বরং মাথুর। বৃন্দাবন দাসের মতে যেন 'নবদ্বীপং পরিত্যজ্য' তিনি মনোলোক হইতে 'পাদমেকং' দূরে যান নাই।

কবিরাজ গোস্বামীর মতে যেন সন্ন্যাসের পরই আসল গৌর-লীলার আরম্ভ। নদীয়ায় তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নীলাচলে তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট, রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার। সংকীর্তন আরাধনার প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু 'এহো বাহ্য।' দাস্যভাব হইতে ক্রমোন্মেষের ধারায় মধুররসের সাধনায় সমুন্নতিই চরম উপাসনা।

চৈতন্যভাগবতে দাস্যভাবেরই প্রাধান্য। মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া বারবার ভক্তগণের নিকট দাস্য ভক্তিই চাহিয়াছেন, আবার বাহ্য দশায় ভক্তগণের প্রতি নিজে দাস্যভাবের আকিঞ্চনই প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ একই দেহে উপাসক ও উপাস্যকে পাইয়া অনেক সময় মহাফাঁপরে পড়িতেন।

দাস্যভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবলারতি-মূলক ভজনার প্রতিষ্ঠাই চরিতামৃতের লক্ষ্য।

চৈতন্যভাগবত বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যধারারই যেন একখানি কাব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন ইহাতে নিজের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। নরহরি ঠাকুর ইত্যাদি ভক্তেরা গৌড়দেশে শ্রীকৃষ্ণের স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গেরই অর্চনার প্রবর্তন করেন। মনে হয়, তাঁহারা নিত্যানন্দ-প্রবর্তিত চৈতন্যভাগবতের মতবাদ হইতেই তাহার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মত ইহাতে কাব্যাংশের উৎকর্ষসাধনের জন্য অনেক অনাবশ্যক খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

চরিতামৃতকার চরিতাখ্যানের ছলে বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বের সদৃষ্টান্ত পরিস্ফুটন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের মহাভাবাবেশময় নীলাচল-লীলার মধ্য দিয়া। ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বহু শ্লোক তুলিয়া ভক্ত কবি তাঁহার বিবৃতির পোষকতা করিয়াছেন। চিত্রাত্মক কাব্যাংশ বরং ইহাতে দুর্বল।

চৈতন্যভাগবতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্যে গৌরাঙ্গের মানবিকতা যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মহাপ্রভু যে মানুষও ছিলেন, তাঁহার মানবিক দ্বিধা দুর্বলতাও যে ছিল, তাহা চরিতামৃতে ভক্তকবি বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

চৈতন্যভাগবতে দাস্য-ভক্তির চরম পরিণতি দেখানো হইয়াছে। দাস্যভাবের প্রধান অভিব্যক্তি মহিমাকীর্তন। কবি বলিয়াছেন—ভক্তিভরে হরিনাম-কীর্তন করিলেই জীবের মুক্তি। এই নাম-কীর্তন আপামর সাধারণ সকলেরই অধিগম্য। তাই চৈতন্যভাগবত সর্ব্ব-সাধারণের ধর্ম্মগ্রন্থ।

পুরীধামে মুখে না বলিলেও চরিতামৃতের শ্রীচৈতন্য নিজের

জীবনের ভাবাবেশ ও দিব্যোন্মাদের মধ্য দিয়া যে পথের আভাস দিয়াছেন, তাহা সাধনমার্গে খুব বেশী দূর অগ্রসর বিশেষাধিকারীর জন্য। রায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব-বিচারে ও রূপ সনাতনের শক্তিসঞ্চারচ্ছলে শ্রীচৈতন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন এবং বলাইয়াছেন, চরিতামৃতের তাহাই চরম কথা। এই চরম কথাটিতে পৌছিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের আদি ও মধ্য লীলার সূত্রাকারে বর্ণনার মধ্য দিয়া দ্রুতপদে সঞ্চরণ। আদি লীলা ইহারই ভূমিকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবতের গৌরলীলা গৌড়েই পরিসমাপ্ত। গৌড় স্বয়ং ভগবানকে সাক্ষাৎ নরতনুতে পাইয়াছে। ইহার বেশি তাহার প্রয়োজন নাই। এই ভগবান রায় রামানন্দ বা স্বরূপ গোস্বামীর 'রাধাভাবদ্যুতিশবলিত' 'স্বর্ণাঙ্গরূপ' কৃষ্ণস্বরূপ নহেন।

বৃন্দাবনদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নবকলেবর দিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের মনোভূমি গৌরের জন্মভূমি নবদ্বীপের চেয়ে অধিকতর সত্য।

নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন বিশেষ করিয়া সখ্যভাবে আবিষ্ট। তিনি শ্রীচৈতন্যের মধুর ভাবসাধনার সঙ্গী বা আস্বাদক হইবার পূর্ণ অবসর পান নাই। তিনি গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া অনাসক্ত সংসারী সাধক হইয়া দাস্যভক্তি-ধর্ম্ম ও গৌরাঙ্গমাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁহার গৌরাঙ্গ নীলাচলে থাকিলেও নদীয়ার গৌরাঙ্গ হইয়াই ছিলেন। এই নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবত " রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের নিজস্ব ভাবকে কেবল দাস্যভাবই বলিতে হয়। এজন্যই বোধহয় তাঁহার গ্রন্থে মুহুর্ম্মুহু গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য বিভূতি আরোপিত হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য্যারোপ বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের পরিপন্থী হইলেও মাধুর্যেও দাস্যের স্থান আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহারস-সাধনায় বৃন্দাবন দাসের প্রচারিত দাস্য ভাবকে প্রাথমিক স্তর বলা যাইতে পারে।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের মুখ্যাংশের জন্য বৃন্দাবনদাসের কাছে ঋণী নহেন। তিনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর কাছে ঋণী। তবু তিনি বার বারই বৃন্দাবনদাসের উদ্দেশে পরম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভরে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহাতে কবিরাজ গোস্বামীর আদর্শ-বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি শুধু 'তৃণাদপি নীচ তরোরিব সহিষ্ণু' ছিলেন না, 'অমানিনে মানদ'ও ছিলেন। কত অমানীকে তিনি মান দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস-ত রীতিমত বৈষ্ণবসমাজের মাননীয়ই ছিলেন। মাননীয়কে তিনি অতি মাননীয় করিয়াছেন। পূর্বসূরিদের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয়—তাহা কবিরাজ গোস্বামী আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাসের গুরু মধুরভাবের সাধক রঘুনাথ দাস নহেন, সখ্যভাবের সাধক নিত্যানন্দ। মধুর ভাবের সঙ্গে যেন তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরিব সহিষ্ণুতা ও দৈন্য-আকিঞ্চনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মধুর ভাবের চরম রাধা-ভাব, আমি সে ভাবের কথা বলিতেছি না। আমি রুক্মিণী-চন্দ্রাবলী-ভাবের কথাই বলিতেছি,—যে ভাবের মধ্যে বক্রতা বা অসহিষ্ণুতা একেবারেই নাই। সখ্যভাবের সঙ্গে বিশেষতঃ নিত্যানন্দী (বা বলভদ্রী) ভাবের সঙ্গে বীরভাব ও কতকটা অসহিষ্ণুতার ভাব জড়িত আছে। বৃন্দাবন দাস বলেন, নিত্যানন্দ লাথি মারিয়া বৌদ্ধ বিজয় করেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন বৈষ্ণবসমাজের অভিভাবক শিবানন্দ সেনকে লাথি মারিয়া তিনি ধন্য করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাসের শিষ্য কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্য-আকিঞ্চন ও সহিষ্ণুতা নিত্যানন্দশিষ্য বৃন্দাবনদাসে নাই।

নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবনদাস বার বারই বলিয়াছেন :

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মাঁরো তার শিরের উপরে ॥"

চৈতন্যভাগবতের নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। লোচনদাস চৈতন্য মঙ্গল লেখার পর বৃন্দাবনদাসের কাব্যের নামকরণ করিলেন চৈতন্য ভাগবত স্বয়ং জননী নারায়ণী, সম্ভবতঃ নদীয়ার বৈষ্ণবাচার্যগণও। এই নামকরণের সার্থকতা আছে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত যতদূর সম্ভব মিল রাখিয়া বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, সেজন্য ইহাকে বাঙ্গালার ভাগবত বলা ঠিকই হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্য যদি ভাগবতই হয়, তবে তাঁহাকে ব্যাসই বলিতে হয়।

চারিটি দিক হইতে এই গ্রন্থ বিচার্য্য :—১। ইতিহাস, ২। কাব্য, ৩। তত্ত্বগ্রন্থ, ৪। ধর্ম্মগ্রন্থ।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনেতিহাস তাঁহার ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের অন্তরালে কতকটা আচ্ছন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বৃন্দাবন দাস তাঁহার মনের মাধুরী দিয়া গৌরাঙ্গদেবকে নবকলেবর দান করিয়াছেন। তাহা হইলেও প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা শক্ত নয়। এজন্য অবশ্য কতকটা অনুমানের সাহায্য লইতে হইবে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ঐশ্বরিক বিভূতি-বিস্তারকে প্রকৃত জীবনচরিত হইতে বাদ দিয়া থাকেন। তবে গৌরাঙ্গদেব যে নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রচার করিতেন, মাঝে মাঝে 'আমি সেই' 'আমি সেই' বলিয়া হুঙ্কার করিতেন, তাহাকে অনৈতিহাসিক বলিবার কারণ নাই। ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় ভক্ত ভগবানের সঙ্গে একাত্মকতা অনুভব করেন। তখন তাঁহার দ্বৈতভাব থাকে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ভাবাবেশ না

থাকিতে পারে। মহাভাবে আবিষ্ট অবস্থায় এই একাত্মতা যে অনুভূত হয়, ভারতের সাধুসন্ত-সাধক-ভক্তদের জীবনেতিহাসে তাহা বার বার স্বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।"

জ্ঞানমার্গের মহাসাধকদের সঙ্গেও এ বিষয়ে প্রভেদ নাই। পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে পৃথক নয়, মায়াবরণের জন্যই যে পৃথগ্-ভাব জন্মে, তাহা শুধু দর্শনতত্ত্বের কথা নয়, ভারতীয় যোগীরা এই অভেদভাব জীবনেও উপলব্ধি করিতেন। 'আমি সেই' আর 'সোঽহম্' একই কথা।

ঐশ্বর্য-প্রকাশের কথা যদি বাদই দেওয়া যায়, গৌরাঙ্গদেবের নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রচার এবং তাঁহার অলৌকিক প্রেমাবেশই তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে ভক্তগণের দৃঢ় ধারণা জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট। বিশেষতঃ যাঁহারা মানুষের মধ্যেই ভগবানকে সন্ধান করেন এবং প্রত্যাশা করেন,—মানুষরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারা যদি গৌরাঙ্গের মধ্যে ভগবানকে না পান, তবে আর কোথায় পাইবেন?

গৌরাঙ্গদেবের জীবনে প্রেমোন্মাদের উন্মেষ ব্যক্তিগতভাবে কতকটা আকস্মিক হইতে পারে, জাতিগতভাবে আকস্মিক নয়। মাধবেন্দ্রপুরী (কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁহাকে বলিয়াছেন 'প্রেমধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর' বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'), ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত প্রভু, যবন হরিদাস ইত্যাদি প্রেমধর্ম্ম-প্রচারকদের আগেই আবির্ভাব হইয়াছিল—ইঁহারা প্রেমধর্ম্মের চরম উর্জ্জিত রূপের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। ইঁহারা হয়ত সেই পরমোর্জ্জিত রূপ একজন সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণেরও একটা যুক্তি দেখাইয়াছেন, কেন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসী না হইয়া অর্থাৎ জনারণ্যের

তপস্বী হইলেন, তাহাও বলিয়াছেন। এ সমস্তের মধ্যে অনৈতিহাসিক কিছু নাই।

চৈতন্যভাগবতে সেকালের বাঙ্গালা দেশের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। তখন সুলতান হোসেন শাহের আমল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন বাঙ্গলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ চলিতেছে। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন:—"মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।" ছত্রভোগের রামচন্দ্র খানও মহাপ্রভুকে বলিলেন:—"এখন দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের জন্য পথ বড় বিপৎসঙ্কুল। আপনাকে অতি সাবধানে ঘুরপথে যাইতে হইবে।" "রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।"

তখন দুই রাজ্যের সীমান্তে অরাজকতা চলিতেছে, পথে দস্যু-ভয় বাড়িয়া গিয়াছে—জলপথও নিরাপদ নয়। শ্রীচৈতন্যের নৌকার মাঝিরা বলিতেছে: "নৌকায় উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিবেন না—জলদস্যুরা টের পাইবে, ধন-প্রাণ সব যাইবে।"

শ্রীচৈতন্য নৌকাযোগে গঙ্গা হইতে উড়িষ্যাসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার নদীগুলি সেকালে খালের দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

এদিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বিজয়ানগরে অভিযান করিয়াছেন। উড়িষ্যা ও দক্ষিণাপথের সীমান্তেও যুদ্ধের আবেষ্টনী। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে এই সবের উল্লেখমাত্র আছে। যুদ্ধের বা বিপ্লবের কোন নিদর্শন বা চিহ্ন গ্রন্থের কোথাও নাই।

এদিকে 'রমাদৃষ্টিপাতে' হুসেন শাহের সময় বাঙ্গলার লোক সুখেই আছে। এক স্থানে কবি বলিয়াছেন:

"যে হুসেন শাহ সারা উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এঁকে দেখে না মানয়ে অন্ধ॥"

হুসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার দেবমূর্ত্তিও ভাঙ্গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলিতে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন হুসেন শাহ সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে হুকুম জারি করিয়াছিলেন—কেহ যেন এই তরুণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্মপ্রচারের বাধা না দেয়। তাহা সত্ত্বেও প্রেমধর্ম্মপ্রচার সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ছিল বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসের উপর অমানুষিক অত্যাচারটা যদি মুসলমান দরবেশের বৈষ্ণব ধর্ম্ম-গ্রহণের অপরাধের জন্যই ধরা যায়, নবদ্বীপের কাজী ও গদাধরের গ্রামের (এড়িয়াদহের) কাজীর কীর্ত্তনবিদ্বেষ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, অনেক সময় স্থানীয় সরকারী কর্ত্তারা সুলতানের ফতোয়া মানিয়া চলিত না। যবনাধিকৃত বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর হিন্দুরাজ্যে গমনের ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু-চরিত্রের একটা দিকের আভাস পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গদেব যখন কাজীর আদেশ অমান্য করিয়া নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন, তখন—

"সকল পাষণ্ডী মেলি গণে মনে মনে।
গোসাঞি করেন কাজী আসে এই স্থানে॥
কোথা যায় রঙ্গঢঙ্গ কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় কলাপোতা ঘট আম্রশাখ॥"

যাবনিক সংসর্গে এ যুগে যেমন অনেক বিদ্বান ব্যক্তি অনাচারী হইয়া উঠিয়াছে, সে যুগেও পণ্ডিত লোকেরাও অনেক সময় আচারভ্রষ্ট হইত। *রূপসনাতনের ম্লেচ্ছভাবের কথা চৈতন্যভাগবতে নাই বটে, তবে*

জগাই-মাধাইয়ের কথা আছে। ইহাদের প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন ঃ—

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাকা-চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥"

বৃন্দাবনদাস ব্রাহ্মণসন্তানের চুরি, ডাকাতি, পরদার-হরণ ও মদ্যপানের কথা অন্যত্রও বলিয়াছেন। ভবানী, চণ্ডী, মনসা, বাশুলী ইত্যাদি দেবী-পূজাউপলক্ষে মদ্যপানের কথা তো আছেই—নবদ্বীপেই শুঁড়ির দোকানের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। একজন গৃহস্থ শ্রীচৈতন্যের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছে—তাহার পুত্রের যেন সুমতি হয়, সে যেন জুয়াখেলার নেশা ছাড়ে।

নবদ্বীপ তখন বাংলার প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। কেবল গঙ্গাবাসের জন্য নয়, পঠন এবং পাঠনের জন্যও দূর চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ইত্যাদি স্থান হইতেও ছাত্র ও অধ্যাপকেরা আসিয়া নবদ্বীপে বসবাস করিতেন। এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলা যায়।

'একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।' সহস্র কথা অবশ্য বহু অর্থে প্রযুক্ত। একালের মত সেকালে শিক্ষাদানের জন্য বড় বড় ইমারতের কথা উঠিত না। যাহার চণ্ডীমণ্ডপ বৃহৎ, তাহার চণ্ডীমণ্ডপেই বিদ্যালয় (বিদ্যার সমাজ) বসিত।

"বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে যার ঘরে। চতুর্দ্দিকে বিস্তর পঢ়ুয়া তাঁর ঘরে॥
গোষ্ঠী করি তাহাই পঢ়ান দ্বিজরাজ। সেই স্থানে চৈতন্যের বিদ্যারসমাজ॥"

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে গোষ্ঠী বলা হইত। অনেক সময় গঙ্গার ধারেও 'বিদ্যার সমাজ' বসিত। ছাত্রগণ একালের ছাত্রদের তুলনায় খুব যে শান্তশিষ্ট ছিল, তাহা মনে হয় না। ছাত্রেরা "অন্যোন্য কলহ করেন অনুক্ষণ।" আপন আপন গুরুর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লইয়া তাহারা বীররসেরও অনুশীলন করিত। সেকালেও একালের মত

পাণ্ডিত্য বা বিস্তাবত্তার উপর আর্থিক উন্নতি, নির্ভর করিত না। জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীকে বলিতেছেন :

"সাক্ষাতেই এই কেন দেখ না আমাত।
পড়িয়াও মোর ঘরে কেন নাহি ভাত॥
ভালো মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥

একালের অধিকাংশ লোক যেমন মনে করে, ভগবানের নাম করিবে, নিঃশব্দে নিভৃতে কর, দল বাঁধিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামগান করিবার, উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার, কাঁদিয়া গড়াগড়ি 'দিবার কি প্রয়োজন ?—সেকালেও নবদ্বীপের লোকেরা তাহাই মনে করিত।

"কেহ বোলে 'ওগুলোর হইল কি বাই।'
কেহ বোলে 'রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥"
মনে মনে ডাকিয়ে কি পুণ্য নাহি হয়।
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়॥"

একালের কবি রবীন্দ্রনাথও তাহাই মনে করেন—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে।
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীতগানে॥
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞান-হারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ। (নৈবেদ্য)

লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ পাঁচ হরিতকী দিয়া নমোনমঃ করিয়া সারা হইয়াছিল—তখন শ্রীচৈতন্যেরও সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। দিগ্‌বিজয়িপরাভবের পর নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গেলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহে খুব ঘটা

হইয়াছিল। সেকালের বিবাহে কিরূপ ঘটাসমারোহ হইত, তাহা ইহা হইতে জানা যায়।

বিবাহসভার একটা বর্ণনা পাওয়া যায়—উঠানে বা কোন খোলা জায়গায় চাঁদোয়া খাটানো হইত। এই মণ্ডপের চারিপাশে কলাগাছ পোতা হইত। প্রত্যেক কলাগাছে পতাকা উড়িত। প্রত্যেক কলাগাছের মূলে আম্র-শাখায় মণ্ডিত পূর্ণঘট, ধান্যপাত্র ও দধিভাণ্ড রাখা হইত। মণ্ডপ-চত্বরটিতে চিত্র-বিচিত্র করিয়া আলিপনা আঁকা হইত। নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হইত এবং প্রত্যেকের সম্মুখে রাখা হইত বাটাভরা পানস্থপারি। ইহাতেই অতিথিরা পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। নারীগণ আঁচল ভরিয়া খই, কলা, বাতাসা পাইতেন, আর পাইতেন, তৈল, সিন্দূর, শাঁখা ও তাম্বূল। বিবাহ-রাত্রিতে আহারাদির ব্যবস্থা হইত না। বিবাহ-যাত্রায় বরের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড, বাজিকর, সঙ, নর্ত্তক ও গায়কগণ মিছিল করিয়া যাইত। বিবাহের বেদাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচার ছিল বর্ত্তমান সময়ের মতই। বস্ত্র ও তৈজসপত্রে বেশি ব্যয় করা হইত না। বর যৌতুক পাইতেন "দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা আর দাসদাসী।"

সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বেশি তৈজসপত্র ব্যবহার করিত না। কলার পাতা, পদ্মপাতা কিংবা কলার খোলায় আহার করিত, নৈবেদ্য সাজাইত, মাল্যচন্দনাদি নিবেদন করিত। কাকে পিতলের একটি ছোট বাটি লইয়া গেলেও গৃহিণী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গোপিকানৃত্য-বর্ণনা হইতে সেকালের নৃত্যাভিনয়ের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যের অসামান্য প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া এই সময়ের অনেক তথাকথিত ধর্ম্মাচার্য্য লোকবরণীয় হইবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া অথবা

সন্ন্যাসের ভান করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং নিজেদের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

"রঘুনাথ করি আপনারে কেহো বোলে।"

"রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে,
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলয়ে গোপাল।"

অদ্বৈতের তিন পুত্র তাহাদের পিতাকেই ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই অপরাধে অদ্বৈত তাহাদের ত্যাগ করেন।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও একটা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। সার্ব্বভৌম সেকালের সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন:

"প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কারপাশে। দম্ভ করি মহাজ্ঞানী কয় আপনা সে॥
শিখাসূত্র ঘুচাইয়া সভে এই লাভ। নমস্কার করে আসি মহামহীভাগ॥
জীবের স্বভাবধর্ম্ম ঈশ্বরভজন। তাহা ছাড়ি আপনায় বোলে নারায়ণ॥"

তারপর কাব্য হিসাবে চৈতন্যভাগবতের কথা। কাব্য হিসাবে ইহা মঙ্গলকাব্যের গোষ্ঠীতে পড়ে। চৈতন্যমঙ্গল নাম সেজন্য অসার্থক নয়। দেবদেবীর স্থলে তাঁহাদের অবতারদের মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। নমস্ক্রিয়া, মঙ্গলাচরণ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপসংহার মঙ্গলকাব্যের অনুসরণেই রচিত। লীলা-বিলাসের খুঁটিনাটি বর্ণনা, তালিকা দেওয়ার পদ্ধতি, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলিকে সরস করিয়া প্রকাশ ইত্যাদি কাব্যেরই অঙ্গ, জীবনচরিতের অঙ্গ নয়। গ্রন্থে যে সকল রঙ্গকলহ আছে, কপট কোপ ও মান-অভিমানের পালা আছে, ক্রীড়া-কৌতুকের কথা আছে, রূপবর্ণনা আছে, সে সমস্ত কাব্যালঙ্কার মাত্র। কাব্যসৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলে কল্পিত দৃশ্য ও ঘটনার সমাবেশ আছে—কোন কোন স্থলে খুব বেশি রঙ

চড়ানো অথবা রঙের উপর রসান দেওয়া হইয়াছে। স্তব, স্তুতি, বাদানুবাদ ও রসালাপগুলি সবই কবিকল্পনার সৃষ্টি ; বলা বাহুল্য, কবির জন্য পূর্ব্ব হইতে কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বাস্তব চিত্রগুলিকে রসালো করিয়া অতিরঞ্জনে কবি-কৃতিত্ব যথেষ্টই আছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু—কবি কাব্যে সেকালের অনুগঙ্গ প্রদেশের সামাজিক পরিবেষ্টনীটী চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। নিত্যানন্দপ্রসঙ্গে কবি-কল্পনার লীলা সবচেয়ে বেশি। কবি নিজের অফুরন্ত ভক্তি-ভাণ্ডারের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়া স্বকীয় ইষ্টদেবের লোকাতীত মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন।

তত্ত্বের দিক হইতে ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। চিরন্তন ভক্তি-তত্ত্বই ইহাতে ব্যাখ্যাত এবং শ্রীধর, শুক্লাম্বর, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ইত্যাদি ভক্তগণের জীবনে উদাহৃত হইয়াছে।

"জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এসকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিব ধন জন রূপ বেশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥"

শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি যাহার, সেই বন্দনীয়—সে যবন হইতে পারে, অস্পৃশ্য হইতে পারে, মূর্খ বা অতি দরিদ্র হইতে পারে, আবার ভোগী, বিলাসী সংসারীও হইতে পারে, যোগী সন্ন্যাসীও হইতে পারে।

"মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥"

কলিযুগে অন্য যজ্ঞ নাই—হরি-সঙ্কীর্তনই মহাযজ্ঞ। ভক্তিসাধনার পথে হরি-সঙ্কীর্তনই একমাত্র অনুষ্ঠেয়।

"কলি যুগে সর্বধর্ম হরিসংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥
কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্বে পার করে ॥"

এই সঙ্কীর্তন-ধর্মই জাতি কুল-বিদ্যা-বয়োলিঙ্গের সর্বব্যবধান দূর করিয়াছে। এই ধর্মাচরণে আপামরসাধারণ সকলেই যোগ দিতে পারে—কোন বাধা নাই।

চৈতন্যভাগবতের মতে অনাসক্তভাবে সংসারধর্ম প্রতিপালন করিলে কৃষ্ণ-ভক্তের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বজগৎ লীলাময়ের লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব লীলাকেলি, নৃত্যগীত, ক্রীড়াকৌতুক লীলাময়ের উপাসনার অঙ্গ—যদি সে সবের মূলে থাকে কৃষ্ণ-ভক্তি। সংসারধর্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া সংসারকে পরমার্থ মনে করিলে মানব-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সংসারটাকেও খেলাই মনে করিতে হইবে। রাখাল যেমন গোঠে গিয়া খেলা করে—তাহার গোরু-চরানোটাও একটা খেলা—তেমনি মনে করিতে হইবে সংসারটাকে। বালকের মত সরল, স্বচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক, নির্মল, অক্রূর ও উদাসীন মনই ভক্তিসাধনার অনুকূল। স্বভাবতই বালমনোভাবের সঙ্গে বালচাপল্য, বালসুলভ ক্রীড়ারঙ্গ, অকপট সখ্যভাব, অহৈতুকী প্রীতি, রস-কলহ, আত্মবিস্মৃতি ইত্যাদি ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলে নিত্যানন্দ বলিয়াছেনঃ—

"তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।"

চৈতন্য ভাগবতের ভক্তিসাধক মহাপুরুষগণ নিজেদের ইষ্টগোষ্ঠীতে সরলস্বভাব বালকদের মত আচরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সখ্যভাবের মধ্যে দাস্যভাব, তাঁহাদের রাখালিয়া ভাবের মধ্যে দাসভাব নিগূহিত হইয়া থাকিত। তাঁহাদের রাখালী কাণ্ড দেখিয়া হিসেবী লোকেরা তাঁহাদের নিন্দা করিত, উপদ্রব মনে করিত এবং পাগলামিও মনে করিত। তাহা ছাড়া, ঐভাবে ধর্মাচরণ দেশে সম্পূর্ণ নূতন, আগে তাহারা কখনও দেখে নাই। বয়ঃপ্রবীণ বহুশাস্ত্রজ্ঞ সংসারী লোকেরা গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া নাচিবে, গাহিবে, চীৎকার করিবে, বালকের মত স্থলে-জলে খেলা করিবে, লাফালাফি করিবে, সাঁতরাইবে, মাতামাতি করিবে—ইহা দেখিলে গতানুগতিক সাধারণ লোকদের অস্বাভাবিক মনে হইবে—তাহাতে বৈচিত্র্য কি ?

কিন্তু এইখানেই চৈতন্যভাগবতের প্রচারিত বৈষ্ণব-সাধনার অভিনবত্ব। ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে চাই বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য আত্মবিস্মৃতি। এ সমস্তই আত্মবিস্মৃতির অভিব্যক্তি। মুক্তির পথে আগাইতে হইলে আগে চাই দেশ-কাল-বয়োলিঙ্গ ও সমাজ-সংসারের সর্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি। এইগুলি সংস্কার-মুক্তিরও সাধনাঙ্গ।

অবৈষ্ণবদের চোখে চৈতন্যভাগবত কাব্য মাত্র—ভক্ত-বৈষ্ণবদের কাছে ইহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে ধর্মোপদেশ আছে বলিয়া নয়, ধর্মোপদেশ তাঁহারা গীতা-ভাগবতেই পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। তাঁহার নর-লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতের মতই ইহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাংলার লোক-শিক্ষার জন্য যে তিনখানি মহাগ্রন্থ রচিত ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চৈতন্য ভাগবত অন্যতম।

গৌরনাগর

ভাগবতের মতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা সম্পাদিত, অবশিষ্ট সমস্ত লীলা মথুরা-কুরুক্ষেত্র-দ্বারাবতীতে। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকেই নিত্যলীলা বলিয়া গণ্য করেন এবং তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া 'পাদমেকম্' কোথাও যান নাই এইরূপই মনে করেন। শ্রীরূপের প্রতি শ্রীচৈতন্য—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে।

মধুর ভাবের উপাসক বৈষ্ণবগণ দ্বিভুজ মুরলীধরের কৈশোরলীলাকেই নিত্যলীলা মনে করেন—তাঁহাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ চিরকিশোর—চিরনাগর।

গৌড়ের একশ্রেণীর ভক্তেরা ঠিক এই মতের অনুসরণে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নদীয়ানাগররূপকেই নিত্যলীলার প্রতীক-স্বরূপ মনে করেন এবং ঐরূপেরই তাঁহারা উপাসক। সুরধুনীতীরবর্ত্তী নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, দরিদ্র শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তনে নর্ত্তনরত কাঙালের ঠাকুর—শ্রীধর-শুক্লাম্বরের প্রাণের গৌর; আর মহাসমুদ্রতীরবর্ত্তী নীলাচলের গৌরাঙ্গ রাজরাজন্য, রাজামাত্য, ভূ-স্বামী ও বহু বহু জ্ঞান-যোগী ও মহাসন্ন্যাসিগণের পরিবেষিত বিরাটমন্দিরে ভাবমগ্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহাদের মতে তাঁহার সন্ন্যাসই মাথুর। গৌর-দেহে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিনবরূপ প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্‌ভাবে উপাসনার আর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপেরই উপাসক।

অবাঙ্গালীদের মধ্যে প্রবোধানন্দ ঐ রূপের ধ্যানমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

কোঽয়ং পট্টধটী-বিরাজিত-কটীদেশঃ করে কঙ্কণম্
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
উর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্ল মল্লীস্রজা
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

কটিতটে ধৃত পট্টবসন করে কঙ্কণ বক্ষে হার,
মল্লিকাদামে উঁচু ক'রে বাঁধা শিরের উপরে চিকুরভার।
কাঁনে কুণ্ডল চরণে নূপুর শ্রীগৌরহরি নাগরবর,
করিছেন ক্রীড়া নিজনামগুণ-কীর্ত্তন করি নৃত্যপর।

চরিতকারগণ নদীয়া লীলায় গৌরাঙ্গের ঠিক এই মূর্ত্তির কথা বলেন নাই। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরহরির নাগরীনৃত্যের কথা আছে—কিন্তু নাগর-নৃত্যের কথা নাই, বরং নীলাচল হইতে প্রত্যাগত নিত্যানন্দপ্রভুর নাগরমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। ভক্তগণের মানসনেত্রে প্রতিভাসিত এই মূর্ত্তি তাঁহাদের 'আপন মনের মাধুরী দিয়া গড়া।'

শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপে উপাসনাই গৌরপারম্যবাদ। এই গৌর পারম্যবাদের অনুবর্ত্তী পদকর্ত্তারা গৌরনাগরের ঐ রূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের পদাবলীতে।

গৌড়ে এই নাগরবাদের প্রবর্ত্তক মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ সেন ও নরহরি সরকার ঠাকুর। বঙ্গদেশে গৌরপারম্যবাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই রস-বাদে জগতের অন্যান্য ধর্ম্মগুরুদের ন্যায় গৌরাঙ্গ উপায় মাত্র নহেন, শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণই উপেয়।

নরহরি-প্রমুখ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের পরিবর্ত্তে মন্দিরে মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের নাগর মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রবোধানন্দের

কল্পিত ধ্যানমূর্ত্তিই তাহাতে রূপলাভ করে নাই বটে, তবে কীর্ত্তনরত নাগরমূর্ত্তিই রূপলাভ করিয়াছে। ক্রমে গৌরমূর্ত্তির সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, কোথাও কোথাও তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দ-গদাধরের মূর্ত্তিও স্থান পাইয়া উপাসিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন,—নরহরি সরকার ঠাকুরই প্রথমে গৌর-নাগরের মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন করেন, তিনি নিজগৃহে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাটোয়ার গদাধর দাসের পাটের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাও তাঁহার প্রেরণাতেই হয়।

মুরারিগুপ্ত বলেন—শ্রীচৈতন্যের আদেশে বিষ্ণুপ্রিয়াই প্রথম তাঁহার মূর্ত্তি স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে গৌরাঙ্গ চির-তরুণ নদীয়া-নাগর। কাজেই তাঁহার গৃহে ঐ মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা হয়। গৌরপারম্যবাদের সাধকরা বিষ্ণুপ্রিয়ারই অনুবর্ত্তী। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই ভক্তেরা বিশেষ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে ভগ্নহৃদয় পরিকরগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে চাহিয়াই সান্ত্বনা লাভ করিতেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরের কথা স্মরণ এবং শ্রীগৌরের অনুকল্পস্বরূপ তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন।

গৌরপারম্যবাদের ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের বদলে শিষ্যদের গৌরমন্ত্রের দীক্ষাও দিতেন। গৌরাঙ্গদেব যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সে বিষয়ে গৌড়ের বিবিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ নাই। এই শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নহেন—ইনি ব্রজের দ্বিভুজ মুরলীধর।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বরূপ সম্বন্ধে পরিকল্পনার ঈষৎ তারতম্য আছে। কমলা-কর-পরিবেষিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু, যিনি একদা বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন, তিনি জীব উদ্ধারের জন্য গৌরচন্দ্ররূপে বৈকুণ্ঠ হইতে অথবা ক্ষীরোদ সাগর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—বৃন্দাবন-

দাস ইত্যাদি ভক্তেরা এই কথাই বলিয়াছেন। নরহরিদাস ইত্যাদি ভক্তেরা বলিয়াছেন—বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্যলীলা চলিতেছে—এই বৃন্দাবন কোন স্থানকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। সেই নিত্য বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে ব্রজনাগরই অবতীর্ণ। বৈষ্ণবদাসের কথায়—উদ্দেশ্য—"বাহিরে জীবউদ্ধারণ অন্তরে রসআস্বাদন

ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।" তাই নরহরি বলিয়াছেন—

"ব্রজভূম করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ এতেক তোমার চতুরাল।"

গোবিন্দদাসিয়া বলিয়াছেন—কলিকবলিত কলুষজড়িত হেরিয়া জীবের দুখ। করলি উদয় হইয়া সদয় ছাড়িয়া গোকুল-সুখ (গোলোকসুখ নয়)।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল গোপীগণের সঙ্গে প্রেমলীলা করিতেছেন—নবদ্বীপেও সেইলীলাই করিবার কথা, কেবল মুরলীধ্বনির বদলে সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ এবং ব্রজগোপীদের বদলে আসিয়াছে গোপীভাবে আবিষ্ট ভক্তগণ। ব্রজে মুরলীনাদে যে আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে নবদ্বীপে-সংকীর্ত্তনেও সেই আহ্বান—"প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইবার জন্য সব গৃহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া আইস।"

বৃন্দাবনে তিনি ব্রজনাগর,—নবদ্বীপে তিনি নদীয়ানাগর ছাড়া আর কি হইবেন? শ্রীকৃষ্ণও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই—মথুরাযাত্রাই তাঁহার লীলারঙ্গভূমি হইতে সন্ন্যাস। ভক্তগণ এই 'সন্ন্যাসযাত্রায়' শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করেন নাই—বৃন্দাবনই তাঁহাদের কাছে নিত্যধাম হইয়া থাকিল। গৌরনাগরবাদী ভক্তদেরও নদীয়া-লীলাই নিত্যলীলা হইয়া থাকিল।—আর গৌরাঙ্গদেব চিরনাগর হইয়াই থাকিলেন।

গৌরপারম্যবাদের ভক্তকবিদের উপজীব্য হইল গৌরাঙ্গের নাগর-লীলা। এই লীলা অবলম্বনে চারিশ্রেণীর পদ রচিত হইয়াছে। প্রথমশ্রেণীর পদে গৌরাঙ্গের নাগররূপবর্ণনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে গৌরাঙ্গের রূপ

ও লীলাবিলাসের দুর্নিবার আকর্ষণ, ও গৌরাঙ্গপ্রেমের মাধুর্য্যসম্ভোগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর পদে নাগরগৌরাঙ্গের রাধাবিরহে বিহ্বলতা প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থশ্রেণীর পদে মাথুর পদের অনুসরণে গৌরাঙ্গের নাগরবেশ পরিহার করিয়া দণ্ডিবেশধারণে আক্ষেপই উপজীব্য হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের দিনে গৌরাঙ্গ যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার আসল নাগররূপ। কবিরা তাহার উপর রসান দিয়া তাঁহার নদীয়া-নাগররূপ কল্পনা করিয়াছেন। লোচনদাস এই রূপবর্ণনার প্রধান কবি। তাঁহার—

'অমৃত মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।'

—ইত্যাদি পদ বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত। লোচনদাস শ্রীচৈতন্যকে দেখেন নাই, তিনি নিরঙ্কুশ ভাবে তাঁহার ভাববিগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিখিলের সমস্ত লাবণ্যকে একত্রে পুঞ্জীভূত রূপে দেখিয়াছেন তাঁহার গৌরনাগররূপে,—শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—কুলের কামিনীরা দুই হাতকে পাথায় পরিণত করিতে চায়। "পুরুষ প্রকৃতিভাবে কাঁদিয়া আকুল গো নারী বা কেমনে প্রাণ রাখে ?"

লোচন দাস নাগররূপের একটা সাজসজ্জার কল্পনাও করিয়াছেন—রাঙাপাড় দেওয়া ধবলপাটের জোড় গৌরাঙ্গের পরণে। পায়ের উপর তাহার কোঁচা দুলিতেছে। পায়ে বাঁকমল ও সোনার নূপুরে মধুর মধুর ধ্বনি উঠিতেছে—পিছুদিকে দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তাহাতে চাঁপাফুল দোলানো। সম্মুখের চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, তাহাতে কুন্দ মালতীর বনমালা জড়ানো। সর্ব্বাঙ্গে চন্দনবিলেপ, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। এইরূপে—

'নদীয়ানাগর রসের সাগর আনন্দ সমুদ্রে ভাসে।'

গোবিন্দদাসও একজন রূপের কবি। গোবিন্দদাসের একটি পদ—

সরুয়া কাঁকালি ভাঙিয়া পড়ে। তাহে তনুসুখ বসন পরে।
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে। যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে ॥

এই সঙ্গে আছে—চাঁচরকেশের লোটন, রঙ্গিনী ভুরুর ফাঁদ। বিলোল মুচকি হাসি ইত্যাদি। আর একটি পদে আছে—

কত—কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাসবসন পরশ পাবার তরে।

আর একটি পদে—

পরিয়া পাটের জোড় বাঁধিয়া চিকুর ওর তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন দেখি জিউ করিল নিছনি ॥
মৃগমদচন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম মাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক অন্যের কাজ মদন মুগুধ ভেল রহল যুবতীকুলে খোঁটা ॥

আর একটি পদে—

খগপতি জিনি নাসা অমিয় মধুর ভাষা তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণনয়নবাণ ভুরুধনু সন্ধান কটাক্ষ হানয়ে নারী মনে ॥
আজানুলম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরম্ভা জিতি উরু চরণে নূপুর বঙ্ক বাজে ॥

গোবিন্দদাসের এইসকল পদের তুলনায় তাঁহার রচিত গৌরাঙ্গের প্রেমাবিষ্ট রূপের বর্ণনাগুলিই অবশ্য চমৎকার।

বাসুঘোষ চিত্রিত নাগর বেশ—

দেখ দেখ গোরা নটরায়।
বদন শারদশশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি কুলবতী হেরি মুরছায়।
চাঁচর চিকুর মাথে চম্পক কলিকা তাতে যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতিপদ্মযুগ মূলে কনককুণ্ডল দুলে পক্ক বিম্ব জিনিয়া অধর।

কম্বুকণ্ঠে মৃদুবাণী সুধার তরঙ্গখানি হরিরসে জগৎ ডুবায়।
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ সুবলনি অঙ্গদ বলয়া শোভে তায়।
বক্ষ হেমধরাধর নাভিপদ্ম সরোবর মধ্য হেরি কেশরী পলায়।
অরুণবসন সাজে চরণে নূপুর বাজে বাসুঘোষ গোরাগুণ গায়।

রাধাবল্লভ দাসের ধামালী পদ্যের একটি অংশ—

রঙ্গিন পাটের জোড় দুদিকে সোনার নূপুর পায়।
ঝুনুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে ঠার ঠমকে চায়।।
মাল্‌তীফুলে ভ্রমর দুলে নও লোটনেব দামে।
কুল্‌কামিনীর কুল মজিল গীমদোলনির ঠামে।

যদুর পদে—অরুণ পাটের বসন ছলে। তরুণী-হৃদয় রাগ উছলে।
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু। ছটায় বিজুরী ঝলকে জনু॥
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গে। তনুতে তনুতে তরঙ্গ রঙ্গে॥
কেশর কুসুম সুষম দাম। যদু কহে সব ভাঙ্গিল মান॥

রায়শেখরের পদে—

নির্ম্মল কাঞ্চন জিতল বরণ বসন ভূষণ শোভা।
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন মদনমোহন প্রভা॥
উর পরিসার নানা মণিহার মকরকুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি হানয়ে মরম বাণে।
বিনোদ বন্ধন দুলিছে লোটন যূথীমালতীতে বেড়া।
নদীয়া-নগরে নাগরীগণের ধৈরজ ধরম ছাড়া।।

অন্যত্র—অনুপ্রাসের ছটায় পদের শ্রী যেমন উর্জ্জিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গের রূপও তেমনি উর্জ্জস্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মদির মাধুরী মধুর মূরতি মৃদুল মোহন ছাঁদ।
মৌলি মালতী-মালে মধুকর মোহিত মনমথ ফাঁদ॥

গৌর সুন্দর সুঘড় শেখর শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সাজক সুজন ভাবক সতত সুখময় ভাষ॥
চীন চাঁচর চিকুর চুম্বিত চারু চন্দ্রিক মাল।
চকিতে চাহিতে চপলা চমকিত চিত চোরল ভাল॥
গান গুর্জ্জরী গৌরী গান্ধার গমক গরজন তায়।
গমন গজপতি গরবগঞ্জিত গাওয়ে শেখর রায়।

বলরাম দাসের পদও রায় শেখরের মত—

কুসুমে খচিত রতনে রচিত চিকন চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ।
ললাট ফলক পটির তিলক কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড মণ্ডল রাজে।
ও রূপ হেরিয়া সতী কুলবতী ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম মাথাতে পড়িল বাজ।

ঘনশ্যামের সাতমাত্রার পদে—

চারুশ্রুতি অবতংস সুন্দর গণ্ড মণ্ডল শোহয়ে।
নাসাশুকবরচঞ্চু জিত সতী যুবতিজন মন মোহয়ে।
জানুলম্বিত ললিত ভুজযুগ গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন কণ্ঠে মালতী মাল রে।
মদনমদ দলি কদলি উরু গুরু পর্ব্ব অতি অনুপাম রে
চরণতল থল কমল নখমণি নিছনি দাস ঘনশ্যাম রে॥

নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদে—

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ। অখিলজনার মন ধরিবার ফাঁদ॥
নয়নযুগল অনুরাগের আলয়। চাহনিতে ভুবন পরাণ হরি লয়॥
কামের ধনুক মদ ভাঙ্গিবার তরে। কেবা গড়াইল ভুরু কত রঙ্গভরে॥

চাঁচর কেশের ঝুঁটী চমকিয়া বাঁকে। মালতীবলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে
কে ধরে ধৈরজ হেরি সুচারু কপাল। চন্দনের বিন্দু ইন্দু গরবের কাল॥
ভুবনবিজয়ী মালা দোলায় হিয়ায়। বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায়॥
কহে নরহরি কি না জানে রঙ্গ তার। গোকুলনাগর ওযে রসের পাথার॥

যে পদ বা পদাংশগুলি উৎকলন করিলাম, সেগুলির অধিকাংশের বাক্যবিন্যাসের পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, ছন্দোহিন্দোল ও আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব গৌরাঙ্গের নাগর রূপসজ্জার সহিত কিরূপ সুসমঞ্জস তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই যে অবাস্তব ভাববিগ্রহ ইহা কবিগণের গভীর প্রেমানন্দের সৃষ্টি—ইহাকে নাগরীভাবের সাধনার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। আকর্ষণের দুর্নিবারতা-সৃষ্টির জন্যই এই রূপকল্পনা। প্রেমদাস, বৃন্দাবনদাস ইত্যাদি কবিরা নাগরী ভাবের সাধক ছিলেন না—তাঁহারাও রূপের অসামান্যতার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের অবতার—তাঁহার রূপের অসামান্যতা তাঁহার ভগবত্তার একটা লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইয়াছে। আর যাঁহারা রাধিকার ভাবকান্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন মনে করেন—তাঁহারা যে রূপের বন্যার মধ্যে কূল পাইবেন না সে বিষয়ে সন্দেহ কি? নাগরীভাবের সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা বালক গৌরাঙ্গ, অধ্যাপক গৌরাঙ্গ বা সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের রূপে রস পাইবেন কেন? তাঁহার করুণায় বিগলিত রূপ, পতিতপাবন রূপ, কীর্ত্তনে নর্ত্তনরত রূপ, রাধাবিরহে অপ্রকৃতিস্থ রূপের সহিত ঐরূপের অসামঞ্জস্য নাই, মুণ্ডিতমস্তক দণ্ডধারী রূপের সঙ্গেই সামঞ্জস্য হয় না। গৌরনাগরবাদের সঙ্গে কেবলমাত্র মধুররসের সম্বন্ধ। কাজেই ইহাতে গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গের মধুর সম্বন্ধটা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। গদাধর শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত।

"গৌরগদাধরলীলা আদ্রব করয়ে শিলা।"

যদুনাথের পদে এই রসলীলার একটি চিত্র এই—

গৌর-গদাধর দুহুঁতনু সুন্দর অপরূপ প্রেম বিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে পরশে যব বিলসয়ে অমিয়া বরিখে অনিবার॥
দেখ দেখ অনুপম দুহুঁজন লেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চতুরালি মজিয়া পাওব সেহ।
করে করে নয়নে যোই মাধুরী সো অব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত অখিল ভুবনে অনুপাম॥
অমিঞা পুতলি কিয়ে রসময় মুরতি কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন তনুমন ভুলাওল যদু কিয়ে পাওব পার।

নবদ্বীপের অধিকাংশ ভক্ত সখ্য কিংবা দাস্যরসে বিভাবিত। তাঁহাদের চোখে গৌরাঙ্গের নাগরালি ভাব অনেকটা ঐশ্বর্য্যভাবে অথবা রাখালিয়া ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। কোন কোন কবির চোখে—শ্রীগৌর কোন বিশিষ্ট-ভাবে নয়, সাধারণ ভক্তের ভাবেই প্রেমাস্পদ। যেমন নয়নানন্দের পদে—

গোরা মোর গুণের সাগর। প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী। হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥
গোরা মোর হিমাদ্রিশিখর। তাহা হইতে প্রেমগঙ্গা বহে নিরন্তর॥
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু। যাঁর পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু॥
গোরা মোর নবজলধর। বরষি শীতল যাহে করে নারীনর॥
গোরা মোর আনন্দের খনি। নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥

নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসু ঘোষ, লোচনদাস ইত্যাদি ভক্তেরা সখী বা মঞ্জরীভাবে মধুর রসের সাধনা করিতেন। তাঁহাদের চোখে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের চির কিশোরের মত চির নাগর। তাঁহারা যে ভাব পোষণ করিতেন—তাহাই তাঁহারা ব্রজগোপীগণের অনুসরণে নদীয়া-

নাগরীদের মনোভাবে আরোপ করিয়াছেন। ভাগবত প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণকে ইহারা গৌরাঙ্গের রূপের আকর্ষণের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সকল কল্পিতা নাগরীরা রূপের আকর্ষণে প্রেমাবিষ্টা হইয়া কুলশীল সংসারের কথা—এমন কি সতীধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে কবি নিজেই বিরাজ করিতেছেন। এই পদ্ধতিতে সাধনপথের কতটা সহায়তা হইয়াছে বলা যায় না—তবে সাহিত্য সৃষ্টি যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গৌরপারম্যবাদের অনুবর্ত্তী কবিরা বিশেষতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যসেবক আত্মীয় অনুবর্ত্তী কবিরা শ্রীচৈতন্যের রূপ আপন মনের মাধুরী দিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই অলৌকিক রূপ যেমন কল্পিত—তাহার দুর্নিবার আকর্ষণও তেমনি কল্পিত। সাহিত্যের দিক হইতে ইহা চমৎকার। কীর্ত্তনধর্ম্মপ্রচার, জীব উদ্ধার ইত্যাদির জন্য এই অলৌকিক রূপকল্পনার প্রয়োজন নাই ; ভক্তগণ তাঁহার দৈহিকরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লয় নাই নিশ্চয়। যেখানে শ্রীকৃষ্ণই উপেয়—শ্রীগৌরাঙ্গ উপায় সেখানেও রূপের এই অলৌকিকতার প্রয়োজন নাই। যেখানে গৌরাঙ্গ নিজেই উপেয়, নিজেই উপাস্য এবং মধুর রসের সাধনার পথে ভজনীয়—সেখানে তাঁহার অলোকসামান্য রূপের আকর্ষণসৃষ্টির প্রয়োজন আছে। নাগরীভাব, সখীভাব, গোপীভাব ছাড়া এ সাধনা সম্ভব নয়। এই ভাবের পক্ষে রূপের আকর্ষণের যেমন প্রয়োজন—নিজেদের গোপী বা নাগরীকল্পনারও তেমনি প্রয়োজন। গৌর-নাগরী ভাবের কবিরা নদীয়ার নারীদের মারফতে নিজেদের প্রেমাবিষ্টতাই প্রকাশ করিয়াছেন। নাগরীদের রূপমুগ্ধ প্রেমাবেশকে গৌরাঙ্গ উৎসাহিত করিতেছেন—এমন কথা বিশেষ কোন পদে নাই। তবে যদি কোথাও একটু-আধটু

থাকে—তবে তাহা সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনেই আসিয়া পড়িয়াছে।

গৌরাঙ্গের রূপের অলৌকিকতা কবিকল্পনা হইতে পারে, অসামান্যতা কবিকল্পনা নয়। এইরূপ অসামান্য রূপের একটি তরুণ প্রেমিক নৃত্যগীত হাবভাবের দ্বারা ব্রজভাবের বিস্তার করিয়া নগরময় ভ্রমণ করিবেন, অথচ কোন তরুণীর চিত্তে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য আসিবে না তাহাও স্বাভাবিক নয়। কবিরা বলিয়াছেন—নারীর ত কথাই নাই, পুরুষের মনও মুগ্ধ হয়। এই আকর্ষণ এবং রূপের প্রভাব স্বাভাবিক বলিয়াই কবিরা নদীয়ানাগরীদের মাধ্যমে নিজেদের প্রেমাবেশকে বাণীরূপ দিয়াছেন। এইটুকুও যাহারা বুঝিবে না, তাহারা নাগরীভাবের পদগুলি পাঠ করিবার অধিকারী নহে। প্রথমখণ্ডে নাগরীভাবের পদ লইয়া আলোচনা করিয়াছি—এখানে দুই একটি পদ তুলিয়া দিই।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরুছা পায়।
কিবা সে নাগর কি ক্ষণে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে॥
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়নকটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতীফুলের মালাটি গলায় হিয়ার মাঝারে দুলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটাটির ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে দাস গোবিন্দ কয়॥

ইহা গৌরচন্দ্রিকার পদ হিসাবেও চলে—ইহাতে আপত্তিজনক কিছু নাই। কিন্তু নরহরির পদগুলিতে আপাত আপত্তিজনক কথা অনেক আছে। এইপদগুলির ভাষা রীতিমত আধুনিক, বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত প্রবাদপ্রবচন ও লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গে পদগুলি পূর্ণ এবং পদগুলি ছন্দোবন্ধে আকৃতি প্রকৃতিতেও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে সরকার ঠাকুর নাগরীভাবের প্রবর্ত্তক,—তিনি এভাবের পদরচনা করিবেন না, ইহাও স্বাভাবিক নয়। যাহাই হউক যতদিন কেহ সুযুক্তিমূলক আপত্তি না জানাইবে, ততদিন নরহরির নামের পদগুলিকে তাঁহার নিজস্বই মনে করা যাইতে পারে।

ব্রজলীলার পদে ননদী, শাশুড়ী ইত্যাদির শাসনতাড়ন ও সতর্কতা যেমন রাধাকে শ্যামের সঙ্গে মিলিতে বাধা দেয়—নরহরির পদে সেইরূপ বাধার কথাই নানাভাবে বলা হইয়াছে। গৌরাঙ্গদর্শনের জন্য—নগর বধূরা বহুপ্রকার চাতুরীর অনুশীলন করিতেছে, গৌরাঙ্গের প্রেমাবিষ্ট অবস্থার নানা হাবভাবকে তাহারা নারীচিত্ত আকর্ষণের বিলাসচেষ্টা বলিয়া মনে করিতেছে—তাহারা রাধার মতই কুলশীল সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা। সবচেয়ে নাগরীদের প্রেমমুগ্ধতা প্রকাশিত হইয়াছে—স্বপ্নে গৌরাঙ্গমিলনের রসোদ্গারে। অনেকগুলি পদে স্বপ্নে গৌরাঙ্গসঙ্গ-সম্ভোগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কবিত্বের দিক হইতে নরহরির পদগুলি চমৎকার। নরহরি-প্রমুখ কবিরা নদীয়ানাগরীদের চাঞ্চল্যের চিত্রাঙ্কনের দ্বারা রীতিমত রসসৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

এ কাঠকঠিন হিয়া সার্থক হোয়ব কবে ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
এ কুচকমল মঝু সার্থক হোয়ব কবে ও ভ্রমরে মকরন্দ দিয়া॥
এ গণ্ডযুগল মঝু সার্থক হোয়ব কবে ও মুখের চুম্বন লভিয়া।
দেবকীনন্দন শির সার্থক হোয়ব কবে নাথের চরণে লুটাইয়া॥

ভণিতাই সমস্তটুকুর বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া চিত্তকে লইয়া যাইতেছে ভক্তির স্বর্গের দিকে। বাসু বলিয়াছেন—

হিয়ায় প্রেমের শর তনু ৈকল জরজর প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনী তীরে যাঙা ভাসাইব কুলক্রিয়া ভজিব সে গোরা গুণমণি॥
পুরুবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত এবে যেন কালতনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিকনাগর জানি নইলে কি গোপীমনচোরা॥

এখানে নাগরীরা গোরাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়াই যেন গৌরাঙ্গ ভজিতে ব্যাকুলা। আবার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—

লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ লও মোর জীবনযৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি সেই মোর সবরস ধন॥

ইহা বাসু ঘোষেরই আকিঞ্চন নাগরীদের মারফতে।

যদুনন্দন নারীজনসুলভ হৃদয়বত্তার অন্তরালে এক নাগরীর অনুরাগের চমৎকার আভাস দিয়াছেন; বধূ,—শাশুড়ী কিংবা জননীকে বলিতেছে—

গৌরাঙ্গচরিত আজু কি দেখঁলু মাই।
রাধারাধা বলি কাঁদে ধরিয়া গদাই॥
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ও মা হেম গায়॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কত সুরধুনী ধারা আঁখি বাহি পড়ে॥
মৈনু মৈনু কেন গেনু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরজ না ধরে চিত্তে ফাটি যায় হিয়া॥
দেখি দাস গদাধর লহুলহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে॥

গ্রীষ্মের রৌদ্রে কানাইকে গোঠে গোচারণে যাইতে দেখিয়া রাধার মনে যে মমতাময় করুণার ভাবের কথা দীনচণ্ডীদাসপ্রমুখ কবিরা বলিয়াছেন ইহা সেই অনুরাগের কথা।

লক্ষ্য করিতে হইবে—নাগরীভাবের বহুপদেই গোরার সঙ্গে গদাধর আছেন। গদাধরের প্রতি গৌরাঙ্গের মধুররসস্নিগ্ধ ভাব তরুণী-চিত্তে চাঞ্চল্য বাড়াইবে—ইহাই উদ্দেশ্য। মুরারিগুপ্তের একটি পদ—

সখি হে—কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া যেই পদছায়া বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে।
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।
আগে ফল জানিতাম পীরিতি না করিতাম যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে।
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে যায় ফাটি যায় কি না বুক।
মুরারি গুপুতে কয় পীরিতি সহজ নয় বিশেষে গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুলমান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর তবে সে পাইবা শচীবালা।

গোরার বদলে কানাই বসাইলেই ইহা রাধার আক্ষেপ অনুরাগের পদ। যদি বাচ্যার্থই ধরা যায়, তাহা হইলে নাগরীর আক্ষেপ এই—'আমি ঝুরি যার তরে চায়নাক সেত ফিরে।' অর্থাৎ গোরার পক্ষ হইতে আমার এই অনুরাগের কোন সাড়াই নাই।

নাগরীভাবের পদে অনুরাগটা এইরূপ একতরফাই।

লক্ষ্মীকান্ত দাসের—

কি খেনে দেখিনু গোরা নবীনকামের কোঁড়া সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কতবা করিব ছল কত না ভরিব জল কত যাব সুরধুনীতীরে।
বিধি, তো বিনু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত গর্জ্জন বচন কত ফুকারি কাঁদিতে নাই ঠাঁই।

করুণ-নয়নের কোণে চাঞাছিল আমাপানে পরাণে বড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারখারে যাউক গো কি জানি কি হবে পরিণামে।
আপনা আপনি খাইনু ঘরের বাহির হইনু শুনি খোলকরতাল-নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয় মরমে যার লাগয় কি করিবে কুলপরিবাদ॥

খোলকরতালের নাদে অনেকেরই কুলধর্ম্ম ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল—সেই কথাইত নাগরীর মারফতে বলা হইয়াছে।

জগদানন্দেরও এই ভাবের কয়েকটি পদ আছে। তিনি আলঙ্কারিক পারিপাট্য লইয়াই ব্যস্ত—নাগরীভাবের ভাবুক হইয়াও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। তাঁহার এই দুই চরণ সুন্দর—

সুমরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে তাক ধিরজ ধরু কো ধনী পড়ু কুলবতীকুলে বাজ।

নাগরীভাবের পদগুলির মধ্যে মুরারি গুপ্তের—'সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও', জ্ঞানদাসের—'সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গ-চাঁদে। হইনু পাগলী আকুলী ব্যাকুলী পড়িনু পীরিতি-ফাঁদে' এবং লোচনের অনেকগুলি পদ কবিত্বমধুর। নাগরীভাবের প্রবর্ত্তক নরহরি দাস—কিন্তু ইহার আসল কবি লোচনদাস। লোচনদাস নরহরির কাছে প্রেরণা লাভ করিয়া সমস্ত জীবন নাগরীভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। এই নদীয়া-নাগরী যে তিনি নিজে ভিন্ন অন্য কেহই নহেন তাহা—তাঁহার পদের ভণিতাতেই অভিব্যক্ত—

নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে।

লোচন বাঙ্গালীগৃহের নাগরীদের ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাহাদের ঘরকন্নার কথা দিয়াই তাহাদের সুখদুঃখের আভাস দিয়াছেন। তাঁহার অলঙ্করণও অনাড়ম্বর ও ঘরাও, তিনি যত দূর সম্ভব রচনায় ব্রজলীলার পদাবলীর অনুসরণ করেন নাই।

গৌরসাহিত্যের classical আবেষ্টনীতে তিনিই একমাত্র Romantic. তাঁহার নাগরীপদের জন্য গ্রন্থে প্রচলিত ছন্দও গ্রহণ করেন নাই—তিনি লোকমুখে প্রচলিত ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন—এই ছন্দকে 'ধামালী ছন্দ' বলে। সেকালে ধামালী (ঢামালী) গান এই ছন্দেই রচিত হইত। লোচন চৈতন্যমঙ্গলেও যতদূর সম্ভব নাগরী ভাব অনুস্যূত করিয়াছেন। নাগরীভাব লইয়া লোচন একটু বাড়াবাড়িও করিয়াছেন। কিন্তু সত্যসত্যই যে তিনি নদীয়াবাসিনীদের কথা বলিতেছেন না তাহা তাঁহার পদের ভণিতায় এবং ঠারে ঠোরে অনেক কথা বলার জন্য বুঝা যায়।

লোচনের নাগরীভাবের পদের মধ্যে এই গুলি বিখ্যাত—

১। আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।

২। ঊষাকালে সখী মিলে জল ভরিতে যাই

৩। এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।

৪। হেঁইলো হেঁইলো গোরা কেনে না যায় পাশরা।

৫। এ হেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তিজীবনের সূত্রপাত হয়—'হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া অবসানও হয় 'হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে প্রভেদ আছে। গয়া হইতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ফিরার পর নিমাই যখন 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বাপ কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছেন—তখন তিনি পরম ভক্ত। আর যখন পুরীধামে দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া পাগল হইতেন—তখন তিনি রাধা-ভাবে বিভাবিত। এই দুই ভাবের সঙ্গে গৌরনাগরিয়া ভাবের সম্বন্ধ নাই। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পর তিনি যে 'রাধা রাধা' বলিয়া ব্যাকুল হইতেন, গদাধরের মধ্যে রাধার অনুকল্পতা লাভ করিয়া

মাঝে মাঝে আশ্বস্ত হইতেন—ইহার সঙ্গেই গৌরনাগরিয়া ভাবের সম্পর্ক।

এই গৌরনাগর যখন মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইলেন—তখনই তাঁহার মাথুর যাত্রা। গৌরনাগরে যাঁহাদের মন মজিয়াছিল, যাঁহারা তাঁহাতেই সর্ব্বস্ব সঁপিয়াছিলেন—তাঁহাদের হায় হায় করা ছাড়া আর উপায় থাকিল না। গৌরনাগরিয়াদের কাছে ইহা শেল হইয়া রহিল। তাঁহাদের আর্ত্তনাদ বহু পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। সন্ন্যাসী চৈতন্যের মা-ও ছিল না, স্ত্রীও ছিল না, নবদ্বীপও ছিল না, সুরধুনীও ছিল না। গৌরনাগরের সবই ছিল। বিশেষতঃ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাদ দিলে গৌরনাগর অসম্পূর্ণ। ভক্ত কবিদের আক্ষেপ শচীমাতার পক্ষ হইতে, বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে আর নদীয়াবাসীর পক্ষ হইতে অতি করুণ রূপ ধরিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের চিত্র বড়ই করুণ নদীয়ার সকল ভক্তদের পক্ষে, কিন্তু গৌর-নাগরিয়াদের পক্ষে হৃদয়বিদারক। ইহার আকস্মিকতা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার আকস্মিকতার মতই। এই সন্ন্যাসদৃশ্যের প্রধান গৌর-নাগরিয়া কবি বাসু ঘোষ। বাসু বলেন—

কিকব দুখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া।

বাসু বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে বহুপদে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ও প্রেমদাসেরও গৌরবিরহের পদ অনেক আছে।

বাসুঘোষের নিম্নলিখিত পদটি নদীয়ানাগরিয়া ভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা নদীয়া নাগরীদের পক্ষ হইতে বিলাপ—

হরি হরি কিনা হৈল নদীয়ানগরে।
কেশবভারতী আসি কুলিশ পাড়িল গো রসবতী পরাণের ঘরে।

প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে সে সব স্বপনসম ভেল।
গিরিপুরী-ভারতী আসিয়া করিয়া যতি আঁচলের রতন কাড়ি নেল।
নবীন বয়স বেশ কিবা সে চাঁচর কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশিয়া।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।
সুরধুনীতীরে তরু কদম্ব খণ্ডেতে বরু প্রাণ কাঁদে কেতকী হেরিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া।

নাগরীদের পক্ষ হইতে বিলাপের পদ ২।১টির বেশি পাওয়া যায় না। এবং এই পদ যতটা করুণ হইবার কথা ততটা করুণও নয়। শচীমাতার বিলাপের প্রধান কবি প্রেমদাস। বল্লভ দাসের একটি পদে শচীমাতার স্বপ্নের কথা আছে। শচীমাতা নিমাইকে স্বপ্ন দেখিয়াছেন—স্বপ্নের কথা তাঁহার সখী শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীর কাছে বলিতেছেন।—

নাই সে চাঁচর কেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ বহির্বাসে কৌপীন পিন্ধনে।
ধূলায় সে অঙ্গ ভরা যেমন পাগল পারা প্রেমধারা বহে দুনয়নে।

শচীমাতা বলিতেছেন—জলন্ত অঙ্গারের মত যৌবন সর্বাঙ্গে লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া যে আমার গলায় রহিয়া গেল,—তাহাকে লইয়া আমি কি করি?

ব্রজনাগরীদের মধ্যে যেমন রাধা, নদীয়ানাগরীদের মধ্যে তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়া। নদীয়া-নাগরিয়া ভাবের কবিরা বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠে এইভাবে আর্ত্তনাদ করিয়াছেন—

হায়রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর,
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর।
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ি হ'ব ছারখার। (বাসু-ঘোষ)

এ নব যৌবনকালে মুড়াইলা চাঁচর চুলে কি জানি সাধিলা কোন সিধি।
কি জানি পরাণ যে পশুবৎ পণ্ডিত সে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে দিলা বিধি।

অক্রূর আছিল ভাল রাজবোলে লৈয়া গেল থুইল্যা লৈয়া মথুরা নগরী।
নিতি লোক আসে যায় তাহার সংবাদ পায় ভারতী কৈল দেশান্তরী।

(বাসুদেবানন্দ)

বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যার পদগুলি চমৎকার। পদগুলি গৌরনাগরিয়া ভাবেরই অনুগামী। লোচনদাসের দুইটি বারমাস্যাই সব চেয়ে বাস্তব-ধর্ম্মোপেত।

লোচনদাস সম্বন্ধে আলোচনায় কতকগুলি চরণ উৎকলন করিয়াছি! শচীনন্দন দাসের বারমাস্যা ব্রজবুলিতে রচিত। ইহাতে গৌরনাগরের রূপই ফুটিয়াছে—

যো পদতল থল-কমল সুকোমল কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে।
সো পদ মেদিনী তপত কুশবনে ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥
কি বা সে চাঁচর চিকুর শ্যামর চূর্ণকুন্তল শোভিতা।
ভালে চন্দন তাহে মৃগমদবিন্দু রতিপতি মোহিতা॥
এ হেন সুখদিন গেল দুরদিন ভেল বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন অঙ্গ পরশন শুনিতে দুলহ সে নাম রে॥
এ নব যুবতী পরাণে বধিয়া সন্ন্যাসে কি ফল পাওব রে
কানে কুণ্ডল পরি যোগিনী হই পিয়া পাশ হাম যাওব রে॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্ত কিছুতেই সন্ন্যাসে সায় দেয় নাই। ঘরের নবযুবতীকে বধ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ইহা কখনও ধর্ম্ম নয়। লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়াছেন—"সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নয়।" সংকীর্ত্তনের চেয়ে যে বড় ধর্ম্ম নাই—তাহাত গৌরনাগরই একদিন বলিয়াছিলেন। যিনি প্রেমের সাধক, প্রেমের প্রচারক, তাঁহার প্রেমময় রূপ-বেশ ত্যাগ করিয়া, যাহারা প্রিয়জন তাহাদের বর্জ্জন করিয়া, তিনি কোন ধর্ম্মের আচরণে গেলেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবের ভাবুক ভক্তগণও

এই কথাই বলিয়াছেন। ভুবনদাসের ব্রজবুলিতে রচিত বারমাস্থাও চমৎকার—শেষ স্তবক উদ্ধরণ করি—

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহরি কম্পি কলেবর পুন পুন বিরহিণী পর-উতপাত।
সজনি অবহি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল ইথে পুন বিদরয়ে বুক।
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন চিত মাহা কর বিশোয়াস।
গৌর-বিরহজ্বরে ত্রিদোষ হইয়া জারে তাহে কি ঔষধ অবকাশ।
এত শুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী রোই সবজন ঘেরি॥
দাস ভুবন ভণে ধৈরজ করহ মনে গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি :

বিষ্ণুপ্রিয়া কি সেই আশায় আশায় জীবন ধারণ করেন নাই ?

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং।
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥

গৌরনাগরিয়া ভক্তগণও সেই সঙ্গে আশা করিয়াছিলেন—তিনি একদিন ফিরিবেন। এই ভক্তগণের প্রতিনিধি বাসু ঘোষ ভাবের পথে তাঁহাকে ফিরাইয়াছেন এবং প্রভুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

হায় কি করিলাম কাজ সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যাব নীলাচলে থাকিব ভকত মেলে ইহা বলি হরল গেয়ান।

এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য কবি যেমন—নরহরিদাস, লোচন, দুঃখী কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদাস—ইহারাও ভাবসম্মেলনের পদরচনা-করিয়া ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠপদ জগদানন্দের, বিষ্ণুপ্রিয়ার পুনর্মিলন-কল্পনার মাধুর্য্য ইহাতে ওতপ্রোত। জগদানন্দ-প্রসঙ্গে এইপদের আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদামৃত, বচনামৃত ও ভূষণশিঞ্জনামৃত এই তিন অমৃতে 'হরে কাণ হরে মন হরে প্রাণ।' যদুনন্দন দাস, কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'তিন অমৃতে ভাসাইলা এ তিন ভুবন।' কবিরাজের তিন অমৃতও কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করে। এই তিন অমৃত—গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গীতার মতই বাংলার ধর্ম্মশাস্ত্র। শ্রীচৈতন্য বাংলার শ্রীকৃষ্ণ। বাংলাভাষায় এরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই। এই গ্রন্থ একাধারে কাব্য, ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ, তত্ত্ববিদ্যার পুস্তক। এই গ্রন্থের ভাষা গদ্যাত্মক; ভাষায় পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা বা বিশুদ্ধি নাই, ব্যাকরণের নিয়ম বহুস্থলে লঙ্ঘিত হইয়াছে। ঐছেবাত মং কহ, বোলানো, পুছা ইত্যাদি হিন্দী শব্দেরও প্রয়োগ আছে মাঝে মাঝে, ছন্দের দোষ সর্ব্বাঙ্গে, মিলগুলি সুষ্ঠু নয়, কতক অংশে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের বর্ণনা, কতক অংশ জটিল সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তবু ইহা চমৎকার কাব্য। এই কাব্যের উপজীব্য মহত্তম বস্তু, এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং পুরুষোত্তম, ভক্তহৃদয়-বিগলিত রসধারা ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত, বর্ণনার যথাযথতা ইহাকে চিত্রমালায় অলঙ্কৃত করিয়াছে, শ্লোকগুলির ব্যাখ্যানচ্ছলে কবি যে পদগুলি রচনা করিয়াছেন, সে গুলি ভাবৈশ্বর্য্যে উর্জ্জিতশ্রী লাভ করিয়াছে, শ্লোকগুলিকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া পদগুলি আপনার রসসৌন্দর্য্যে কুসুমিত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে যে উপমাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—সেগুলি মৌলিক। অনেক স্থলে

অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া দীর্ঘ বর্ণনা ইহাতে আছে। কিন্তু সেগুলি এই তত্ত্বঘন গ্রন্থটিকে সজীবতা ও বাস্তব পারিপার্শ্বিকতা দান করিয়াছে— ভাবজগতের সহিত বাস্তব জগতের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে।

একটা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রসাবেগ কাব্যখানিকে লোকোত্তরতা দান করিয়াছে। কবির ব্যক্তিগত দৈন্য, আকিঞ্চন স্থলে স্থলে গীতি-কবিতার মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। বহু কবিত্বময় রসগর্ভ শ্লোক স্বর্ণময় কাব্যদেহকে রত্নখচিত করিয়াছে। লেখকের অপরিসীম নিষ্কাম ভক্তি গৌরচরিতের পরমাত্মাকে কর্পূরের মত সুবাসিত করিয়াছে।

পণ্ডিত জগদানন্দের মান অভিমানের পালা, শ্রীধরের রসকলই ও রঙ্গপরিহাস, শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে ভিক্ষান্নভক্ষণ, অদ্বৈত-নিত্যানন্দের লীলাকলহ, দামোদরের বাগ্‌দণ্ড ইত্যাদি কাব্যেরই অপূর্ব্ব উপাদান হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের বহুস্থলে তালিকা আছে—বহু ব্যক্তি, স্থান, দ্রব্যের নামমালাকে কবি ছন্দোবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন।

চরিতামৃত প্রধানতঃ পয়ারেই রচিত। যে পদগুলি শ্লোকের রস-ব্যাখ্যান, সেই পদগুলি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এই দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের মাত্রা অক্ষরগণনার দ্বারা সর্ব্বত্র নিষ্পন্ন নয়। অনেক স্থলে পদাংশ-মাত্রা-গণনার দ্বারা নিষ্পন্ন।

নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোকগুলি আহরণ করিয়া—নানা গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া ভক্তকবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মধুসূদন বলিয়াছিলেন "রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধেও বলা যায়।

গ্রন্থে শ্লোকের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিয়া কবি বলিয়াছেন—

যদি কেহ হেন কয় গ্রন্থ হৈল শ্লোকময় ইতরজন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে ॥

সেকালে গদ্য লেখার প্রথা ছিল না। কবিরাজ গোস্বামীর পদ্যের মধ্যেই সেকালের গদ্যও বিরাজ করিতেছে—

"সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র লিখিব। ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব।" এই ধরনের পদ্যত রীতিমত গদ্যই।

যদুনন্দন, গোবিন্দদাস ইত্যাদি বৈষ্ণবপদকর্ত্তারা রূপগোস্বামীর বহু শ্লোককে অপূর্ব্ব পদে পরিণত করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী অন্যের শ্লোককে কি ভাবে চমৎকার পদে পরিণত করিতেন—তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। শ্লোকটি এই—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥

কবিরাজের রসব্যাখ্যান—

বংশীগানামৃত-ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখিহে! শুন মোর হতবিধিবল,
মোর বপু চিত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে।

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ-চরিত
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বাসম॥
মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সে নাসিকা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণকর-পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার সে হউক ছারখার
সেই বপু লৌহবপু গণি॥
করি কত বিলপন প্রভু শচীনন্দন
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥

শ্রীচৈতন্যের মুখে এইরূপ শ্লোক বসাইয়া কবি ব্যাখ্যানচ্ছলে বহু অপূর্ব্ব রসঘন পদ রচনা করিয়াছেন। কেবল এই পদগুলিই চরিতামৃতের কবিত্ব-বৈভব-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য, এই পদ শ্লোকের অনুবাদ-ত নহেই—শ্লোক হইতে কেবল ক্ষীণ ভাবসূত্রটি ছাড়া কবি কিছুই পান নাই। ইহাকে পদের শিরোনামামাত্রই বলা চলে। চরিতামৃতের সব পদগুলিই এই ভাবে রচিত। এই পদগুলির জন্যই চরিতামৃতকার পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের সমকক্ষ—এমন কি স্থলে স্থলে রসঘনতায় তাঁহাদেরও

ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যে শ্লোকগুলি বসানো হইয়াছে, বলা বাহুল্য সেগুলি তাঁহার উচ্চারিত নয়—কাব্যের প্রয়োজনেই তাঁহার শ্রীমুখে বসানো হইয়াছে। কবি কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে শ্লোকের অনুবর্ত্তিতায়, সে শ্লোক মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই উদীরিত। সেই স্বরূপটি এই—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে শুভ্র বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
সে প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চরবণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে বিষামৃতে একত্রমিলন॥

এই শ্রেণীর শ্লোক সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জসার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার।"

ইতিহাসহিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য চৈতন্যভাগবতের চেয়ে বেশি। চৈতন্যভাগবতে শুধু গৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'নিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে হৈল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রৈল অবশেষ।' কেবল তাহাই নয়—বহির্বঙ্গের লীলার কথা চৈতন্যভাগবতে সামান্যই আছে। চরিতামৃতে নবদ্বীপলীলার কথা সূত্রাকারে হইলেও সবটাই আছে। সে লীলার কথা চরিতামৃতের ভূমিকার মত। ইতিহাসের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইহাতে দক্ষিণাপথ, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন ও পুরীধামের লীলার কথা বিস্তৃতভাবেই আছে। চরিতামৃতকে চৈতন্যভাগতের অনুপূরকমাত্র বলা চলে না। ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যচরিতই বলিতে হয়। ইহাতে রূপ, সনাতন, রামানন্দ, শিবানন্দ, প্রতাপরুদ্র, প্রকাশানন্দ. সার্ব্বভৌম. স্বরূপ দামোদর, হরিদাস, রঘুনাথ ইত্যাদি

অন্তরঙ্গ ভক্তদের কথা বিস্তৃত ভাবেই বলা হইয়াছে। এই ভক্তদের সঙ্গ-প্রসঙ্গেই প্রকৃত চৈতন্যলীলা সুপরিস্ফুট।

চরিতামৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ইতিহাস নয়, ইহা কাব্যের গর্ভকোষে নিবদ্ধ ইতিহাস। কাজেই ভক্তি রসাত্মক কাব্যের অন্তরে যতটা ইতিহাস যুক্তিসহ, ততটাই গ্রহণ করিতে হইবে। সংক্ষেপে সে ইতিহাস এই—কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভু অদ্বৈতের গৃহে কয়েক দিন উৎসব করেন। তারপর তিনি নৌকাপথে পুরীতে আসেন। এখানে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি পুরীধামে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাপথ পরিক্রমায় বাহির হ'ন। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন। দক্ষিণাপথে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়। দক্ষিণাপথভ্রমণের পর ফিরিয়া আসিলে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে চান। মহাপ্রভু কিছুতেই বিষয়ীর মুখদর্শন করিতে চান না—শেষে ভক্তেরা কৌশলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত করান। গৌড়ের ভক্তগণ দল বাঁধিয়া হাঁটাপথে শিবানন্দ সেনের অভিভাবকতায় প্রতিবৎসর প্রভুর চরণ দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারা তিন চারিমাস পুরীতে প্রভুর কাছে থাকিতেন। পুরীর রাজা তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন।

গৌড়ের ভক্তগণকে পাইয়া মহাপ্রভু খুবই আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নবদ্বীপের মত সংকীর্ত্তনে মত্ত হইতেন। তাঁহাদের বিদায়কালে প্রেমাবতার শিশুর মত রোদন করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহে থাকিতেন। সাধারণতঃ তিনি জগন্নাথের প্রসাদই খাইতেন—তবে ভক্তগণ মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ

করিযা তাঁহাকে বহুব্যঞ্জন ও পিষ্টক-পরমান্নাদির দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এই সময় রামকেলি হইয়া কানাইএর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করেন। রামকেলিতে রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের চিত্তে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত হয়। এ যাত্রায় বৃন্দাবন যাওয়া হইল না—তিনি কয়েক দিন গৌড়ের ভক্তদের গৃহে উৎসব করিয়া পুরীধামে ফিরিয়া আসেন। তারপর তিনি বনপথে বলভদ্র নামে একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে পৌছিয়া তিনি তীর্থ উদ্ধার করেন। বৃন্দাবনে তিনি বেশিদিন ছিলেন না—অতিরিক্ত লোকসংঘট্টের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রয়াগে আসেন। প্রয়াগে রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়,—ব্রজলীলাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া তিনি রূপকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি কাশীধামে আসেন—এখানে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়া তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিয়া তাঁহারও জীবনে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকেও বৃন্দাবনে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপের কাছে পাঠাইয়া দেন। এখানে তিনি প্রকাশানন্দকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কেবল তাহাই নয়, কাশীধামে যে সকল জ্ঞানযোগী ও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'ভাবক-চূড়ামণি' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল—তাহারাও তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরূপ বৃন্দাবন হইতে আসেন। মহাপ্রভু তাঁহার ব্রজলীলাত্মক নাটকরচনার নিদর্শনের রস আস্বাদন করেন এবং সাহিত্যরচনায় তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। ইহার পর সনাতন আসিয়া কিছুকাল প্রভুর কাছে বাস করেন। রঘুনাথ

দাস আসিয়া চরণাশ্রয় করিলে—তাঁহাকে শিক্ষা দান করেন, পরে তাঁহাকেও বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজীবন ২৪ বৎসরকাল স্থায়ী। তন্মধ্যে ৬ বৎসর নানাস্থানে গমনাগমনে যাপিত হয়,—১৮ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে পুরীতে স্থির হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে শেষ বারো বৎসর তাঁহার দিব্যোন্মাদের অবস্থা। ক্বচিৎ কখনো পূর্ণ বাহ্য দশায় অধিষ্ঠিত হইতেন। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় তিনি সমুদ্রে যমুনাভ্রমে ঝাঁপ দেন। এক জালিয়া তাঁহাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের ইতিহাস ইহার বেশি বিশেষ কিছু নাই। প্রতাপরুদ্রের ধর্ম্মপ্রাণতা, শ্রীজগন্নাথদেবের পূজাপার্ব্বণ, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ও নিত্যসেবার কথা, সেকালের পথঘাটের বিবরণ ইত্যাদি যে সকল কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে, সে সকল কথাও ইতিহাসেরই অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবঘোরে থাকিতেন—পথের ক্লেশ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি অনুভব করিতেন না। বরং নিত্যানন্দ একবার ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বৈষ্ণবসমাজের পিতৃকল্প সাধু শিবানন্দ সেনকে লাথি মারিয়াছিলেন।

ভোজনবিলাস ও ভোজ্যদ্রব্যের কথা এত বেশিবেশি এই গ্রন্থে আছে যে এরূপ তত্ত্বমূলক গ্রন্থে সে সব কথা অনেকের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়। সেকালে ভক্তির পাত্রের সেবা করিবার একটি মাত্র উপায় জানা ছিল—সে উপায় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করানো। এইরূপ ভোজনের কথা বহুবার বহুস্থলেই আছে। কেবল রাঘবের ঝালি নয়—গৌড়ীয় ভক্তেরা নবদ্বীপ হইতে বহুদূরবর্ত্তী পুরী পর্য্যন্ত ঠাকুরের জন্য বহুপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। ভক্তগণের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া মহাপ্রভু সমস্তই গ্রহণ ও আস্বাদ করিতেন।

দক্ষিণাপথে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের দেখা হইলে পুরী বলিয়াছিলেন, শচীদেবীর রান্না 'মোচার ঘন্টের' স্বাদ আজিও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। নিরামিষ ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য ও পারিপাট্য সেই সময় হইতে বৈষ্ণব ভোগরাগের একটা অঙ্গ হইয়া আছে। সেকালের লোকে কি কি খাইত, কিরূপ পরিত, চরিতামৃতে তাহা বিস্তারিত ভাবেই জানা যায়।

পুরীধামে জগন্নাথদেবের সেবা ভোজ্যবিলাসে পরিণত। রাশি রাশি ভোজ্যসম্ভারের মধ্যে জগন্নাথদেব এমন কি তাঁহার মন্দির পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে রচিত হইলেও এই মহাপ্রসাদী ভোজ্যবিলাসের প্রভাব যেন চরিতামৃতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী অনেক তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতেও ভোজ্যদ্রব্যের উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যে ভোজনবিলাসকে ব্রজের গোস্বামীরা জীবনে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কবি কাব্যে তাহাকে ঠাঁই যেন দিয়া তাহার দাবী মিটাইয়াছেন। যাহাই হউক—এই ভোজ্য-বর্ণনাই গৌরাঙ্গদেবকে অপ্রাকৃত জগৎ হইতে আমাদের গৃহ-সংসারের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে।

ভক্তাবতার কেবল ভক্তি গ্রহণ করিতেই অবতীর্ণ হ'ন নাই,—তাঁহার মত ভক্তি করিতেও কেহ জানিত না। গুরুজনমাত্রকেই তিনি ভক্তি করিতেন, গুরুর সতীর্থ দুর্জ্জন হইলেও তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেন। বৃন্দাবনদাস ব্রাহ্মণ-পাদোদক পান এবং ভক্তগণের চরণসেবার কথাও বলিয়াছেন।

মুরারিগুপ্তের কড়চা, স্বরূপগোস্বামীর কড়চা ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ ছাড়া ভক্তদের মুখে কবিরাজ গোস্বামী যাহা শুনিয়াছিলেন—তাহাই তিনি নির্বিচারে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে বলিয়াছেন—'তর্ক করিও না—বিশ্বাস কর। তর্কে পাপ হইবে।'

এমন অনেক কথাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—যাহা শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে অতি তুচ্ছ কথা কিংবা যাহাতে মহাপ্রভুর মহিমা হয়ত সাধারণের চোখে একটু-আধটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। মহাপ্রভুর মানবিক হৃদয়-দুর্ব্বলতার কথাও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

চরিতামৃতের অন্ত্য লীলার এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি ভক্তের সম্বন্ধে,—শ্রীচৈতন্যের সহিত ভক্তবিশেষের সাক্ষাৎ ও তাঁহার চরণাশ্রয়-প্রাপ্তির ইতিহাস। মধ্যলীলারও কয়েকটি পরিচ্ছেদও ভক্তসাধকেরই কথায় পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের কথা সংক্ষেপেই বিবৃত, কারণ একই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শেষ দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া যাইত।
"রাত্রিদিবসে কৃষ্ণবিরহ স্মরণ। উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যেন উদ্ধবদর্শনে। সেইমত প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে॥"

গৌড়িয়া ভক্তগণ প্রতিবৎসরই যথাসময়ে আসিতেন—কিন্তু তাঁহারা আর তাঁহাদের প্রাণের গৌরকে লইয়া মাতামাতি করিতে পারিতেন না,—তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধর পণ্ডিতের শাখা গণনাচ্ছলে যে সকল বৈষ্ণবভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহারাই এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহারা সকলেই অসামান্য ভক্ত। তাঁহাদের মত একজনের প্রভাবেই একটা জাতির উদ্ধার হইতে পারে। হায়, এই ভক্তেরা পাষাণে বীজবপন করিয়া তাহাতে অবিরল অশ্রুজল সেচন করিয়া গিয়াছেন!

চরিতামৃতে সুলতান হোসেনশার প্রসঙ্গ আসিয়াছে। গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে মহাপ্রভু যখন নামপ্রচার করিতেছিলেন। তখন সেখানে দলে দলে লোকসংঘট্টের কথা হোশেন শা'র কানে গেল। তিনি তখন দবির খাসকে (রূপ-কে) মহাপ্রভুর অসামান্য প্রতিষ্ঠার

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ বলিলেন—'তুমি রাজা, কাজেই বিষ্ণু-অংশসম। তোমার মনে কি হয়?' হোশেন শা বলিলেন—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহ নাহিক সংশয়।' বলা বাহুল্য, হোশেনশা সত্যই যদি এ কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার এই উক্তি অকপট নয়। একজন মুসলমানের পক্ষে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকরণ বহুদিনকার বহু সাধনার ফলেই জন্মিতে পারে। হোসেনশার কোন' সাধনাই ছিল না। শ্রীচৈতন্য যদি তাঁহার মতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্যও তাঁহার থাকিত, অন্ততঃ সনাতনকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহার আপত্তি হইত না। আমাদের মনে হয়, রাজ্যের প্রধান দুইজন অমাত্য চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করায় হোসেনশা সুখী-ত হ'নই নাই, শ্রীচৈতন্যের প্রতি হয়ত বিরূপই হইয়াছিলেন।

রূপ প্রথমদর্শনে প্রভুকে বলিয়াছেন, "পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।" পরে রূপের কাছে একথা "এহো বাহ্য" হইয়াছে। এই সময়ে মহাপ্রভু রূপকে যে উত্তর দিয়াছেন—তাহা পরকীয়াবাদের একটি আনুরূপ্য-মূলক ব্যাখ্যা—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥

মহাপ্রভু সনাতনের উপদেশে রামকেলি হইতে গৌড়ে ফিরিলেন। হোসেন শাহের মৌখিক ভক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তাহা ছাড়া, তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্ট যবনদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া অন্য কারণেও অসঙ্গত।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রধানতঃ তত্ত্বগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারমর্ম্ম—ব্রজের গোস্বামীদের তত্ত্বচিন্তার সারনির্যাস ইহাতে উপনিবদ্ধ। মন দিয়া বিশেষজ্ঞের সাহায্যে চরিতামৃত পড়িলে

বৈষ্ণবতত্ত্বের সব কথাই জানা যায়। রচনার অসম্যক্ বাচনভঙ্গীর জন্য যাহা বুঝা যাইবে না—তাহা ভক্তগণের জীবনকথার মধ্য দিয়া উদাহৃত ও বিশদ হইয়াছে।

গ্রন্থের গোড়ায় তিনি যে সব তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন, সেই তত্ত্বগুলি শ্রীরূপশিক্ষা, সনাতনশিক্ষা, ও রামানন্দের সহিত ভাববিনিময়ে পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থে ভগবত্তত্ত্বের কথা সবই শাস্ত্রানুবর্ত্তী। সাধ্য-সাধনতত্ত্বই চরিতামৃতের নিজস্ব সম্পদ্। যে গোপীভাবের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, সেই গোপী ভাবটি বুঝাইবার জন্য—এবং যে মহান্ গোপীভাব (রাধাভাব) লইয়া শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ, সেই ভাবটি বুঝাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর তত্ত্বকথা বুঝাইবার উপায় নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উৎকলন। নিজের দায়িত্বে তিনি বেশি কথা বলেন নাই—তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে শ্লোকগুলির মধ্য দিয়া। কবিরাজ গোস্বামী কোন কোন শ্লোকের অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিয়াছেন, আবার কোন কোন শ্লোকের সম্বন্ধে অল্প ২।১টি কথা বলিয়াছেন। তিনি শ্লোকগুলিকে নিজের প্রাকৃত ভাষণের সূত্রে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বস্তু সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এ পদ্ধতি তাঁহারই নিজস্ব। সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কবি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন সূত্রাকারে। তত্ত্বের দিক হইতে লেখক নিজের মতামত কিছুই দেন নাই—তিনি কেবল তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা অবলম্বনে তিনি চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অবতরণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

কবি চৈতন্যাবতারের কারণ নির্দেশ কল্পে স্বরূপগোস্বামীর—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এই শ্লোক উৎকলন করিয়া কবি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা সুখে শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হইতে রাধা পায় যে গভীর সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইতে লীলা আচরণ দ্বারে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হ'ব অবতীর্ণ॥

ইহাই চৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবের উদ্ধার ইত্যাদি গৌণ।

নিত্যানন্দ অবতারের ভূমিকাহিসাবে কবিরাজ যে তত্ত্বের জটিলতা-জাল বয়ন করিয়াছেন তাহা দুশ্ছেদ্য। ছেদন করিতে পারিলেও কোন লাভ আছে মনে হয় না। স্বরূপগোস্বামীর কড়চায় কোন জটিলতা নাই।

অদ্বৈতাবতারপ্রসঙ্গে কবিরাজ বলিয়াছেন—সকল রসের মধ্যে দাস্যরস নিগূহিত আছে। অদ্বৈত গুরুস্থানীয় হইলেও তাঁহার বাৎসল্যে দাস্যাভিমান নিগূহিত ছিল।

প্রকাশানন্দের বোধনা উপলক্ষে শঙ্করের যুক্তি খণ্ডন করিয়া চরিতামৃতের শ্রীচৈতন্য নিজের ব্রহ্মবাদের কথা এই ভাবে বলিয়াছেন—

ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহ আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি আধিক্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্তে যে ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
মণিরাজ তথাপি স্বরূপ আকৃতিতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণ অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥

চিন্তামণি যেমন অবিকারী থাকিয়া মণিরত্ন প্রসব করে, ব্রহ্ম তেমনি অধিকারী থাকিয়াই জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই তত্ত্ব Krauseএর Panentheismএর অনুরূপ, Pantheismএর অনুরূপ নয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—জন্মক্ষণ হইতেই মহাপ্রভু নবদ্বীপের লোককে কৃষ্ণনাম করাইতেন। এমন দিনে তিনি জন্মিলেন যে দিন গ্রহণের জন্য নবদ্বীপবাসীকে হরি সংকীর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কবিরাজ বলেন, শ্রীচৈতন্য বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন সবকালেই

কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছেন—এ বিষয়ে চৈতন্যভাগবতের সঙ্গে মতভেদ আছে। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বর্ণনাটি মন্দ নয়, বুড়া কৃষ্ণদাস না হইয়া তরুণ-জ্ঞানদাস হইলে ইহাতে প্রচুর রস জমাইতে পারিতেন!

কবিরাজ গোস্বামী যে বয়সে মহাপ্রভুর বঙ্গদেশবিজয়ের কথা বলিয়াছেন, সে বয়সে ভগবানের পক্ষেই তাহা সম্ভব। বৃন্দাবনদাস দিগ্বিজয়িপরাভবের পর ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন।

কাজীবিজয়ের কাহিনী ইহাতে চৈতন্যভাগবত হইতে একটু পৃথক। সব চেয়ে ক্ষোভের কথা কবিরাজ বলিয়াছেন--নবদ্বীপের হিন্দুরাই কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য কাজীর নিকট আর্জি করিয়াছিল।

মহাপ্রভু ক্রমে উপলব্ধি করিলেন—নবদ্বীপের লোক বিশেষতঃ অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা সন্ন্যাসী না হইলে তাঁহার কথা শুনিবে না।

গৃহস্থাশ্রমী ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে সকলে মানে না। এই চিন্তা করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিলেন।

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিক জন। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়ার গণ॥
কেহকেহ এড়াল প্রতিজ্ঞা হ'ল ভঙ্গ। তাসবে ডুবাতে আমিপাতি কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার॥

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের আগে নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পর মায়ের কাছ হইতে বিদায় লওয়ার জন্যই যেন তিনি অদ্বৈতের গৃহে আসিলেন। এখানে মাতা পুত্রের মিলনচিত্রটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। এখানে নিমাই একেবারে সাধারণ মানুষ। মহাপ্রভু বলেন—মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না, 'সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম।''

শচীমাতাই ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। কৌশল্যার মতই তিনি পুত্রকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে অনুমতি দিলেন—

তিঁহ যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভালো মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর!
লোক-গতায়তি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥"

মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস এই সিদ্ধান্তেরই ফল।

নীলাচলযাত্রার পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রেমুনায় মহাপ্রভুর ক্ষীরচোরা গোপীনাথদর্শন। এই প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর কাহিনী কথিত হইয়াছে।

মাধবপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, তাঁহার শিষ্য মহাপ্রভু, অতএব মহাপ্রভু মাধবপুরীর প্রশিষ্য। অনেকে যে বলিয়াছেন, মহাপ্রভু মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক, তাহা ঠিক নয়। মাধ্ব নয়, তাঁহাকে মাধব-সম্প্রদায়ের লোক বলা যাইতে পারে। কোন কোন পুঁথির লিপিকার মাধবকেই মাধ্ব লিখিয়াছেন কিনা তাহাই বা কে বলিল?

যিনি ত্রিজগতের ঈশ্বর তিনি গোপালরূপে ম্লেচ্ছভয়ে বৃন্দাবনের বনে লুকাইয়াছিলেন, তিনি ভোকে শোষে (ক্ষুধায় তৃষ্ণায়) কাতর, তাঁহার অঙ্গে দারুণদাহ, তিনি চন্দন মাখিতে চান—তিনি ভক্তকে স্বপ্ন দিয়া উদ্ধার পাইতে চান, সেবা চান। যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝেন না তাঁহারা বলিবেন—এ একটা গাঁজাখুরি গল্প!

এই গল্পের অন্তরালে যে তত্ত্ব আছে তাহা এই—মাধবেন্দ্র ছিলেন বাৎসল্যরসের সাধক, 'ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর'। বাৎসল্যরসের মূলসূত্র,—ভগবানকে অসহায় অশক্ত দুর্ব্বল অনুকম্পার পাত্র কল্পনা করা। শিশুর মত অনুকম্পার পাত্র কে? ভক্তিরসসাধনার জন্যই ভগবানকে ঐভাবে কল্পনা করা হইয়াছে।

কটকে সাক্ষিগোপালদর্শন, পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ। * সাক্ষিগোপালের কাহিনীতে বলা হইয়াছে—'অকুলীন ধনবিদ্যাহীন' সাধারণ মানুষেরও যদি অকপট অবিচল অন্ধ একান্তনির্ভর ভক্তি থাকে, তবে ভগবান তাহারই বশীভূত হ'ন। বৈধী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানলেশশূন্য অটল ভক্তি ঢের বড়।

সার্ব্বভৌম-গৃহে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। শাস্ত্রজ্ঞানসর্ব্বস্ব সার্ব্বভৌমের কাছে প্রথম দর্শনে চৈতন্যদেব মহাভাগবত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দেহে মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি ভক্ত গোপীনাথ বলেন—'তুমি যে মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়া মহাভক্তের লক্ষণ বলিতেছ, উহাইত ঈশ্বরলক্ষণ।' "ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা।" সার্ব্বভৌম বলেন—কলিযুগে ভগবানের অবতার নাই। গোপীনাথ ভাগবত ও মহাভারতের শ্লোক তুলিয়া বলেন—কলিযুগে লীলাবতারের পূর্ব্বাভাস এই সকল শ্লোকে আছে। এই শ্লোকগুলির কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে সবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ভক্তি ছাড়া তাঁহার উপাসনা সম্ভব নয়, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা বুঝাইলে সার্ব্বভৌম স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। এত সহজে সার্ব্বভৌমের স্তম্ভিত হইবার কথা নয়। তারপর ভাগবতের একটি শ্লোকের সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিলেন নয়টি, চৈতন্য ব্যাখ্যা করিলেন আঠারোটি পৃথক পৃথক্।‡ ইহাতে চৈতন্য যে অগাধ

---

* শ্রীচৈতন্য দেবের সময়ে সাক্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন। ম্লেচ্ছভয়ে নানাস্থান ঘুরিয়া এখন সত্যবাদী গ্রামে অবস্থিত।

‡ অতএব ব্যাখ্যা দাঁড়াইল ২৭টি, এই সমস্ত ব্যাখ্যা মহাপ্রভু সনাতনকে শুনাইয়াছিলেন। ব্যাখ্যাগুলি এখানে বিবৃত হয় নাই।

পণ্ডিত ইহাই সার্ব্বভৌমের উপলব্ধি করিবার কথা, কিন্তু তাহাতেই

"প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার।"

চরিতামৃতের শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের এই স্বীকৃতিকে যথেষ্ট মনে করেন নাই। ইহার পর তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর চতুর্ভুজরূপ ও দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ প্রদর্শনের কথা বলিয়াছেন। ইহাইত চরম যুক্তি, ইহার পর সার্ব্বভৌমের আর কি বলিবার আছে?

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।' এই উক্তি মহাপ্রভুর বিজয়ানন্দের অভিব্যক্তি মাত্র। ত্রিভুবন না হউক—সার্ব্বভৌম-বিজয়েই মহাপ্রভুর অর্দ্ধেক উড়িষ্যা জয় হইয়া গেল। উড়িষ্যার আর কোন ভক্তকে চতুর্ভুজ দেখাইতে হইল না—সার্ব্ব ভৌমের 'ঐছে গতি' দেখিয়াই সকলেই বুঝিল, শ্রীচৈতন্য ভগবান ছাড়া অন্য কেহ নহেন।

বৃন্দাবনদাসের সার্ব্বভৌম তরুণ ভক্তের সন্ন্যাসগ্রহণের নিন্দা করিয়াছেন—কৃষ্ণদাসের সার্ব্বভৌম তাহা করেন নাই। কিন্তু চৈতন্য নিজেও সন্ন্যাসগ্রহণে খুব উৎসাহ দিতেন না। সাময়িক উত্তেজনায় ও আকস্মিক ভাবাবিষ্টতায় যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিত, অথবা তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিত তাহাদের নিষেধ করিয়া বলিতেন—

ঐছে বাত কভু না কহিবা। গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥

মহাপ্রভু শ্মশান-বৈরাগ্য ও মর্কটবৈরাগ্য দুইএরই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন তাহার চেয়ে অনাসক্ত ভাবে গৃহধর্ম্ম পালন ঢের ভালো। তবে যে ব্যক্তি সত্য সত্যই সংসারবন্ধন কাটাইয়াছে—কঠোর পরীক্ষার পর তাহাকে গৈরিক ধারণে তিনি আদেশ দিতেন।

মহাপ্রভু প্রথমবৎসরে রথের সময়—কুরুক্ষেত্রে মিলন হইল বলিয়া 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ'—ইত্যাদি শ্লোকটি

আবৃত্তি করেন। ইহাতে দুইটি তত্ত্বের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের মহাভাব ঐশ্বর্য্যবিমুখ, মাধুর্য্যনিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় বিলাসে তাঁহার চিত্ত স্বস্তি পায় না—ব্রজের মাধুর্য্যময় লীলানন্দের জন্য তাহা ব্যাকুল। 'রেবারোধসি বেতসী বনের' দ্বারা তিনি বৃন্দাবনকেই মনে করিয়াছেন। তাই জগন্নাথের বিরাট মন্দিরে গরুড়স্তম্ভের তলে দাঁড়াইয়া 'হাহা কাঁহা বৃন্দাবন কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন কাঁহা সেই বংশীবদন' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন।

আর একটি কথা,—'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি প্রাকৃত প্রেমেরই শ্লোক। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ তাঁহার কাছে অপ্রাকৃত প্রেমের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের মণিদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বহু প্রাকৃত বস্তুই এইরূপ লোকোত্তর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করিত।

মহাপ্রভু দক্ষিণাপথভ্রমণে গেলেন, ভক্তদের আবেদননিবেদন শুনিলেন না। কুসুমমৃদু চিত্ত এবিষয়ে বজ্রাদপি কঠোর। কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না, পথে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন মহামনুষ্যতার পরম দৃষ্টান্ত, তাহার ব্যাধিমোচন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব।

দক্ষিণাপথভ্রমণের বর্ণনায় তর্কে বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয়ের কথাই বেশি বেশি, "সর্ব্বমত দূষি দূষি করে খণ্ড খণ্ড।" কবিরাজ বলিয়াছেন সমগ্র দেশকে প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। দক্ষিণাপথে ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল—তাহাই বুঝিতে হইবে।

তারপর বৌদ্ধবিজয়ের কথা। বৌদ্ধাচার্য্য কেবল পরাজিত হইল না—পক্ষিমুখভ্রষ্ট থালার কিনারে তাহার মাথা কাটিয়া গেল এবং সে হতচেতন হইল। কবিরাজকল্পিত অলৌকিকতার ইহা একটি দৃষ্টান্ত। এই সকল তুচ্ছ বর্ণনার চেয়ে

অনেক চমৎকার গীতাপাঠকের কথা। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ 'গীতাপাঠ করে প্রতিদিন।' তাহার ভুল উচ্চারণ ও অশুদ্ধপাঠ শুনিয়া মহাপ্রভু বিস্মিত হইলেন, বুঝিলেন,—লোকটি গীতার কোন অর্থই বুঝে না, রীতিমত মূর্খ, কিন্তু যত ক্ষণ পড়ে, ততক্ষণ তাহার দেহে সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখা যায়। মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়'?

মূর্খ ব্রাহ্মণের উত্তর চমৎকার—

বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হ'য়ে রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাব তাঁর দরশন
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥

বলা বাহুল্য, প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন,—গীতাপাঠে তোমারি সব চেয়ে বেশি অধিকার।

বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে প্রভুর যে আলোচনা হয়, সে আলোচনার কথা কবিরাজ কি করিয়া জানিলেন—তাহা বলেন নাই। চরিতামৃত ইতিহাস নয়, সে জন্য কবিরাজের সে কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। নবদ্বীপে বা পুরীধামে প্রভুর মুখের কথাগুলির জন্য কবিরাজের কোন বিশিষ্ট বার্ত্তাবহের নামোল্লেখের প্রয়োজনই হয় নাই। কারণ, বহু ভক্তই সে কথা শুনিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর বিচারে কবিরাজ গোস্বামীর

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করয় নিশ্চয়॥ অর্থাৎ মাধ্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ ভক্তির বিরুদ্ধ হইলেও এক বিষয়ে মহাপ্রভুর মতের সহিত ইহার মিল আছে। ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহস্বরূপস্বীকার বিষয়ে দ্বৈত এই সম্প্রদায় অগ্রগামী। কেবল এই বিষয়ে মিল থাকার জন্য অনেকে মহাপ্রভুকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক মনে করেন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথভ্রমণের বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী যে সব তীর্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন—বর্ত্তমান সময়ে সে গুলির অধিকাংশই নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং তীর্থগৌরবও হারাইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী পরিক্রমার ক্রম রক্ষা করিতে পারেন নাই তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। স্থানগুলির নামও তাঁহার লোকমুখে শোনা। বোধ হয় কালা কৃষ্ণদাসের মুখে ভক্তগণ শুনিয়াছিলেন।

কোন গ্রন্থ মহাপ্রভুর শ্রোতব্য, তাহা স্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট কোন গ্রন্থ চৈতন্যদেবকে শোনাইতেন না। কবিরাজ গোস্বামী দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের নাম করিয়াছেন। এইখানে আমাদের খট্‌কা বাধে—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনকে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের—এমন কি গীতগোবিন্দের কোন কোন অংশ বাদ না দিলে ঐ দুই গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল হইতে পারে কি? ঐ দুই গ্রন্থের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না।

প্রভু সনাতনের গায়ের ভোটকম্বলের পানে ঘন ঘন চাহিয়াছিলেন—তাহাই ছিল সনাতনের শেষ রাজসিক চিহ্ন। ব্রহ্মানন্দের চর্ম্মাম্বর পানেও তিনি ঘন ঘন চাহিয়াছেন—ইহাকে প্রভু ব্রহ্মানন্দের

শেষ তামসিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। চর্ম্মাম্বরপরিধানের মূলে সন্ন্যাসের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন—'চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি। চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি'। কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারাও শ্রীচৈতন্য এইভাবে শিক্ষা দিতেন।

গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে কর্ম্মের স্থান নাই. খেলারই স্থান আছে। প্রেমের সঙ্গে খেলারই সুসঙ্গতি আছে। নাগরগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তগণের সঙ্গে খেলা করিয়াছেন—সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গও পুরীধামে খেলা একেবারে ত্যাগ করেন নাই। গুণ্ডিচাবাড়ী-মার্জ্জনকে কর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে,—কিন্তু ইহাও খেলা ছাড়া কিছু নয়।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা। ধোয়াপাখলা নাম কৈল এক লীলা॥

কবিরাজ গোস্বামী এই খেলার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

গৌড়িয়াগণ নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে মহাপ্রভুর বাল্য কৈশোরের ক্রীড়াচঞ্চল জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া শিশুর মত চপল হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলেই গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জ্জন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও নরেন্দ্র সরোবরে জলখেলা, উদ্যানলীলা, রথাগ্রে প্রমত্ততার খেলা, ভোজনলীলা ইত্যাদির বর্ণনা আসিয়াছে। কোন ধর্ম্মগুরুর জীবনে এইরূপ ক্রীড়াচাপল্যের স্থান নাই। ইহার কারণ, এই ভাবে প্রেমধর্ম্ম প্রচার আর কেহ করেন নাই। তাঁহাদের কেহই লীলাবতারও নহেন।

এই সকল কারণেই চৈতন্যদেবকে কর্ম্মাবতার না বলিয়া লীলাবতার বলিতে হয়। কোন অভিপ্রায়সিদ্ধি উদ্দিষ্ট হইলে এইরূপ বালসুলভসারল্যমণ্ডিত ক্রীড়াচাপল্যের এত প্রাধান্য থাকিত না! গৌড়িয়াদের সংসর্গে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার পুনরাবৃত্তির বর্ণনা করিয়াছেন কবিরাজ গোস্বামী।

রথযাত্রায় জগন্নাথদেব বিরাট শ্রীমন্দির ত্যাগ করিয়া গুণ্ডিচাবাড়ীতে আগমন করেন—ইহাতে মহাপ্রভুর মনে পড়িয়াছে মথুরার হেমসিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন—ইহাতে মহাপ্রভুর অন্তরে ব্রজ-ভাবের উন্মাদনা হইয়াছে। আট দিন ধরিয়া এই ব্রজভাব মহাপ্রভুকে ক্রীড়া-চপল করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিবিধ নায়িকার লক্ষণ, নায়িকাদের প্রেমলীলা, বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার মানাদি-লীলার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন; কবি এই ব্যাখ্যা, স্বরূপদামোদরের মুখে বসাইয়াছেন। বর্ণনায় মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে ঐরূপ লীলা প্রকট করিলেও ইহার ব্যাখ্যা বিশেষ করিয়া কিলকিঞ্চিত ভাবের ও বিবিধ ভাববিভূষণের ব্যাখ্যান শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

স্বরূপগোস্বামী বৃন্দাবনেরও একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু। দ্বারকা বৈকুণ্ঠে সম্পদ তার একবিন্দু॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক এই বন। ফল ফুল বিনা কেহ না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে। দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে॥

এই যে বৃন্দাবন ইহা জগৎ ব্যাপিয়াই মানবমনে বিরাজ করিতেছে। তাই কবিগুরু বলিয়াছেন, "আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।" আসল ব্রজবাসী সেই কল্পবৃক্ষ পাইয়াও তাহার কাছে ফলফুল ছাড়া কিছু চায় না। কামধেনু সুরভি-নন্দিনীর প্রসাদ লাভ করিয়াও তাহার কাছে দুগ্ধ ছাড়া আর কিছু চায় না। এই যে সাহজিক ভাববৃন্দাবন, সেখানেই চিরমধুময় ভগবান বিহার করেন। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক নাই। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের পরম বৈরী। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না মানে ইহোঁ শুদ্ধপ্রেমে ভাসি।

স্বরূপ বৃন্দাবনে বাস করিলে সপ্তম গোস্বামী হইতেন। পুরীধামে স্বরূপই হইলেন গোস্বামীদের প্রতিনিধি। আদিলীলায় দেখানো হইয়াছে, দীনাতিদীন শুক্লাম্বর ও শ্রীধর অতি সহজে অযাচিত ভাবে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছেন। আর মধ্যলীলায় দেখানো হইয়াছে রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও অতি ক্লেশে বহু সাধ্যসাধন করিয়া তবে কৃপালাভ করিলেন। ভক্তিতত্ত্বের অতি গূঢ়বাণী ইহার মধ্যে নিহিত আছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চরিতামৃতে গৌড়িয়া ভক্তদের বিদায়-দৃশ্যটি বড়ই করুণ। শ্রীবাসের হাতে শচীমাতার জন্য বস্ত্র ও প্রসাদ দিয়া মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভক্তের চিত্তকেও আলোড়িত করে—

তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করেছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি, বাতুলের কর্ম্ম॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥

মহাপ্রভুর পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম যেমন সত্য এবং স্বাভাবিক, জননীর জন্য এই আকুলতা তেমনি সত্য। গৌরনাগরবাদী ভক্তেরা মহাপ্রভুর এই বাক্যগুলির মধ্যে নিজেদের ভাবাদর্শের সমর্থন পান।

মহাপ্রভু নিজ জননীর বাৎসল্যের একটি চিত্র এখানে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এ চিত্র বড়ই করুণ, একদিন—

শাল্যন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপচার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন। নিমাইএর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥

গৌরসাহিত্যে এই চিত্রের তুলনা নাই। মহাপারাবারতীরে সন্ন্যাস লইয়াও গৌরচন্দ্র তাঁহার জন্মক্ষেত্রের সেই স্নেহপারাবারকে ভুলেন নাই বলিয়াই তিনি আমাদের এত আপনার জন।

কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসের একটি চিত্রলীলা বিবৃত করিয়াছেন। বিষয়টা অকিঞ্চিৎকর। ভক্ত সার্ব্বভৌমের মনস্কামনা পূরণ করিবার জন্য মহাপ্রভু অতিভোজন করিয়াছিলেন। অমোঘ তরুণবয়স্ক, সে বলে,—এ সন্ন্যাসী দেখিতেছি ১০।১২ জনের খাদ্য একা খায়। অমোঘের এই নিন্দনের অপরাধে তাহার বিসূচিকা হয়। প্রভুর কৃপায় সে বাঁচিয়া যায় এবং কৃষ্ণভক্ত হয়। শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যবর্ণনার জন্যই এই চিত্রলীলা বিবৃত হইয়াছে।

মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন ভক্তগণ সঙ্গে যাইতে না পাইয়া যে আর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মস্পর্শী। মহাপ্রভুর গৌড়পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী সংক্ষেপে বলিয়াছেন। 'বাদিয়ার বাজি পাতি' সৈন্য সঙ্গে ঢাক বাজাইয়া লোকসংঘট্ট সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা অনুচিত মনে করিয়া তিনি সে যাত্রায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এযাত্রায় তাঁহার তিনজন মহাভক্তের সঙ্গে পরিচয়। রামকেলিতে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে এবং শান্তিপুরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে। তিনি বুঝিলেন, রূপসনাতনের সংসার ত্যাগের সময় হইয়াছে। নবলক্ষপতির সন্তান তরুণ রঘুনাথের সময় এখনো হয় নাই। তাঁহাকে যে উপদেশ তিনি দিয়াছিলেন—তাহা যুগে যুগে পরম সত্য।

স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥

মহাপ্রভুর উপদেশ পালন করিয়া রঘুনাথ অচিরাৎই উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই যাত্রা ব্যর্থ হয় নাই, যে তিনজন মহাপুরুষকে তিনি উদ্ধার করিলেন—তাঁহাদের বাদ দিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার সম্পূর্ণাঙ্গ হইত না।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বনপথে একাকী বৃন্দাবন গমনের বর্ণনা দিয়াছেন। পথে এবং বৃন্দাবনে ইতরপ্রাণীদের যে প্রেমাবেশের এবং মানবীয় ভাষায় কৃষ্ণনামগানের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে কাব্যালঙ্কারের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। বৃন্দাবন এখনো পুনরুদ্ধৃত হয় নাই। মহাপ্রভুই বৃন্দাবনের উদ্ধার করিলেন। বৃন্দাবনে মহাপ্রভু অনবরত ভাবাবেশে অপ্রকৃতিস্থ হইতেন। যমুনা দেখিলেই ঝাঁপ দিতেন। লোকসংঘট্টের বিরাম ছিল না। সেজন্য সঙ্গী বলদেব ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে তাড়াতাড়ি প্রয়াগে লইয়া গেলেন। প্রয়াগের পথে যবনোদ্ধারের কাহিনী আছে—ভাগ্যে পরবর্ত্তী যবনরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের খোঁজ রাখিত না। নতুবা যবনোদ্ধারের কাহিনী আমরা জানিতেও পারিতাম না। প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীরূপকে পাইলেন। রূপে শক্তি সঞ্চার করিয়া তিনি—

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল। সব তত্ত্বনিরূপণে প্রবীণ করিল॥

বৈষ্ণবরসতত্ত্বের গূঢ়মর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে, রামানন্দ রায় ইহার প্রবক্তা—রূপই ইহার ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। কালপ্রভাবে বৃন্দাবনকেলিকথা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে পুনঃপ্রকাশের জন্য শ্রীচৈতন্য রূপকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। রূপও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন বৃন্দাবনে আশ্রয়লাভ করার পর—বৃন্দাবন মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

রূপ তাঁহার গ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণবতত্ত্বের যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন তাহা তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ হইতেই পাইয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে ঐ তত্ত্বকে চৈতন্যের মুখ দিয়াই প্রয়াগেই বিবৃত করাইয়াছেন। এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই সাধ্যসাধনতত্ত্ব-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহাভাবের ক্রমোন্মেষ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাদিশ্রবণ, নামকীর্ত্তন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার হইতে যে ভক্তির উদয় হয়—তাহাই সাধন ভক্তি (বৈধী ও রাগানুগা)। ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। ইহার দ্বারা চিত্তের মসৃণতা সম্পাদিত হয়। তারপর চিত্ত যখন আর্দ্র হয় ও মমতাময় হয়, তখন ঐ রতি প্রেমে পরিণত হয়। প্রেম গাঢ় হইলে তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ জন্মিলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। স্নেহ গাঢ় হইলে মানের জন্ম হয় অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি মান করিবার অধিকার অনুভূত হয়। মানে বামতা বা বক্রতা দেখাইয়া অন্তরের দাক্ষিণ্যে অননুভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যের

আস্বাদ লাভ হয়। মানের পর প্রিয়তমের সহিত অভেদবুদ্ধি জন্মিলে মান প্রণয়ে পরিণত হয়। প্রণয় রাগে পরিণত হয় তখনই, যখন প্রিয়সঙ্গে গভীর দুঃখকেও সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। এই রাগ অনুরাগে পরিণত হয়, যখন প্রিয়তম নিতুই নব (নবনবায়মান , রূপে উপলব্ধ হয়। ইহা হইতে ভাবের গাঢ়তা উৎপন্ন হয়—এই ভাব বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য। ইহা ব্রজগোপীগণের সংবেদ্য। ভাবের চরম পরিণতি মহাভাব। ইহা কেবল শ্রীরাধিকার সংবেদ্য। কবিরাজ গোস্বামী এই কৃষ্ণরতির ক্রমোন্মেষ দেখাইয়াছেন—ইক্ষুরসের ক্রম-পরিণতির উপমায়।

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার। শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর। (বীজ-ইক্ষু-ইক্ষুরস-গুড়-খাঁড়-গুড়—দলুয়া-চিনি-মিছরি-তারপর উত্তম মিছরির সহিত উপমিত মহাভাব)।

অলঙ্কারশাস্ত্র যে ভাবে স্থায়ী ভাব হইতে রসনিষ্পত্তি দেখাইয়াছে—ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রসনিষ্পত্তির মত কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্মস্বাদ-রসেরও নিষ্পত্তি দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে রতিই স্থায়ী ভাব—ইহাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিভাব অনুভাব সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে ক্রমে ব্রহ্মস্বাদ বা মহাভাবে পরিণত হয়। ইহাই তাঁহার বক্তব্য।

ভক্তভেদে শ্রীকৃষ্ণরতিকে তিনি পঞ্চপ্রকার বলিয়াছেন। এই পঞ্চ প্রকারের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর রতি। বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিলে ভক্ত যখন আত্মানন্দে বিভোর হয়, তখন শমভাবের উৎপত্তি হয়। এই শমপ্রধান ভক্তের সংসারাসক্তি-রহিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মজ্ঞানজনিত রতিই শান্তরতি; মুক্তিলাভের জন্য সনকাদি মুনিগণ এই ভাবের উপাসক। এইভাবে ভক্তদের কাছে

ভগবান চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে প্রতীত হইতে পারেন। এই শ্রেণীর ভক্তেরা তপোবন বা কোন নির্জন স্থানে সাধন ভজন করেন।

দাস্যরতিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া ভক্ত নিজেকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া স্বকীয়তার অভিমান ত্যাগ করিয়া দাসের মত সেবাপরায়ণ হয়। এই ভক্তি জন্মিলে ভক্ত ভগবানের মহিমা ও গুণ কীর্ত্তন করে, ভক্তগণের সঙ্গ যাচ্ঞা করে; ভক্তগণের সেবা করে, মন্দিরে মূর্ত্তিবিগ্রহের পরিচর্য্যা করে, যাহা কিছু আহার করে তাহা ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া প্রসাদরূপে ভোজন করে। স্তবস্তুতির দ্বারা হৃদয়ের আকূতি প্রকাশ করে। সখ্যভাবে ভক্ত নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ ভাবিয়া তাঁহাকে ক্রীড়াসঙ্গী মনে করে। ভগবান সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচবোধ থাকে না—তাঁহার সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান একেবারেই থাকে না। ব্রজরাখালদের এইভাব।

ভগবান সম্বন্ধে শিশুসন্তানের প্রতি মাতাপিতার মত অনুকম্পা, অনুগ্রহ ও লালনাদির ভাব-ই বাৎসল্যভাব। মাতৃহৃদয় বা পিতৃ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও স্নেহবিগলিত ভাবই এই ভজনের অঙ্গীভূত।

শৃঙ্গার বা আদিরস সৃষ্টির যে স্থায়ী ভাব—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মধুর রতি। এই মধুর রতির ক্রমোন্মেষই আগে দেখানো হইয়াছে। ইহাই ব্রজগোপীদের ভাব। এই ভাবসাধনাশিক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব রূপাদির মতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণে পঞ্চবিধ রতি আবার দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা আর কেবলা। 'গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।' শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী-বসুদেবের চরণ বন্দনা করিলেন, তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ভীতিভাব জন্মিল—কিন্তু গোকুলে নন্দ অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে নিজের বাধা (পাদুকা) শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিতে দিয়াছিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের

মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়াও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন নাই। রজ্জুদ্বারা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে কম্পমান হইয়া পূর্ব্বের নিঃসঙ্কোচ সখ্য-ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজে শ্রীদামাদি সখারা শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি ও বিভূতিপ্রকাশ দেখিয়াও সমকক্ষ সখাই ভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেও তাহাদের কুণ্ঠা বোধ হয় নাই।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে একবার পরিহাস করায় ভয়ে দেবী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—ব্রজে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের পরিহাসের উত্তরে তীব্রতর পরিহাস করিতে এমন কি তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই!

এই সব কথা মহাপ্রভু নবদ্বীপে বলেন নাই, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের আগে পুরীধামে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে এমন কি স্বরূপ দামোদর বা সার্ব্বভৌমের কাছেও বলেন নাই। রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাতেই এ তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে মহাপ্রভু রূপকে বিস্তৃতভাবে এসব কথা বলিলেন—তাই আজ আমরা ঐ তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। রূপের লেখনীতেই ইহা অপূর্ব্ব সাহিত্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী রূপের মুখে এবং তাঁহার গ্রন্থে যাহা জানিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

"অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিব।"

প্রয়াগে মহাপ্রভুর প্রধান কার্য্য শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার, কাশীধামে প্রধান কার্য্য সনাতনে শক্তিসঞ্চার। রূপকে মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভক্তি তত্ত্বের, শ্রীরূপের হৃদয়ে মধুররসের উদ্বোধনের জন্য। সনাতনকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শাস্ত্রনিবদ্ধ জ্ঞানের—যেন শান্তরস উদ্বোধনের জন্য। ইহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান ও

অবতারবাদের কথাই বেশি। বক্তব্যের সমর্থনের জন্য অজস্র শাস্ত্রোক্ত শ্লোকের অবতারণা আছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী সূত্রাকারে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, বিশদ ব্যাখ্যার অবসর পান নাই ; অনেক স্থলে কেবল তালিকা ও তাহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের সে স্বচ্ছতা, সরলতা, মাধুর্য্য তাহা এই উপদেশে নাই। ইহাতে আছে আপ্তবাক্যমূলক চুলচেরা তত্ত্ববিশ্লেষণ ও বিচার। এই তত্ত্ব সাধ্যসাধনতত্ত্বের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুক্তিমূলক ক্রম অনুসরণ করে না— আবেগাত্মক ক্রমও ইহাতে নাই।

মহাপ্রভু প্রকারান্তরে নিজেকেই অবতার প্রতিপন্ন করিলেন, কিন্তু সনাতন যখন বলিলেন—'সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়।' তখন— 'প্রভু কহে চতুরালি জান সনাতন।' আর কিছু বলিলেন না।

সনাতনের প্রতি উপদেশ শাস্ত্রজ্ঞ চৈতন্যের ধর্ম্মব্যাখ্যা। অনবরত বহু গ্রন্থ হইতে শ্লোক তুলিয়া ধর্ম্মশিক্ষাদান চৈতন্যের স্বধর্ম্ম নয়। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রন্থে তাঁহাদের বক্তব্য কোন মহাপুরুষের বা অবতারের মুখ দিয়া বলাইতেন। তাহাতে বক্তব্য বহুগুণে শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয় হইয়া উঠিত। কবিরাজ গোস্বামী ব্রজের গোস্বামীদের কাছে যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া রূপসনাতনের কাছে যাহা শিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদেরই উদ্দেশে মহাপ্রভুর মুখে বসাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে পরম ভাগবতলক্ষণ ও মহাভাবাবেশ প্রকট করিয়া বহু ভক্তিহীনের অন্তরেও রাগানুগা ভক্তির উদ্রেক করিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যবিভূতিপ্রকাশের দ্বারাও দাস্যভক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে ভাবে বৈধী ভক্তির উদ্রেক করিতে

হয়, সেই ভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহার মহিমা, তাঁহার রূপমাধুর্য্য ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন। ভক্তি ছাড়া—কোন গতি নাই, 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'। যত বড় জ্ঞানী হউক, অষ্ট সিদ্ধি অধিগত হইলেও, ভক্তি না থাকিলে কিছুতেই যে তাহার মুক্তি নাই, এ সকল কথা না জানিলে সনাতন বিপুল মানবৈভব ত্যাগ করিয়া পথের ফকির হইতেন না। অতএব এ সমস্ত উপদেশ সনাতনের জন্য নয়, সনাতন উপলক্ষ মাত্র, ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য। এই সকল উপদেশের মধ্যে—গ্রন্থসর্ব্বস্ব পণ্ডিতদের জন্য একটি চরণ আছে—

বহুশাস্ত্র কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।

আর দুটি চরণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ঔদার্য্যজ্ঞাপক—

অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে!
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।

মহাপ্রভু বৈধীভক্তির সাধনপ্রক্রিয়ার কথা বলিয়া শেষে রাগানুগা ভক্তির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে ভাগবত, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে অজস্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রকারান্তরে বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অশাস্ত্রীয় কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থে থাকা এবং তাহার ব্যাখ্যাবিবৃতি এক কথা আর তদনুসারে আদর্শ ভক্তের জীবনযাপন অন্য কথা। তিনি ছাড়া নিজ জীবনে চরম তত্ত্ব উপলব্ধি ও আচরণের দ্বারা তাহার চরম সার্থকতা দান করিয়াছেন, তাই তাঁহার মুখে তত্ত্ববিবৃতির মূল্য অসামান্য। শ্রীচৈতন্য নিজে ভক্তিমার্গের চরম স্থানে পৌঁছিয়া সনাতনকে আদর্শ ভক্তের মত জীবনযাপন করিতে এবং তদ্দ্বারা 'কালানষ্ট' ভক্তিধর্ম্মকে পুনরুদ্বোধিত করিতেই বলিয়াছেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ।

শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে ভাগবতের এই শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিয়া সার্ব্বভৌমকে চমকিত করিয়াছিলেন। সনাতন সেই ব্যাখ্যাগুলি শুনিতে চাহিলেন। কবিরাজ গোস্বামী এই ব্যাখ্যাগুলি অতিসংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। এই ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাকরণ ও অভিধানের পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তিতত্ত্বের দিক হইতে ইহার মূল্য সামান্যই। এ পাণ্ডিত্য নিমাইপণ্ডিতের টোলেরই উপযুক্ত! একদিন নিমাই এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের চমকিত ও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে পাণ্ডিত্যকে নিতান্ত বহিরঙ্গ জ্ঞানে মহাপ্রভু বর্জন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী কেন যে এখানে তাহার অবতারণা করিলেন বুঝা যায় না! সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে ও বিচারপ্রসঙ্গে বরং ইহার স্থান ছিল।

সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সূচিপত্রও কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মুখে বসাইয়াছেন। ইহাও শ্রীচৈতন্যের ভাববিহ্বল জীবনের পক্ষে সুসমঞ্জস নয়। তবে স্থানটা পুরী বা বৃন্দাবন নয়, কাশীধাম। স্থানমাহাত্ম্যে এখানে তথাকথিত প্রকৃতিস্থতা ফিরিতেও পারে।

সনাতন পুরীধামে গেলে প্রভু প্রত্যহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। সনাতনের গায়ে ছিল কণ্ডুরসা। সেই কণ্ডুরসার রস তাঁহার চন্দনাক্ত অঙ্গে লাগিত। ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যের অঙ্গে এমন অপূর্ব্ব ভূষা বিলেপন কোন কবি কল্পনা করিতে পারেন নাই। সনাতন এজন্য কুণ্ঠিত ও দুঃখিত হইয়া মনে মনে প্রাণত্যাগের সংকল্প করিতেন। মহাপ্রভু

জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যে কথা বলেন—সনাতনের সুদীর্ঘজীবনে তাহাই ব্রত হইয়াছিল।

তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের ভৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবাপ্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাই করিতে প্রচলন॥

এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—"আমি মাতৃ-আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি। আমি নিজে বৃন্দাবনে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিতেছি না। আমার কাজ তোমাকেই করিতে হইবে অর্থাৎ তোমার দেহেতেই আমাকে সে কাজ করিতে হইবে।"

রূপ পুরীধামে গেলে মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আগেই তাঁহার ব্রতভার লাভ করিয়াছিলেন।

ছোট হরিদাসের বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃত ভাবেই দিয়াছেন। ভগবান আচার্য্যের আদেশে হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্য শিখি মাহাতীর ভগিনী বৃদ্ধা মাধবী মাহাতীর কাছ হইতে একসের মিহি চাউল আনিয়াছিলেন। এই মাহাতী নারীগণের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভক্তিমতী ছিলেন। মহাপ্রভু রাধিকার গণের গণনায় সাড়ে তিনজনের মধ্যে ইঁহাকে অর্দ্ধজন (স্ত্রীলোক বলিয়া) মনে করিতেন।

আহারকালে এই চাউলের অন্নের খুব সুখ্যাতি করিয়া কোথা হইতে পাওয়া গেল মহাপ্রভু তাঁহার খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন —হরিদাস এই চাউলসংগ্রহের জন্য একজন নারীর (মাধবীর) সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। এই অপরাধে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ভক্তেরা সকলে মিলিয়া হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য সাধা সাধনা করিয়াছিলেন, কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেব বিচলিত হ'ন নাই। একটি বৎসর ধরিয়া হরিদাস দূর হইতে প্রভুকে দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেন। শেষে হরিদাস প্রয়াগে গিয়া শোকে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করেন। চরিতকার বলিয়াছেন—'লোকশিক্ষার জন্য বিশেষতঃ ভক্তগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্ষমার অবতার হইয়াও মহাপ্রভু এই দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন।'

পক্ষান্তরে, রায় রামানন্দ তরুণী দেবদাসীদের স্বহস্তে অঙ্গসেবা করেন, তাহাদের স্নান করান, বস্ত্র পরান এবং তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন;—একথা প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—'রামানন্দ ইন্দ্রিয়জয়ী, নির্বিকার মহাপুরুষ। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠপাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্বিকারমন॥
এক-রামানন্দের রয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত শরীর তাঁহার॥
অথচ— আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম নাহি শুনি॥
তবহু বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতিদর্শনে স্থির রয় কোন জন॥

এই বলিয়া তিনি প্রদ্যুম্নকে তাঁহার কাছেই কৃষ্ণকথা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিবার জন্য পাঠাইলেন। কারণ, বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীকেও উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। মহাপ্রভুর লীলারহস্য তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও সব সময়ে বুঝিতে পারিতেন না।

ভক্তগণ পাছে দুঃখ পায়, সেই ভয়ে শাকপ্রিয় শ্রীচৈতন্যদেব অনেক সময় গুরু ভোজন করিতেন। ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরী ইহা লইয়া নিন্দা করিতে থাকে—তাহাতে মহাপ্রভু কিছুকাল অর্দ্ধাশনে ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, তিনি লোকাপেক্ষা মানিয়া চলিতেন—এইকথা বলিবার জন্যই কবিরাজ গোস্বামী কেবল রামচন্দ্র-পুরীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী বড় হরিদাস ও আপন গুরু রঘুনাথের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনাথ বাংলার বুদ্ধদেব। রঘুনাথের ত্যাগ ও তপস্যার তুলনা নাই।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন নিত্যানন্দ লাথি মারিয়া বৌদ্ধবিজয় করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী পুরীপথে গৌড়িয়াদের বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শিবানন্দ সেন প্রতিবৎসর সকলকে যত্ন করিয়া নীলাচলে লইয়া আসিতেন, পথের ব্যয়ও তিনি নির্ব্বাহ করিতেন। একবার পুরীর পথে আসিবার সময় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে শিবানন্দের বিলম্ব হইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিত্যানন্দ শিবানন্দকে লাথি মারেন এবং অভিশাপ দেন 'তোর তিন পুত্রের মৃত্যু হউক'। বলা বাহুল্য, লাথি খাইয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবানন্দের মহত্ত্ব ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। শিবানন্দই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে লাথি মারিবারও অধিকার দিয়াছিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় এই গূঢ়তথ্য বুঝিতে পারেন নাই।

ইহাতে বাহ্যজ্ঞানহীন নিত্যানন্দের চরিত্রেরও একটা দিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

ক্রমে মহাপ্রভুর বাহ্যদশায় অবস্থিতির কাল কমিয়া আসিল। অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদের অবস্থা চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রাখার প্রয়োজন হইল। এই অবস্থায় জগন্নাথ দর্শনের কালে এক উড়িয়া রমণী গরুড়স্তম্ভে চড়িয়া তাঁহার কাঁধে পা রাখিয়া তন্ময় হইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছিল। তাহাতে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিলে প্রভু বলিলেন—'এত আর্ত্তি জগন্নাথ-আমারে না দিলা।' বাহ্যদশায় কোন নারীর সঙ্গে প্রভু সম্ভাষণ করিতেন না—দিব্যোন্মাদ অবস্থায় তাঁহার এ জ্ঞান ছিল না।

দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা চলিতে থাকে। এই অবস্থায় একদিন যমুনা ভ্রমে রাত্রিকালে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, এক জালিয়া তাঁহাকে বাঁচায়। পুনরায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া অসম্ভব নয়। যাহাই হউক কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর তিরোধানের কথা লিখিতে পারেন নাই, ইহা এতই শোকাবহ যে ভক্ত কবি ইহার ইঙ্গিতও করেন নাই। হরিদাসের মত মহাপ্রভুর তিরোধানের (প্রাকৃত দেহাবসানের) বর্ণনা শ্রীচরিতামৃত কাব্যের পক্ষে সুসমঞ্জসও হইত না। কেহ বলে বারিব্রহ্মে, কেহ বলে দারুব্রহ্মে, আমরা বলি কালব্রহ্মে বিলীন হইয়াছেন, তাই তাঁহার তিরোধান দিবসটি পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হয় না।

ভাগবত-সাহিত্য

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের ভাবানুবাদ। ইহার কবি মালাধর বসু। * গৌড়ের সুলতান ইঁহাকে গুণরাজ খাঁন উপাধি দেন। ইঁহার নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার কুলীন-গ্রাম। মালাধর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু কাল আগেই আবির্ভূত হ'ন। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খাঁন ও পৌত্র পদকর্ত্তা রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত অনুচর ছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রসাস্বাদ করিতেন একথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। তিনি সমগ্র গ্রন্থে "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" এই অমূল্য চরণটি পাইয়াছিলেন। এই একবাক্যেই তিনি মালাধরের বংশের হাতে বিক্রীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বাংলায় সর্ব্বপ্রথম ভাগবতসাহিত্য। ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নয় বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত-বর্ণনাচ্ছলে মহিমা কীর্ত্তন। মঙ্গলকাব্যের মত ইহা গ্রামে গ্রামে গীত হইত। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মপ্রচারের আগে আমাদের রাঢ় অঞ্চলের মানসক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবির

---

* ইনি প্রধানতঃ দশম স্কন্ধকেই উপজীব্য করিয়াছেন, প্রয়োজনমত অন্যান্য স্কন্ধ হইতে বিশেষ করিয়া একাদশ স্কন্ধ হইতে অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণজন্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণ হইতে এবং গীতাদি শাস্ত্র হইতেও মাঝে মাঝে বিষয় বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন।

নিজস্ব বহু কথা সমাবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের দেশে বৈষ্ণবতার কি রূপ ছিল তাহা অনেকটা বুঝা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবত রসকল্পতরু—ইহা হইতে ভক্ত যে রস চাহিয়াছেন সেই রসই পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও সর্ব্বরসের আশ্রয়। একাধারে তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। তিনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিয়া বৃন্দাবনের গোপগোপীদের মাঝে বেণু বাজাইয়া ধেনুর রাখালী করিয়াছেন, গোপবধূদের প্রেমে আত্মহারা করিয়াছেন। আবার তিনিই মথুরা-কুরুক্ষেত্র-দ্বারকায় বীরধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। জয়দেব হইতে বাঙ্গালাদেশের পদকর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের দিক্‌টাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার রাখালী ভাবও তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে—বিশেষ করিয়া গোপবধূর সঙ্গে প্রেমলীলার মধ্যে তাঁহারা মাধুর্য্যের চরমস্বরূপ লাভ করিয়া তাহাকেই বহুপদে বাণীরূপ দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের দিক হইতেই আবিষ্ট হইয়া শান্ত ও দাস্যভাবের সাধনাকে বিশেষ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে বৃন্দাবনলীলা যে স্থান পায় নাই তাহা নহে, কিন্তু তিনি ইহাকে প্রাধান্য দেন নাই। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যই প্রবল হইয়াছে।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার উদ্দেশ্য ছিল কৃত্তিবাস কাশীরামের মত লোকশিক্ষাপ্রচার। তাঁহার গ্রন্থ গ্রামে গ্রামে গীত হইবে এই অভিপ্রায়েই রচিত। ভাগবত অতি দুরূহ গ্রন্থ—ভাগবতের ভাষা সহজ সংস্কৃত নয়। কাজেই অতি কম লোকেই ইহার আস্বাদের সৌভাগ্য লাভ করিত। মালাধর সর্ব্বসাধারণের জন্য কৃত্তিবাসের মত মূল গ্রন্থের

সহজবোধ্য অংশকেই ভাষারূপ দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মত তিনি কাব্যকে চিত্তাকর্ষক এবং লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ভাগবতের বহির্ভূত অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। সব চেয়ে বড় কথা বোধহয় সাধারণ লোক মধুর রসের, এমনকি সখ্যরসের সাধনার কথাও ভাল বুঝিবে না বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের ও বলবীর্য্যপরাক্রমের কথাই ফলাও করিয়া বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের নিষ্কর্ষ, সে জন্য ইহাতে বহু দুরূহ দুরধিগম্য তত্ত্বকথা শুকাদির মুখে প্রোক্ত হইয়াছে। মালাধর সে সব তত্ত্বকথা বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার রচনায়। বলা বাহুল্য, সেইসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের রসাঢ্য কবিত্বময় অংশগুলিও বাদ গিয়াছে!

বাংলাদেশে যেরূপ ধর্ম্ম ঠাকুর ও চণ্ডী মনসার প্রভাব প্রতিপত্তি চলিতেছিল, বৌদ্ধপ্রভাবে ভক্তিধর্ম্ম যেরূপ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল, ধর্ম্মাচরণ যেরূপ কামনামূলক হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার এবং নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। মালাধর সেকালের ধর্ম্মের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ভক্তিধর্ম্মের চরম কথা শুনাইবার দেশকালপাত্র তখন ছিল না—তিনি তাহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়া গিয়াছেন।

মালাধরের বর্ণিত বৃন্দাবনলীলায় প্রেমধর্ম্ম অপেক্ষা বীরধর্ম্মের অনুশীলনের কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থখানি কেবল শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর ঘটনাপরম্পরার অতি দ্রুত সঞ্চারে নিরাভরণ বিবৃতি। কেবল রাসলীলাপ্রসঙ্গেই কবির লেখনী রসসিক্ত হইয়া

একটু মন্থরতা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনায় বেশ মৌলিকতা আছে।

কোথাও কোথাও পক্ষী সুনাদ সে পূরে।
তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে ॥
কোথাও মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তার সঙ্গে লাফ দেই শিশুগণ সঙ্গে ॥
কোথাও ময়ুর পক্ষ নানা নৃত্য করে।
সেইরূপে নাচে তথা দেব দামোদরে ॥
কোথায় পক্ষগণ আকাশে উড়ি যায়
তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায় ॥

মালাধরের রাসলীলাবর্ণনাতেও কবিত্ব আছে—ইহার কতক অংশ অনুবাদ, কতক অংশ কবির নিজস্ব। জয়দেবের প্রভাবও আছে। মঙ্গলকাব্যের মত বনের ফুলের একটা দীর্ঘ তালিকা থাকিলেও রাসক্ষেত্রের আবেষ্টনীর বর্ণনাও সুন্দর। কবি রাসলীলার উপসংহারে বলিয়াছেন—রসমহোদধি মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসে।

ভাগবতে রাধার নাম নাই; মালাধর বলিয়াছেন,—'রাধার অঙ্গেতে দেয় অঙ্গের হেলন'। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সময় কিন্তু রাধার নাম না করিয়া ভাগবতের অনুসরণে 'এক নারী লৈয়া কৃষ্ণ করিলা গমন'—এইরূপ লিখিয়াছেন। কবি রাস-পঞ্চাধ্যায়ের অপূর্ব্ব শ্লোকগুলির অনুবাদ করেন নাই। ভাগবতে প্রাকৃত সতীধর্ম্ম ত্যাগের যে নিন্দা আছে—মালাধর তাহাতে রসান দিয়া বাংলার নারীদের উপদেশ দিয়াছেন।

ভাগবতে যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য, ও রসমাধুর্য্য, তাহার কিছুই এ গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কবি ভাগবতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরাকে জনসাধারণের

শ্রুতিরোচক করিয়া ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। যে জনসাধারণ কবির লক্ষ্য—সে জনসাধারণ অশিক্ষিত অমার্জ্জিতরুচি, সেজন্য তাহারা যাহা বুঝিবে না, তাহা ইহাতে স্থান পায় নাই। সেজন্যই যত আজগুবি রূপকথাশ্রেণীর বিষয়ই ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বজ্রনাভের উপাখ্যান হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্ব হইতে লইয়া ইহাতে সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহা রীতিমত রূপকথা। এই প্রসঙ্গে কবি রামায়ণের কাহিনীটাও বলিয়া লইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেমন বহু অবান্তর কাহিনী, বিশেষ করিয়া রামায়ণের কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট করা হইত, ইহাতেও তাহাই হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক বিবাহটির ইহাতে ফলাও করিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবনের আভাস-ইঙ্গিত মাঝে মাঝে আছে। তাহাতে রুক্মিণী ও সত্যভামার চরিত্র কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে এই দুই চরিত্রের প্রেমের আদর্শ দুইটি বেশ রস সঞ্চার করিয়াছে।

ভাগবতের সংস্কৃত শ্লোকে যে বস্তু রসঘন ও গাঢ়বন্ধভাবে কাব্যশ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে—তাহা বাংলার প্রাকৃতজনের ভাষায় সে মর্য্যাদা হারাইয়াছে। আজগুবি গল্প বলার এবং কৃত্তিবাসী ঢঙে যুদ্ধাদির বর্ণনার আগ্রহ কবির এত বেশি যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-মহিমা ততটা ফুটে নাই, যতটা ফুটিয়াছে তাঁহার বলবীর্য্যের ও চাতুরী-কৌশলের কথা।

ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে ইহা বিদ্বৎসমাজে বা ভক্তসমাজে কোন সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী কালে কাশীরাম যতটা ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন—মালাধর ততটাও পারেন নাই! প্রাকৃতজনের চোখে শ্রীকৃষ্ণ যে একজন বহুবল্লভ অসামান্য

পুরুষ, এইটুকুই প্রকটিত হইয়াছে। সরলচিত্ত, অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বিরাটত্বের যে ধারণা সেই ধারণাকেই ইহাতে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভক্তির একটা প্রাথমিক স্তরের ইহাতে পত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু কবি যে বলিয়াছেন—"লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালী করিয়া।"—এই লোকনিস্তারের সহায়তা ইহাতে—শেষ দিকে যতটা হইয়াছে, গোড়ার দিকে ততটা হয় নাই।

কবি তার পরই বলিয়াছেন—

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তেকারণে ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাহি॥

সেকালে ধনীব্যক্তিরাই বাড়ীতে ভাগবতপাঠের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ইহাতে বহু ব্যয় হইত—সকল লোকে সে ব্যাখ্যাও হয়ত ভাল বুঝিতে পারিত না। কবি সে জন্য লৌকিক ভাষায় পয়ারছন্দে ভাগবতের গল্পগুলি লিখিয়া ভাগবতকথাকে সহজাধিগম্য করিয়াছেন। ইহাও একপ্রকারের লোকনিস্তার।

ইহাতে ভক্তিধর্ম্মের মহিমাবিবৃতি যেমনই হউক, জনসাধারণ ইহা ভক্তিনত মনে শুনিত এবং সমস্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনে করিয়া কোন বিচারবিশ্লেষণ করিত না। কবিও শ্রীকৃষ্ণের অবদান-পরম্পরাকে 'কেলি' 'ক্রীড়া' ইত্যাদি বলিয়াছেন। উচ্চ সাহিত্যের আদর্শে ইহা রচিত হয় নাই—মূল ভাগবতের মত ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবেও ইহা রচিত হয় নাই। ইহা লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি অনেক স্থলে আছে—সেগুলি অবশ্য শ্রোতাদের শির ভূমিতে অবনত করিয়া দিত।

ধর্ম্মোপদেশ সাধারণতঃ ইহাতে গল্পচ্ছলেই দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সুদাম সখার উপাখ্যান, ভৃগুমুনির পরীক্ষা, অজামিলের মুক্তি।

ভরতরাজার উপাখ্যানে অবধূতের চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্বকথন ও উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যানে অপরোক্ষ ভাবে ধর্ম্মোপদেশই দেওয়া হইয়াছে। এই ধর্ম্মোপদেশের বাণী কেবল ভাগবত হইতেই গৃহীত নয়—গীতা ও অন্যান্য পুরাণ হইতেও গৃহীত। ষট্‌চক্রভেদের কথাও ভাগবতে নাই। যোগপ্রকরণের কথা তন্ত্রাদি হইতে গৃহীত। উদ্ধবের প্রতি উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশের মত সারগর্ভ। ভাগবতে উদ্ধবের বিশ্বরূপদর্শন নাই, মালাধর অর্জ্জুনের মত উদ্ধবকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন।

মালাধর ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের আভাস মাত্র দিয়া আদর্শ গৃহস্থ-ধর্ম্মপালনের কথাই এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন।

লোকশিক্ষার জন্য রচিত এই গ্রন্থে কবিত্ব বড় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যেখানে যেখানে কবি অনুবাদ বা অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে কিছু কিছু লিখিয়াছেন সেখানে একটু-আধটু কবিত্ব আছে। সেকালে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, নৌকাবিলাস, জলকেলি ভারখণ্ড ইত্যাদি বৃন্দাবনী উপাদান কোন কোন কাব্যের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই লীলাগুলির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে এই লীলাগুলি স্থান পাইয়াছে। এই বর্ণনাগুলিতে কিছু কিছু কবিত্ব আছে। কিন্তু তাহার কতটা পূর্বকবিগণের প্রাপ্য, কতটা শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলগায়কদের তাহা বলা কঠিন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যে মঙ্গলগানগায়কদের রচনা অনেক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালী কবির বৃন্দাবন বাংলাদেশেরই গ্রাম গোঠ বাট দিয়া গড়া। কবি যে বৃন্দাবনের আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদেরই চারিপাশের সঙ্গে তাহার মিল আছে। কেবল তাহাই নয়, সেকালের

মঙ্গলকাব্যে সৈন্যসমাবেশ, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির বর্ণনায় যে সকল উপাদান গ্রহণ করা হইত—সেই সমস্তই অনেকস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। ভাগবতের ভারতবর্ষ বাঙ্গালার মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে রূপলাভ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সেই রূপের কথাই আছে। কবির উপমাগুলিতেও বাংলার মাটির গন্ধ আছে।

১। লাঙলের ইষ যেন দন্ত সারি সারি,

২। বড় বড় দীঘির পাড় তার হাত পা ধরি।
উদর গোটা যেন তার শুখানো গোখুরী।

৩। ফুটি কাঁকুড় যেন হৈল খান খান।

৪। জেনক কৃষক রহে দেখি অনাবৃষ্টি
মেঘের শব্দ পাঞা চাহে উর্দ্ধ দৃষ্টি।

মালাধর বলিয়াছেন—ভাগবত শুনিলুঁ আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে—মালাধর নিজে সংস্কৃত জানিতেন না—তিনি সংস্কৃত ভাগবত নিজে পড়েন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় পড়িয়া তাহা মনে হয় না। অনেক শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ আছে—তাহা কথকতা শুনিয়া সম্ভব নয়। উদ্ধব-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে মালাধরের সংস্কৃত জ্ঞানের বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মালাধর ভাগবতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা লইয়াই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মালাধর কি ভাবে ভাগবতের শ্লোকগুলিকে তাঁহার শ্রোতাদের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনমত যোগবিয়োগ করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছেন—তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রাসলীলার কিয়দংশ উৎকলন করিয়া দেখাইতেছি

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোঽন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তোজবলোলকুণ্ডলাঃ॥

দুহন্ত্যোঽপি কাশ্চিদ্দোহংযযুঃ হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাঽপরা যযুঃ ॥ঃ
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্য শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥

* * *

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোর সত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্।
যদ্যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্ ॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥

মালাধরের অনুস্মৃতি এইরূপ—

কাম অবতার করি বংশিনাদ কৈল।
শুনিঞা গুয়ালানারী মূর্চ্ছিত হৈল ॥
জানিল গোবিন্দ বেণু রাত্র বৃন্দাবনে।
চলিলেন গোপনারী আপনার মনে ॥
কেহো স্বামীর কোলে আছিল শুতিয়া।
কেহ উপকথা কয় বন্ধুজন লৈয়া ॥

কেহ রন্ধন করে কেহত ভোজন।
শিশু স্তন পিএ কার শয্যাতে গমন ॥
স্বামীরে অন্ন দেই কোন গোপনারী।
শাশুড়ীর সঙ্গে কেহো গৃহকর্ম্ম করি॥
স্বামীরে সেবএ কেহো সুবেশ করিয়া।
কেশ মার্জ্জন করে কেহ চিরুণী লৈয়া॥
অলক তিলক করে কেহ পরএ কজ্জল।
কণ্ঠে হার পরে কেহ শ্রবণে কুন্তল ॥

রাত্রিকালে ঘোরতর কানন ভিতরে।
শিবা শত সঙ্কট গহন গভীরে ॥
স্বামী এড়ি নারি আইলে কেমন সাহসে।
এত রাত্রে বৃন্দাবনে কাহার উদ্দেশে॥
না কর সাহস শুন আমার বচন।
ঘরে ঘরে চাঞা বোলে যত বন্ধুজন॥
ঝাট ঘর যাহ গোপী না থাকিহ এথা।
উদ্দেশ করিয়া স্বামী দুঃখ পায় কোথা॥
স্বামী ছাড়া নারীর কেহ নাইক সংসারে।
স্বামী সেবা করিলে হয় নরক উদ্ধারে ॥
স্বামী ধর্ম্ম স্বামী স্বর্গ স্বামী যে মুকতি।
স্বামী তুষ্ট নৈলে হয় নরকে বসতি ॥
ঝাট করি চল গোপী আপন ভবনে।
স্বামীর সেবা কর গিয়ে পুত্রের পালনে ॥

এগুলি মালাধরের পংক্তিতে পংক্তিতে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ইহাকে ভাবানুবাদই বলা যায়। এইভাবে তিনি ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

মালাধর বসুর পরে ভাগবত অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থের জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী, দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—রঘুনাথ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। ইঁহার পাট বরাহনগরে। রঘুনাথের গৃহে মহাপ্রভু পদার্পণ করেন এবং তাঁহার ভাগবত পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাগবতাচার্য্য উপাধি দান করেন।

প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বই আর কোন করিহ না কার্য্য ॥ চৈঃ ভাঃ

ইনিও সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই—অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি ভাগবতের বারোটি স্কন্ধের অধিকাংশ অধ্যায়ের মর্ম্মকথা কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। ইহাও একখানি স্বতন্ত্র কাব্য। ভাগবতের যে যে অংশ গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে সেই সেই অংশই গ্রহণ করিয়াছেন। কবি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাগবত-পাঠই তাঁহার জীবনের ব্রত ও জীবিকাই ছিল। সে জন্য ভাগবতের শ্লোকার্থকে কোথাও বিকৃত না করিয়া যতদূর সম্ভব শ্লোকের মর্ম্মার্থ অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন। তাঁহার

গ্রন্থের বহু স্থলেই কবিত্ব আছে—এ কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব নয়, ভাগবতেরই সম্পদ্। তবে বঙ্গভাষায় প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁহারই। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনায় ইহাতে পাণ্ডিত্য যথেষ্ট আছে। ইনি ভাগবতের তত্ত্বমূলক অংশগুলিকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করেন নাই। মালাধরের রচনা জন-সাধারণের জন্য—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিদ্বৎসমাজের জন্য না হইলেও ভক্তসমাজের জন্য। মালাধর যেমন তাঁহার গ্রন্থে ভাগবতের বহির্ভূত বহু পুরাণাদির আখ্যানবস্তু তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন—রঘুনাথ তাহা করেন নাই। তিনি ভাগবতের বাহিরের কথা কিছু লেখেন নাই।

অধ্যাপকখগেন্দ্রনাথ ইঁহার সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা লিখিয়াছেন। ভাগবতের—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

এই শ্লোকে যে চৈতন্যাবতারের ইঙ্গিত আছে—একথা রঘুনাথ সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন। ব্রজের গোস্বামীদের ইহা আবিষ্কার নয়—তাঁহারই আবিষ্কার। রঘুনাথ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণপদে নাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জানিব বিধান॥
ত্বিষাকৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম। গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥

দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল— কেহ কেহ বলেন, মাধব মহাপ্রভুর শ্যালক ও অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। ইনি যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হ'ন। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই ইনি প্রধানতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধকে নানাছন্দে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করিয়া মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করেন। ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীচৈতন্যের শ্যালক মাধব নহেন।

মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ, বিষ্ণুপুরাণ, ও হরিবংশ হইতেও বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থ হইতে দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদির কাহিনীও গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভাষা বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মত সহজ সরল এবং বর্ত্তমান যুগের ভাষার কাছাকাছি। মাধবের রচনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চেয়ে কবিত্বমধুর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীরা বনের দিকে ছুটিয়াছে—তাহাতে ভাগবতে তাহাদের ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ—এই বিশেষণটির প্রয়োগ আছে। বৈষ্ণবতোষণীর টীকায় বলা হইয়াছে—"বল্লভপ্রাপ্তি-বেলায়াং মদনাবেশ-সম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমোহারমাল্যাদি ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥" এই বিভ্রম ব্যাপারে যে কবিত্বের স্থান ছিল, মালাধর তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এখানে মাধবের বর্ণনা লক্ষণীয়।

কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অঞ্জন।
কেহ এক কুচে দেই কুঙ্কুম চন্দন ॥
কেহ কেহ দেয় অধঃ সীমন্তে সিন্দুর।
কেহ ভ্রমে পদে হার, করেতে নূপুর।
হাতের ভূষণ কেহ পরয়ে চরণে।
হস্তেতে পরয়ে কেহ পদের ভূষণে ॥

অবশ্য ইহা কবির নিজস্ব নয়, সম্পূর্ণ conventional. তবু যথাস্থানে কবিপদ্ধতির প্রয়োগ সুকবির লক্ষণ। এইরূপ বহু স্থলেই কবি নিজ কবিবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াছেন। মাধবের রচনায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে মাধব শ্রীকৃষ্ণের মাখনসরচুরির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

ঘরের গোময় ঝাঁটি রন্ধনবাড়ন পরিপাটী সঙ্গে থাকি আপনার কাজে
না জানি কেমন ছলে আসিয়া হেনক্রি কালে প্রবেশ করল গৃহমাঝে ॥
যত ভাণ্ড সারিসারি ঘৃতদধি ননী পূরি শিকার উপরে রাখি দূরে।
হাতে যদি নাহি পাএ উপায় সৃজিয়া যাএ শিশু নয় বড়ই চতুরে ॥

পীঁড়ির উপর পীঁড়ি চাপাইয়া তার উপর উদূখলের উপরে উদূখল, তার উপরে শিলপাথর বসাইয়া গোপাল উপায় সৃজন করিয়া উঠিয়া পড়ে—এইভাবে শিকার নাগাল পাইয়া দধি ননী সব খাইয়া ফেলে। যত খায় তার বেশি ছড়ায়। প্রতিবেশিনী আসিয়া যশোদার কাছে নালিশ করিয়া বলে—

এখন তোমার কাছে সাধু যেন বসিয়াছে বিচারিয়া করহদমন।
ভয়ে গোপালের চোখ ছল ছল করিয়া উঠে। যশোদা গোপালের মুখ দেখিয়া 'হাসি মিথ্যা করিল সকল।' কাজেই—'আদ্দাশ লাগিল না'। পুত্রস্নেহে অন্ধ যশোদার আচরণ এইরূপই ছিল। ইহারও সীমা আছে। গোপালের অত্যাচার এতই বাড়িয়া উঠিল যে—গোপালকে উদূখলে বাঁধিয়া রাখিতে হইল। কিন্তু যাহারা অভিযোগকারিণী—তাহারাই আবার গোপালকে শাসন করিতে দেয় না। তাহারা নিজেরাই আদ্দাস ফিরাইয়া লয়। বৃন্দাবন দাস বালগৌরের বিরুদ্ধে অভিযোগেরও এইরূপ পরিণতি দেখাইয়াছেন। মাধবের ভণিতার নমুনা—

চৈতন্য চরণ ধন সার করি আভরণ দ্বিজ মাধব রস গানে।
শ্রীযুত ঠাকুর পণ্ডিত তিঁহো হন সুবিদিত সোই এই রস ভাল জানে।

দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল—ইহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। ইনি ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই—ভাগবতের উপাখ্যানের সঙ্গে নানাবিধ উপাখ্যান সংযোগ করিয়া ইনি স্বতন্ত্র কাব্যই

রচনা করিয়াছেন। এই কাব্য তিনি নিজেই দল বাঁধিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন অথবা ইহাকে অবলম্বন করিয়া কথকতা করিতেন। ইনি কাব্য রচনায় অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা বলি বটে পরবর্ত্তী কবিরা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থপাঠ করিয়া অনেক অংশ গ্রহণ করিতেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থ চোখে দেখিতে পাইতেন কিনা সন্দেহ! পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা দেশময় গীত হইয়া প্রচারিত হইত। তাহার ফলে কবিদের রচনা বা রচনাংশ নামহারা ভণিতাহারা হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যাইত। সে সম্পত্তিতে পরবর্ত্তী কবিদের সহজ উত্তরাধিকার জন্মিয়া যাইত। কেহই বড় মৌলিকতার সৃষ্টি করিতে চাহিতেন না বা পারিতেন না। দেশে প্রচলিত গান ও পদ্যাংশ-গুলিকে কবিরা নিজেদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে আত্মসাৎ করিয়া লইতেন। রচনার আসল কৃতিত্ব যে কাহার প্রাপ্য তাহা ধরাই যাইত না। কোন বিশিষ্ট উপমাদি যে কাহার মাথায় প্রথম আসিয়াছিল তাহাও বলা কঠিন। যেমন—

দুঃখী শ্যামাদাস গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—

গগনে গরুড়গতি তা দেখি বায়স মতি মন করে উড়িবার তরে।
কেশরী পশ্চাৎ যেন মৃগ ধেয়ে আসে তেন দুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গোচুরে॥

এই ধরণের কথা কত কবিই না বলিয়াছেন!

শ্যামাদাস কালীয়দমনের বর্ণনা দিয়াছেন সুবিস্তারে। এইরূপ বর্ণনাই কালীয়দমন যাত্রার পালার রূপ ধরিয়াছিল। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে রাধিকা উদ্ধবকে আহ্বান করিয়া যে আক্ষেপ জানাইতেছেন কবি তাহা সরস মধুর বারমাস্যার আকারে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষাংশ উৎকলন করি—

আষাঢ়ে আঙ্গিনা মাঝে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া।
আলিঙ্গন সেই মুখে বুলাইল হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ।
উদ্ধব—অনেক যন্ত্রণা,
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা।
শ্রাবণে সরস রস-বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকসিত ভ্রমর হিল্লোলে।
সুখ ও বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
সোঙরি সোঙরি কাঁদি এ ভবতরঙ্গে।
দুঃখী শ্যামাদাস গায়।
চিত্ত দঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যামরায়।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—ভাগবত অবলম্বনে যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের স্থান অনেক উচ্চে। কারণ, ইনি অনুবাদকদের দলে পড়েন না—ইনি পদকর্ত্তাদের দলে স্থান পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণজন্ম হইতে নন্দবিদায় পর্য্যন্ত—ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া টানা পয়ারে কাব্য না লিখিয়া ইনি পদাবলী রচনা করিয়াছেন। পদাবলীর আকারে ভাগবতের উপাখ্যান দীনচণ্ডীদাসের হাতে অনেকটা কবিত্বমধুর হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক মণীন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর ১ম খণ্ড প্রধানতঃ ভাগবতেরই গীতিরূপ। এই গ্রন্থের শেষের দিকে আক্ষেপ, অনুরাগ ভাবসম্মেলন, ও গোপীবিলাপের পদাবলির মধ্যে সবগুলি দীনচণ্ডীদাসের বটে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাগবতের সঙ্গে এইগুলির সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ নয়। দীন চণ্ডীদাসের সখ্য ও বাৎসল্যরসের

প্রথম শ্রেণীর না হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ত বটেই। এই গ্রন্থের গোড়ার দিকের পদগুলির সঙ্গে রসোৎকর্ষে শেষের দিকের পদগুলির সামঞ্জস্য হয় না, তবে ভাষা ও ছন্দে বেশ মিল আছে। দুইটি পদ উৎকলন করিয়া দীনচণ্ডীদাসের কবিত্বের দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোষ্ঠযাত্রী শ্যামকে দেখিয়া সখীর প্রতি রাধা।

সই কি আর বলিব মায়।
তিল দয়া নাই তাহার শরীরে এ কথা কহিব কায়।
মায়ের পরাণ এমনি ধরণ তার দয়া নাই চিতে।
এমন নবীন কুসুম বরণ বনে নহে পাঠাইতে।
কেমনে ধাইবে ধেনু ফিরাইবে এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম প্রখর উত্তাপে গগন ভানু।
বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে মোর মনে হেন ভায়।
আর এক আছে কংসের অরাতি জানি বা ধরিয়া লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মনে সদাই উঠিছে ভয়।
চণ্ডীদাসে কয় না ভাবিহ ভয় সে হরি জগৎপতি।
তারে কোন জন করিবে তাড়ন এমন না দেখি কতি।

পশারিণী রাধার প্রতি কৃষ্ণ—

সোনার বরণখানি মলিন হয়েছে জানি হেলিয়া পড়িছে যেন লতা.
অধর বাঁধুলী তোর নয়ন চাতক মোর মলিন হইল তার পাতা।
সরুয়া বসন তায় ঘামেতে ভিজিল গায় চরণে চলিতে নারে পথে।
উতপিত রেণু তায় কত না পুড়ায় পায় পশারা সাজালে তায় মাথে।
রাখহ পশারা খানি নিকটে বৈঠহ ধনি শীতল চামরে করি বায়।
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি মুখে তোর না নিঃসরে রায়।

কহে দীন চণ্ডীদাসে শ্যাম ধরি রাই হাতে বসায়ল তরুর ছায়ায়।
দধির পশারাখানি লয়া তার ছানা লুনি আদরে বদনে দিতে চায়।

বলা বাহুল্য, এই সকল পদ ভাগবতের শ্লোক হইতে নয়। মণীন্দ্র বাবু এই পদগুলিকেও ভাগবতের অনুসরণে রচিত পদাবলীর সঙ্গেই সাজাইয়াছেন বলিয়া ২টি পদ তুলিয়া দীনচণ্ডীদাসের কবিত্বের দৃষ্টান্ত দিলাম। রাধাবিরহের পদ এবং সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির পদগুলির মধ্যে কোনগুলি দীন চণ্ডীদাসের, কোনগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসের আজ বলা শক্ত। তবে বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পদগুলির এবং ভণিতাগুলির আলোচনা করিলে বুঝা যায় কোনগুলি রসধনের ধনী চণ্ডীদাসের আর কোনগুলি রসধনে দীন চণ্ডীদাসের। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

নরহরিদাসের কেশবমঙ্গল—এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত-হয় নাই। দীনেশচন্দ্র তাঁহার বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ের ১ম খণ্ডে তাঁহার রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরিদাস ব্রজলীলার পরিবেষ স্থষ্টির জন্য ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। কিয়দংশ তুলিয়া দিই তাহাতে কবির রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

হেনমতে নন্দসুত করেন বিলাস। শরৎ আসিয়া পুন হইল প্রকাশ ॥
মন্দ মন্দ বরিষণ করে ধারাধর। নিস্ফলে গরজে কভু করি গরগর ॥
সিন্ধুসমাগমে যত নদনদীজল। তরঙ্গে বহিছে করি' শব্দ কোলাহল ॥
প্রসন্নগগনে চন্দ্রজ্যোতির প্রকাশ। তারাগণ প্রফুল্লিল জুড়িএ আকাশ ॥
সুখদ শরৎ ঋতু সর্ব্বসুখোদয়। সর্বমনোরথসিদ্ধি ব্যক্ত সুনিশ্চয় ॥
সন্ন্যাসী তপস্বী করে তীর্থ পর্যটন। বিদেশে বাণিজ্যে চলে সাধু মহাজন।
দেশাচার মতে ক্রমে উঠে ইন্দ্রধ্বজ। সিদ্ধপুরুষেরা সব সাধে কাজ নিজ ॥
ব্রজে জনমিতে ইচ্ছে ব্রহ্মাদিদেবতা। প্রসন্ন হইবে ঋতু কোন তুচ্ছ কথা॥

দীনেশবাবু ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনেকগুলি কাব্যের কিছু কিছু নিদর্শন বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য—অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয়, নরসিংহ দাসের হংসদূত (ইহাতে গোপিকার বারমাসী সুন্দর রচনা), অচ্যুতদাসের কৃষ্ণলীলা (এই গ্রন্থের অক্রূরসংবাদ সুন্দর রচনা), রাজারাম দত্তের ভাগবত (ইহাতে দণ্ডী রাজার উপাখ্যান আছে সবিস্তারে। ভাগবতে দণ্ডী রাজার উপাখ্যান নাই—ভীমসেন ইহাতে গোঁয়ার-গোবিন্দরূপে চিত্রিত হইয়াছেন), কাশীরামের ভ্রাতা গদাধরদাসের জগন্নাথমঙ্গল, দ্বিজপরশুরামের ভাগবত, জীবন চক্রবর্ত্তীর ভাগবত (ইহাতে দান-লীলার চমৎকার বর্ণনা আছে), রাধাকৃষ্ণদাসের ভাগবত ইত্যাদি।

দৈবকীনন্দন কবিশেখরের গোপালবিজয়—ভাগবত অবলম্বনে যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দৈবকীনন্দন কবি-শেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ইনি প্রথমে ব্রজলীলার কাব্যনাট্য রচনা করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তের পরিতোষ না হওয়ায় বাংলায় গোপালবিজয় কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাগবতের উপাখ্যান ছাড়া দানলীলা, নৌকাবিলাস, বংশীচুরি ইত্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার॥ আমার দোষ নাই—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন।" ইঁহার দানলীলা কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলার ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ অনুস্মৃতি। কবি বড়াইয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা চমৎকার। ভারতচন্দ্রের 'জরতী' যেন ইহারই অনুসরণে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে গোপালবিজয়ের ভাষাকে কিছু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

ইহার গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে—কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন ও গোপগোপীগণের সঙ্গে পুনর্মিলনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে ইনি ভাগবতের অনুসরণ না করিয়া স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন।

কবি অর্থকরী বিদ্যার পণ্ডিতদের যে বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা এ যুগের পক্ষেও সমান ভাবেই খাটে—

কলিতে বিদ্যায় বহু বাড়ে অহঙ্কার।
পুঁথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জিবার ॥
কলিকালে হেন পণ্ডিতের ব্যবহার।
নরদেহ ধরি যেন বুলে অহঙ্কার ॥
লোক রঞ্জিবারে করে আচার বিচার।
মনঃশুদ্ধি নাহিক আটোপমাত্রসার।

এ হেন কলিকালে কবি যে বেদপুরাণের সারকথা বলিবেন—তাহা কয়জন বুঝিবে?

সহজেই কলিকালে মূরখ অপার। পণ্ডিতজনের হয় বিরল প্রচার ॥

মূর্খের হাতে পড়িলে সবই পণ্ড হইবে,--বানরের হাতে ঝুনা নারিকেল বা দন্তহীনের কাছে ইক্ষুদণ্ডের মত।

কবি বলিয়াছেন—"লৌকিক ভাষায় ভাগবত লিখিলাম বলিয়া কেহ উপহাস করিও না। লৌকিক ভাষার মন্ত্রে সর্পবিষ পর্য্যন্ত দূর হয়। পণ্ডিতরা ভাগবত ব্যাখ্যা করেন—কয় জন তাহা বুঝে? ভাষার জন্ত কি আসে যায়? 'ভাবনা' ঠিক থাকিলেই হইল। যাহারা আমার গুণজ্ঞ, তাহাদের জন্য পাঁচালী প্রবন্ধে ভাগবত রচনা করিলাম। ইহাতে দোষক্রটী অনেক ঘটিবে। মালী সব ভালো ভালো ফুল বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথে না, কোকিলও সব সময় মধুর কূজন করে না।"

সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি সিধি।
অমৃত উগারি বিষ উগারে পয়োধি ॥
হেন মতে দোষগুণ দেখিয়া সংসারে।
দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত কৃষ্ণদাস প্রণীত (অনূদিত নয়) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য গোসাঞির ভৃত্য ও শিষ্য ছিলেন। ইনি বলিয়াছেন—

জাহ্নবী পশ্চিমকূলে বসতি আমার।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার ॥

ইহার অর্থ বুঝা যায় না। জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেইত শ্রীকৃষ্ণভক্তদের অনেকেরই আবির্ভাব। ইঁহার সাহিত্যগুরু ছিলেন মাধবাচার্য্য। তিনি আগেই কৃষ্ণমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাই শিষ্য কৃষ্ণদাস অতি ভয়ে ভয়ে গ্রন্থ লেখেন। যাই হোক, মাধবাচার্য্য গ্রন্থ পড়িয়া বলেন—"এ অঞ্চলে আমার বই চলুক, দক্ষিণ অঞ্চলে তোমার বই চলিবে।" ইঁহার পুস্তকে কেবল ভাগবতের উপাখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে। সেই সঙ্গে কবি দান খণ্ড, নৌকাখণ্ড, ইত্যাদি অনেক ব্যাপার সংযুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কোন শ্লোকের অনুবাদ করেন নাই। ইঁহার উপমাগুলিও মৌলিক।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিলেন, দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্র বর দিলেন। পাণ্ডবরা রাজ্য ফিরিয়া পাইয়া খুসী হইয়া চলিয়া গেল। আপাততঃ তাহাদের রাগ পড়িয়া গেল, বেদব্যাসেরও রাগ পড়িয়া গেল, কিন্তু ভক্তের রাগ তাহাতে যাইতে পারে না। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাই কৃষ্ণদাস লিখিলেন—

বর পাইঞা ঘর গেল দ্রুপদনন্দিনী।
দুর্যোধনের ঘরে উঠিল আগুনি ॥

খাটপাট পোড়ে আর রত্নসিংহাসন।
অবশেষে পোড়ে যত রাণীর বসন॥
ছাড়িল বসন সবে অগ্নির জ্বালায়।
নগ্ন হইয়া সভা দিয়া রমণী পলায়॥
কর্ণ ভীষ্ম আদি বীর আছিল সভাতে।
বিবস্ত্রা রমণী দেখি রহে হেঁট মাথে॥

কৃষ্ণদাসের রচনায় উৎপ্রেক্ষা ও প্রতিবস্তূপমার ছড়াছড়ি। কৃষ্ণদাস বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানেন না—তিনি মাধবাচার্য্যের গ্রন্থকে আদর্শস্বরূপ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। একথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, আচার্য্য গোসাঞ্রির সাহচর্য্যে তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের পয়ার সেকালের অধিকাংশ কবির পয়ারের চেয়ে মধুরতর।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল—কবিচন্দ্র উপাধি, নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। বিষ্ণুপুরের নিকটে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কবি সুদীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রতিপালকের আদেশে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন—রামায়ণ, মহাভারত, শিবমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদি। কবি ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে কতকগুলি অধ্যায় বাছিয়া সেইগুলির উপাখ্যানাংশকে কাব্যরূপ দান করেন। এই গ্রন্থও অনুবাদ নয়। ইহাতে নানা পুরাণ হইতে সংগৃহীত উপাখ্যানও স্থান পাইয়াছে। ইঁহার রচিত দাতাকর্ণের কাহিনী আমরা বাল্যকালে শিশুবোধকে পড়িয়াছিলাম। ইঁহার গোবিন্দমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত গোস্বামী প্রভুদের

রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে রসের পোষকতার জন্য বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার গোবিন্দমঙ্গল একসময়ে রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে গীত হইত।

এইসকল কবি ছাড়া, ভাগবত লইয়া যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে **অভিরাম দত্ত** তাঁহার গোবিন্দবিজয়ে ১ম ও ২য় স্কন্ধ হইতে ভাগবত-শ্রবণের ভূমিকাস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসান হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া দশমস্কন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। **দুর্লভনন্দন,** নারদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পরে কবিচন্দ্রের মত প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে ইচ্ছামত অংশ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাও স্বতন্ত্র কাব্য। **ভবানন্দের** হরিবংশ সংস্কৃত হরিবংশের অনুসৃতি নয়—বরং ইহাকে ভাগবত সাহিত্যের গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। কারণ, প্রথমতঃ ইহাতে কৃষ্ণলীলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতের কোন কোন উপাখ্যান অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃত ভাগবতে না থাকিলেও বাংলা ভাগবতগুলিতে দানলীলা ও নৌকাবিলাস কৃষ্ণলীলার বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ভবানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুসরণে দানলীলাকে খুবই প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহার কোন কোন পদ পদাবলীসংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য।

কালা কালা করি বোলো বিনোদিনী তাতে কি বোলিতে পারি।
তোমার আমার আইস বিনোদিনী রূপের বদল করি।
কাজল বরণ আমারে হেরিয়া তুমি যদি মোরে নিন্দ।
তবে কেন তুমি কালিয়া কাজল ভুরুর উপরে পিন্ধ।
কালা কালা বলি হের বিনোদিনী নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক কাজলবরণ তোমার মাথায় কেশ।

কালা বিনে গোরা উজল না হয় কালা সে আঁখির জ্যোতি।
কালারে নিন্দিয়া গলায়ে পিন্ধহ কাজল বরণ মোতি॥

কৃষ্ণলীলা-সাহিত্যের দুইটি ধারা এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল—একটি পদাবলীর ধারা, ইহা জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির রচনা হইতে প্রবাহ লাভ করিয়াছে। এই ধারার পদাবলী কীর্ত্তনসঙ্গীতে গীত হয়। আর একটি ধারার জন্ম ভাগবত হইতে; বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে এই ধারার সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে। এই ধারার কোন কোন কবি ভাগবতের উপাখ্যানগুলিরই অনুসরণ করিয়াছেন। অধিকাংশ কবি ভাগবতের কোন কোন উপাখ্যানের সহিত নানা পুরাণের উপাখ্যান মিশাইয়া কৃষ্ণলীলার কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকাব্য সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। পদাবলী-ধারার একশ্রেণীর রচনার ছন্দ প্রধানতঃ জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে গৃহীত। আর একশ্রেণীর রচনার ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী। চণ্ডীদাস দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুস্থানীয়। পয়ার ত্রিপদীছন্দে রচিত কৃষ্ণলীলাকাব্যগুলি সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্যগুলির ন্যায় গ্রামে গ্রামে গীত হইত। মূল গায়ন গদ্যভাষাতেও মাঝে মাঝে সেগুলির ব্যাখ্যা করিতেন।

এদেশে ধামালী সঙ্গীত নামে একশ্রেণীর গান গাওয়া হইত—ধামালি বা ঢামালির অর্থ রঙ্গরসিকতা। ভাগবতের কোন লীলায় এই রঙ্গরসিকতা পাওয়া যায় নাই। ঢামালীর কবিরা কৃষ্ণলীলায় ঢামালি বা রঙ্গরসিকতার জন্য দানলীলা, নৌকাবিলাস, ভারখণ্ড ইত্যাদি উপাখ্যানের প্রবর্ত্তন করেন—অর্বাচীন পুরাণাদি হইতে। এইগুলি ঢামালি গানের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছিল। ভাগবত-সাহিত্য যাঁহারা রচনা করেন ক্রমে তাঁহারা এই লীলাগুলিকে তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। আর এই লীলা

লইয়া যাঁহারা পদ রচনা করেন—তাঁহাদের পদগুলি পদাবলী-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে এবং দানলীলা বলিয়া রসকীর্ত্তনের পৃথক পালাও রচিত হইয়াছে, সেই পালা এখনো রসকীর্ত্তনে গীত হয়।

এই দানলীলাদির ঢামালি গান এদেশে যেরূপ জনবল্লভতা লাভ করিয়াছিল, এমন আর আর কোন গান নয়। ফলে, দানলীলাদি লইয়া দেশে একটা বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্যদেব নিজে দানলীলার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দানলীলাদির সাহিত্য কবিত্বের দিক হইতে খুব আদরণীয় হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, ইহা একই ধরনের রচনার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়—ইহাতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির বিশেষ অবসর ছিল না।

এই ঢামালিসঙ্গীত বাংলা কাব্যসাহিত্যের বিবিধ ধারার মধ্যে আত্মবিলয় করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের ঢামালি শিবদুর্গার ঢামালিতে পরিণত হইয়াছে, শুকসারীর দ্বন্দ্বে নবরূপ লাভ করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সপত্নী-কলহে এবং অন্যান্য রসকলহে রূপান্তরিত হইয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যেও খণ্ডিতা রাধা ও সখীদের কৃষ্ণ-বিদূষণে নবরূপ লাভ করিয়াছে। ঢামালির বড়াইটি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কুট্টনীর রূপ ধরিয়াছে। আর তাহার অপূর্ব্ব রূপটি চণ্ডী বা অন্নদার জরতীরূপে অনুবর্ণিত হইয়াছে। মালাধর, রঘুনাথের পর যাঁহারা ভাগবত সাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা কেবল রাসলীলার দ্বারাই রস জমাইতে পারেন নাই—দানলীলা তাঁহাদের কাব্যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ভাগবতসাহিত্যের ধারা কৃষ্ণকমল, দাশরথি, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। যে কালীয়-দমনের পালা একদিন বাংলাদেশে খুব আদর পাইয়াছিল, তাহাও ভাগবত

সাহিত্যেরই ধারা। ভাগবতসাহিত্যের ধারা ক্রমে আমাদের দেশের যাত্রাসঙ্গীতে আত্মবিলোপ করিয়াছে।

আজ আর ভাগবতের রসাস্বাদের জন্য বাংলা ভাগবত সাহিত্যের কেহ সন্ধান করে না, সানুবাদ ভাগবতগ্রন্থই পাঠ করে, নয়ত ভাগবতের ব্যাখ্যা শোনে।

বঙ্গ-সাহিত্যে ভাগবতের সব চেয়ে বড় দান শ্রীকৃষ্ণের **বংশীর আহ্বান** ও **মথুরার আহ্বান**। এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়া যে পদাবলী সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে তাহাই বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ভাগবতের দুইটি শ্লোকের মর্ম্মার্থই পদকল্পতরুর দ্বিদল বীজস্বরূপ—একটি

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

আর একটি—

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম
ভূদক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ॥

কীর্ত্তন-সঙ্গীত

"এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যে দিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্ত্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।" (যাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্রনাথ)

কীর্ত্তন ধ্রুপদ-খেয়ালের মত সঙ্গীতের একপ্রকার পদ্ধতি। ধ্রুপদ খেয়ালে যেমন নানা রাগরাগিণীর সমাবেশ ও স্বরবৈচিত্র্য আছে—কীর্ত্তনেও তেমনি আছে। তবে কীর্ত্তনে স্বর অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য।

প্রচলিত কীর্ত্তনসঙ্গীতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব। বাঙ্গালার তৎকালীন প্রচলিত কীর্ত্তনসঙ্গীত-ধারায় শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবাবেশের ও লীলামাধুর্য্যের প্রতিবিম্বপাতে এই শ্রেণীর সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। কীর্ত্তনসঙ্গীতে বৃন্দাবনলীলার গীতিকবিতার সহিত শ্রীচৈতন্যের লীলাবিলাসের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কীর্ত্তনসঙ্গীত তাই কেবল 'বিলাসকলাসু কুতূহল' তৃপ্ত করে না,—ইহা সাধনভজনেরও অঙ্গ।

সাধারণতঃ দুই চালের কীর্ত্তন শুনা যায়। গরাণহাটী চালের জন্ম রাজসাহীর গরাণহাটি পরগণায়,—নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রভাবে। মনোহরশাহী চালের জন্ম শ্রীখণ্ডমণ্ডলে, শ্রীখণ্ডের ভক্তসাধকদের প্রভাবে। বীরভূম জেলার ময়নাডাল এই শ্রেণীর কীর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত। মনোহরশাহী চাল বেশ গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, উহা কীর্ত্তনের ধ্রুপদ। কথিত আছে, গঙ্গানারায়ণ নামক একজন গায়ক মনোহরশাহী ঢঙের

প্রবর্ত্তক। মঙ্গলঠাকুর নামক একজন গায়ক ইহার সংস্কার সাধন করেন। পরবর্ত্তী কালে রেনেটি ও মন্দারিণী ঢঙের মিলনে ইহা কতকটা লঘুতরল হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের আগে কীর্ত্তন-সঙ্গীত এদেশে ছিল না, এ কথা সত্য নয়। কীর্ত্তনসংগীত পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। গীত-গোবিন্দ কীর্ত্তনের স্থরেই গীত হইত। কিন্তু তাহার এই প্রকার রূপ ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেবই উহাকে বর্ত্তমান রূপ দিয়াছেন। চৈতন্যদেব ভাবাবেশের সময়ে মুখে যে সকল অস্বাভাবিক শব্দ উচ্চারণ করিতেন—কীর্ত্তনের স্থরের মধ্যে সেগুলিকেও অনুস্যূত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কীর্ত্তন-সঙ্গীত উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ইত্যাদি রসতত্ত্বের গ্রন্থের বিধিবিধানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে কীর্ত্তনের চৌষট্টি রসের উল্লেখ আছে। কীর্ত্তনীয়ারা পদাবলীসাহিত্যকে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠযাত্রা, উত্তরগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দান, রাস, ঝুলন, হোলী, বিরহ, মান, মাথুর, কুঞ্জভঙ্গ ইত্যাদি নামে কতকগুলি পালায় বিভক্ত করিয়া ঐ ৬৪ রসের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যেক পালার মূল রসের অনুরূপ গৌরচন্দ্রিকা মঙ্গলাচরণস্বরূপ গীত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। সে সঙ্গীত ভালবাসে, কিন্তু অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ সে উপভোগ করিতে চায় না। সে ভাবের সহিত স্থরের শুভসংযোগ না হইলে, বাণীর সহিত তানের শুভসম্মিলন না হইলে তৃপ্ত হয় না। তাই বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতিই ভাবপ্রধান কীর্ত্তনসঙ্গীতের জন্ম দিয়াছে; আর কীর্ত্তন যেমন বাঙ্গালীর মন মাতায়, এমন আর কোন সঙ্গীতই পারে না। বাঙ্গালীর অন্যান্য শ্রেণীর গানেও স্থর অপেক্ষা

ভাবের প্রাধান্যই ঘটিয়াছে—তবে কীর্ত্তনের মত সেগুলি এতটা ভাব-বিহ্বল নয়। বাঙ্গালীর পাঁচালী, যাত্রাসঙ্গীত, কবির গান, হাপআখড়াই, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি সকলপ্রকার গানেই কীর্ত্তনের প্রভাবসংপাত হইয়াছে। নববিধান সমাজে কীর্ত্তনের ঢঙে ও রীতিতে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত। বাঙ্গালী কবিরা হাসির গানেও কীর্ত্তনের স্বর দিয়াছেন।

"কীর্ত্তনে স্বরের কারুকার্য্য অল্প নয়—কিন্তু মূল আবেদনটি কাব্য রসের, স্বররসের নয়। এই রসটিকেই গাঢ়ভাবে পরিবেষণ করিবার জন্যই কীর্ত্তনের পদে আঁখরের সৃষ্টি। আঁখর জিনিসটা স্বরের তান নয়,—বাণীরই তান। কীর্ত্তনসঙ্গীতের ধর্ম্মই এই যে, তাহা নির্দ্দিষ্ট কাব্যসীমা ছাড়াইয়া শত শত আঁখরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে—ইহার স্বরের আবেগবেগ এমনই তীব্র যে গদ্যাত্মক আঁখরগুলিকেও রসে ভিজাইয়া চারিপাশে ছিটাইয়া দেয়।"

আঁখরগুলি আপনা হইতে মূল স্বরতরঙ্গের অনুতরঙ্গ রূপে যেন উদ্ভূত হইয়া মৃদঙ্গতটে গিয়া আঘাত করে। বৈষ্ণব কবিসাধকদের মতে যেমন রাধাকৃষ্ণের এক দেহে মিলন হইয়াছে শ্রীচৈতন্যে, ভাবের সহিত স্বরের, কাব্যের বাণীর সহিত ধ্বনির তেমনি মিলন হইয়াছে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনসঙ্গীতে।

লীলাকীর্ত্তন ছাড়াও কীর্ত্তন আছে, তাহা নামকীর্ত্তন। এই নামকীর্ত্তনের কথা ভাগবতে আছে। এই নামকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের জন্য—ইহাতে অধিকারী-অনধিকারিভেদ নাই। লীলাকীর্ত্তন লীলারস উপভোগের অধিকারীদের জন্য। যে কেহ ভগবান মানে, সেই ভগবানের নামজপ, নামস্মরণ বা নামকীর্ত্তনকেই ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ মনে করে। অতএব, ইহাতে যে কেহ যোগ দিতে

পারে। শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রভু যে সারারাত্রি ধরিয়া কীর্ত্তন করিতেন—তাহা এই নামসংকীর্ত্তন। এই নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি নগরপথে বাহির হইলে আপামরসাধারণ সকলেই সেই সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিত। এইভাবে তিনি নাম, ও নামের মধ্য দিয়া প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন। ভাগবতের অনুসরণে শ্রীচৈতন্য যখন প্রচার করিলেন—কলিযুগে নামকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম, তখন তিনি আপামর সাধারণ সকলের কথাই ভাবিয়াছিলেন,—শুধু অন্তরঙ্গদের কথাই ভাবেন নাই।

নামসংকীর্ত্তন সাহিত্যরসপিপাসু বা সঙ্গীতরসপিপাসুদের জন্য নয়,—ইহা শুধু ভক্তদের জন্য। যাহারা অভক্ত, তাহারাও যদি ইহাতে যোগ দেয় তাহা হইলে নামমাহাত্মের আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও ভক্ত-ভাবে আবিষ্ট হয়। নামসংকীর্ত্তনের একটি উদ্দেশ্য উচ্চৈঃস্বরে নামগান করিয়া দূরবর্ত্তী উদাসীন ব্যক্তিকেও ভগবানের নাম শুনানো এবং সকলকে নামগানে যোগ দিতে আহ্বান।

ভগবানের এই নাম বার বার মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণের মধ্যে সাহিত্য নাই, তবে সঙ্গীত নাই বলা যাইতে পারে না। নামই নানা স্বরে গাওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রধান উপজীব্য ভক্তি। নামকীর্ত্তনে খোল করতালের বাদ্যে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে মানুষকে মাতাইয়া তাতাইয়া তোলা হয়। তাহাতে ক্ষণকালের জন্যও মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় এবং তাহার চিত্ত ভগবদভিমুখী হয়। কাজেই মুহুর্মুহুঃ নামকীর্ত্তন করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শ্রীভগবানে রতি জন্মে। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব নামকীর্ত্তনের এত মহিমা প্রচার করিয়াছেন এবং নিজে অনবরত নামকীর্ত্তন করিয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাইয়া' গিয়াছেন।

আমাদের দেশে অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহর ইত্যাদি নামকীর্ত্তনের উৎসব সম্পাদিত হয়। ইহাতে সমগ্র গ্রামে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। এই সকল উৎসবে একই 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' উচ্চারিত হয় না। নানারূপ সুরে ও তালে ঐ নাম গীত হয়! নামগানকে তাহাতে সঙ্গীতেরই মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেব আগুলীলায় নামকীর্ত্তনের দ্বারা মানুষের চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া পরে লীলাকীর্ত্তনের দ্বারা রাগানুগা ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপধামে তিনি দাস্তভাবের প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন—তাই নামকীর্ত্তনই তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পরে তিনি মধুররসের প্রেমের প্রচারক হইলে লীলা-কীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতেন এবং বিশেষ করিয়া তাহারই নব প্রবর্ত্তন করেন। লীলাকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনের পরও নামকীর্ত্তন সমান সমাদরই পাইয়াছিল, তাহার কারণ, মধুররসের মধ্যেও যে দাস্তরস রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, জীবের উদ্ধারের জন্য—সর্ব্বসাধারণের জন্য নামকীর্ত্তনেরও যে প্রয়োজন ছিল। এই নামসংকীর্ত্তন ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে গান। কেবল বঙ্গদেশে কেন ইহা সব দেশেই ছিল। ভাগবতে একশ্রেণীর সাধকদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গনের ভক্তদের মতই আচরণ করিতেন।

যে পূর্ণিমারজনীতে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন—রজনীতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। সেজন্য—

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরিসংকীর্ত্তন॥ (চৈতন্যভাগবত)

অতএব নামকীর্ত্তন নিশ্চয়ই ছিল। সম্ভবতঃ ইহা নৈমিত্তিক উপলক্ষেই হইত। চৈতন্যদেব এই নামকীর্ত্তনকে কলিযুগে একমাত্র

ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন এবং নৈমিত্তিককে নিত্য অনুষ্ঠেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই নামকীর্ত্তনের বহুলপ্রচারের একাধিক কারণ আছে। একটি কারণ, যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের আনন্দ বিজড়িত, তাহা অন্য নীরস অনুষ্ঠানের তুলনায় ঢের বেশি হৃদ্য ও চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠান ব্যয়-সাপেক্ষ ও পৌরোহিত্য-সাপেক্ষ, এরূপ অনুষ্ঠানে কোন ব্যয় নাই, কাহারো কৃপা অথবা সহায়তার অপেক্ষা করিতে হয় না। আর একটি কারণ, একমাত্র এই অনুষ্ঠানে জাতিভেদ, বংশভেদ, অধিকারভেদ নাই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদও নাই। কুলীনব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালও সমস্বরে ভগবানের নাম করিয়া নৃত্য করিতে পারে। কেবল তাহাই নয়, সৌকণ্ঠ্য ও ভক্তির উন্মাদনা থাকিলে একজন নীচ শূদ্রও ব্রাহ্মণোত্তম অপেক্ষা এক্ষেত্রে অধিকতর মান্য।

ইদানীং পদাবলীসাহিত্য মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় বলিয়া অনুদ্‌গীত হইলেও পদাবলীসাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে পঠিত, পাঠিত ও আলোচিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে পদাবলীসাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটিত কীর্ত্তনসঙ্গীতের মধ্য দিয়া। পদাবলী গানের নাম লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন। লোকে এই লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করাকেও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত মনে করিত। শ্রীচৈতন্যদেবই ইহাকে ধর্ম্মের ও সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। লোকে ধর্ম্ম-তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্যই লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিত,—তাহাতে তাহাদের সাহিত্যরসপিপাসারও নিবৃত্তি হইত। তাহারা পদকর্ত্তাদের রচনার মাধুর্য্য ধর্ম্মের রসপুটে উপভোগ করিত; কীর্ত্তনসঙ্গীতে তাহারা পাইত ধর্ম্ম, সাহিত্য ও গীতির একটি অপূর্ব্ব সম্মেলন। আজকাল

নগরের ইংরাজি শিক্ষিত ধর্ম্মবিমুখ লোকেরাও কীর্ত্তনসঙ্গীতের আদর করে, ধর্ম্মের জন্য নয়, সাহিত্যের জন্য নয়, গীতিরস উপভোগের জন্য, বিলাস কলাসুকুতূহলের চরিতার্থতার জন্য। তাই এই ধর্ম্মহীন যুগেও কীর্ত্তনের সমাদর আছে। এযুগের ঐ শ্রেণীর লোকে ইহার জন্য একটা পবিত্র আবেষ্টনীর প্রয়োজন আছে তাহা মনে করে না। বড় বড় লোকের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসরে যে কীর্ত্তন হয়, সেই কীর্ত্তনের আসরে অভ্যাগতেরা সঙ্গীতের মাধুর্য্যও উপভোগ করে না—নিমন্ত্রণ রক্ষার আসরই মনে করে। সে আসর সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায় কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমি এ আসরের কথা বলিতেছি না। রেডিও গ্রামোফোনের মারফতে কীর্ত্তনগানের উপভোগ অনেককে করিতে দেখিতে পাই। তাহার সঙ্গেও ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। যাক্ অবান্তর কথা।

কীর্ত্তনের অর্থ কীর্ত্তিগান। এই কীর্ত্তিগান চিরদিনই আছে—সে কীর্ত্তি মহীপালেরও হইতে পারে, ভোগিপালেরও হইতে পারে, দনুজ-মর্দ্দনদেবেরও হইতে পারে, আবার দেবদেবীদেরও হইতে পারে।

এই কীর্ত্তিগান দেশে চিরদিনই ছিল, কি ঢঙে, কি সুরে, কি ভাবে তাহা গীত হইত, তাহা আমরা জানি না। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী উচ্চকণ্ঠে গাহিবার জন্যই রচিত। নিশ্চয়ই সেগুলি দেশে গীত হইত. তাহাকে কীর্ত্তন বলিত কিনা জানা যায় না। কি কি সুরে সেগুলি গাওয়া হইত—তাহা পুঁথির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু গায়নকণ্ঠে সেগুলি কি বিশিষ্ট রসরূপ গ্রহণ করিত তাহা আমরা জানি না। লিখিতাকারে স্বরলিপি তখন ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাতেই ঐ পদাবলী-গীতি লীলাকীর্ত্তনের আখ্যালাভ করে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে পদাবলীগীতি রাগানুগা ভক্তিসাধনার

অঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যই যদি বঙ্গদেশে রাগানুগা ভক্তিবাদের প্রচারক হ'ন— তাহা হইলে তদনুযায়িনী রীতিভঙ্গী, তদনুবর্ত্তী রূপ তিনিই পদাবলী-কীর্ত্তনে সঞ্চারিত করিয়াছেন—ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। আমরা এখন কীর্ত্তনিয়াদের মুখে যে লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করি, তাহাতে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত রীতিভঙ্গী ও রূপই চলিতেছে বলিয়া মনে করি।

কীর্ত্তন বলিতে আমরা এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনকেই বুঝিয়া থাকি, অন্য কোন কীর্ত্তিগানকে বুঝি না। বাংলার বাহিরে ঠিক এইরূপ কীর্ত্তনগান নাই—ইহা বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব। উড়িষ্যায় অবশ্য আছে—সেখানেত থাকিবেই। উড়িষ্যাই শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রধান লীলাভূমি। আজিও সুদূর চিল্কাতীরেও বাংলার পদাবলী গীত হয়। উড়িয়া ভাষাতেও কীর্ত্তনের বহুপদ রচিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে ভাগবত সঙ্গীতকে ভজন বলা হয়, তাহার সুর, রীতি, ভঙ্গী ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

লীলাকীর্ত্তনের অপর নাম রসকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলায় কোন-না-কোন রসের (দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর) গভীর সংযোগ আছে—সেই সকল লীলার কথাই কীর্ত্তন গানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলায় ভাগবতী শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে—সে সকল লীলা অবলম্বনেও পদ রচিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল পদ লীলাকীর্ত্তনের উপজীব্য হয় নাই। গোবর্দ্ধন ধারণ বা কালীয়দমন কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত নয়। কীর্ত্তনসঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। কীর্ত্তনসঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলা বাদ গিয়াছে যাত্রা ও পাঁচালীতে তাহা স্থান পাইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ শ্রীচৈতন্যের

জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। ভক্ত কবিগণ শ্রীচৈতন্যের জীবনের সেই লীলাভিনয় অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলির নাম গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের সর্ববিধ লীলারসেরই গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে। যে লীলার কীর্ত্তন গাওয়া হয়—সেই লীলার সম্পূর্ণ অনুগত গৌরচন্দ্রিকা প্রথমে গাহিয়া কীর্ত্তনের আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে ধরাবাঁধা একটা পদ্ধতি বহুকাল হইতে কীর্ত্তনিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কীর্ত্তনসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন—খেতুরির উৎসবেই সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা গানের সূত্রপাত হয়। গৌরচন্দ্রিকার বিবিধ সার্থকতা সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি—তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা একেবারেই নাই—আছে কেবল মাধুর্য্যের কথা। সেজন্য প্রাকৃত প্রেমের গীতির সহিত এই গীতিগুলির বাহ্যতঃ কোন প্রভেদ নাই। গৌরচন্দ্রিকাই পদাবলীতে অপ্রাকৃত সার্থকতা দান করিতেছে। ঐগুলি রোমাণ্টিক ভঙ্গীতে একটা মিষ্টিক আবেদন আনিয়া দেয়।

কীর্ত্তনিয়ারা যখন পদাবলী কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহারা পদাবলীর রসের ব্যাখ্যাও করেন। এই ব্যাখ্যা সুরমুক্ত গদ্যবাক্যেও হইতে পারে, সুরযুক্ত বাক্য বা বাক্যাঙ্গের দ্বারাও হইতে পারে। ইহাকে বলে আঁখর বা অলঙ্কার। এই অলঙ্কার-প্রয়োগে ঘনীভূত রস অনেক সময় তরলায়িত হইয়া শ্রোতার আস্বাদ্যমান হয়। কোন কোন কীর্ত্তনিয়া নিজের রচিত অলঙ্কার প্রয়োগ না করিয়া চিরপ্রচলিত অলঙ্কারেরই প্রয়োগ করেন। ইহাই নিরাপদ। কীর্ত্তনিয়ারা নিজে রীতিমত লীলারসের রসিক না হইলে অলঙ্কার-প্রয়োগে দোষ ঘটিয়া যায়। এই দোষকে বলা হয় রসাভাস। রসাভাস ঘটানো একটা

বড় অপরাধ। লীলারসজ্ঞ শ্রোতা ইহাতে বড়ই বেদনা অনুভব করেন। ভাবানুগত সুরযুক্ত অলঙ্কারে কীর্ত্তন গানের মাধুর্য্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

পদাবলী গীতিকবিতা হিসাবে রচিত হয় নাই—কীর্ত্তনে উদ্‌গীত হইবার জন্যই রচিত। কীর্ত্তনই পদাবলীর বাহন। বাহ্য ও বাহন উভয়ে মিলিয়া যেমন আমাদের দেবপ্রতিমা, কীর্ত্তনের সুর ও পদাবলী দুইয়ে মিলিয়া তেমনি সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। পদকর্ত্তারা মনে মনেই হউক অথবা অনুচ্চ স্বরেই হউক গাহিতে গাহিতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কীর্ত্তনে গীত হইলেই সেজন্য পদাবলী সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। সেজন্য আমি পদাবলীকে অর্দ্ধ-সৃষ্টি বলিয়াছি। যিনি মহাজনদের কোন পদ পড়িয়া রস উপভোগ করিতে না পারেন, তিনি সেই পদ কীর্ত্তনে উদ্‌গীত হইতে শুনুন—তাহা হইলে পরিপূর্ণ রস পাইবেন। আর যদি কোন পদ পড়িয়াই রস পাইয়া থাকেন—কীর্ত্তনে শুনুন দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ রস পাইবেন।

কীর্ত্তনিয়া যে পদটি গান করেন সেই পদটিতে যতটুকু মাধুর্য্য তাহা নিঃশেষে পরিবেষণ করেন, যে বাক্যে আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য থাকে সেই বাক্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেন, যে পদে কবিত্বরস ঘনীভূত আছে, সেই বাক্যটিকে বারবার পুনরাবৃত্ত করিয়া শ্রোতার মর্ম্মস্থলে প্রেরণ করেন। এমন কি শব্দালঙ্কারগুলিতে খুব Emphasis দিয়া তাহার মাধুর্য্য শ্রোতাদের অধিগম্য করিয়া তোলেন। আর আবেগের আবেদন সুরের মূর্চ্ছনায় ও কণ্ঠের কাকুতে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী হয়, তাহা কোন কীর্ত্তন-রসিকের অবিদিত নাই।

লোচন দাস

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর বলিয়াছেন—

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥
পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে।
পীত বসন আর মুরলীটি চাহে ॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলে কোথা ছিলে গদ্ গদ্ বোলে ॥

নরহরির পদে গৌরগতপ্রাণ গদাধরই শ্রীরাধিকা। তাই তিনি বলিয়াছেন—

গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা কার সাধ্য করিবে বর্ণন।

সরকার ঠাকুর নিজে এবং মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বাসু ঘোষ ইত্যাদি অন্যান্য পার্ষদগণ শ্রীরাধার সখী ব্রজনাগরীদের মত নদীয়ানাগরী!

লোচনদাস ছিলেন নরহরি ঠাকুর-প্রবর্তিত এই নদীয়ানাগরীভাবের প্রধান সাধককবি। লোচনদাস আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন—"নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।" লোচনদাস এই নাগরীভাবকে সম্পূর্ণরূপে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই লোচনের রচনার ভাষায় ও ভাবপ্রকাশে ছিল একটা নাগরী ঢঙ। এই নাগরী ঢঙের জন্য বাঙলার পল্লীসমাজে প্রচলিত ধামালী ছন্দই তাঁহার রচনার প্রধান বাহন হইয়া উঠে। এই ধামালী বা ছড়ার ছন্দ চলতি ভাষার

ছন্দ, প্রবাদ-প্রবচনে, রসকলহে, ধামালী গানে, ছড়ায় এবং মঙ্গল কাব্যের পয়ারের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ইহা লঘুতরল বিষয়বস্তুর বাহন ছিল। লোচনদাসের পূর্ব্বে কেহ এ ছন্দকে সৎসাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যবহার করেন নাই। বিদ্বৎসমাজে লোচনদাসই প্রথম পদ-রচনায় ইহাকে গৌরব-দান করেন।

লোচনের পদাবলীর ভাষা আমাদের ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা। বাঙলার সাধারণ কুল-বধূদের ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি পদ-রচনা করিতেন। সেজন্য তাহাদের মর্ম্মের ভাষাই তাঁহার রচনায় স্বভাবতই আসিয়া পড়িত।

তিনি সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনাও করিয়াছিলেন, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ পদেই তিনি (বর্ত্তমান যুগের গদ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মত) সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। আভিজাত্যের অভিমান ও পাণ্ডিত্যের অভিমান—দুই-ই তাঁহার গোরাপ্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার রচনায় যে সকল অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও ঘরোয়া ধরণের, পল্লীগৃহিণীদের ঘরকরণা হইতেই সংগৃহীত। নবনী তোলা, দুধ আওটানো, দধির সাচনা দেওয়া, বাটনা বাটা ইত্যাদি গৃহস্থালির নিত্যকর্ম্ম হইতে তিনি পদের অলঙ্করণের উপাদান আহরণ করিয়াছেন।

লোচনদাস শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। যখন তাঁহার বয়স মাত্র দশ বছর, তখন গৌরাঙ্গদেব অপ্রকট হন, তাহাও বহু দূরদেশে—পুরীধামে। গুরু নরহরির মুখে তিনি তাঁহার অসামান্য রূপের কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহচরদের রচিত পদে ভক্তিগদ্‌গদ ভাব-মাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় বর্ণনার অপূর্ব্বতা নাই। তাঁহাদের বর্ণনা গৌরচন্দ্রিকায়

স্থান পাইলেও সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হয় নাই। লোচনদাস মনের লোচনে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আপন মনের মাধুরী দিয়াই গড়া। এই রূপই সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই রূপকে বাণীরূপ দেওয়ার জন্য লোচন কত উৎপ্রেক্ষা উপমাই না দিয়াছেন! কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই।

অমৃত মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িল গো এক কৈল সুধায় সুলেহ।
অখণ্ড পীযূষধারা কেবা আউটিল গো সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেণি তুলিল গো হেন বাসো গোরা অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি প্রেমের সাচনা দিয়া কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অনেক মহু লহু লহু কথাখানি হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি।

* * *

বিজুরি বাটিয়া কেবা গা-খানি মাজিল গো চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমিল গো অপরূপ রূপের লাবণি॥
ইন্দ্রের ধনুকখানি গোরার কপালে গো কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ও রূপ দেখিয়া যত কুলের কামিনী ছিল দু' হাতে করিতে চায় পাখা।
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সবার মনে দেখিবারে আঁখিপাখী ধায়।
আঁখির তিয়াষ দেখি সুখের লালস গো আলসল জরজর গায়।
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটায়ে কাঁদে কেহ থির নাহি বাঁধে গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড॥
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র কিবা মনে গণে রাত্রদিবা গোরারূপে লাগি গেল ধাঁধা।
অখিল ভুবনপতি ধূলায় লুটায়ে ক্ষিতি সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥

ছন্দোঝঙ্কারে, পদবিন্যাসের বৈচিত্র্যে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পারিপাট্যে ঝল-মল করিতেছে, এমন অনেক গৌরচন্দ্রিকার পদ

গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, রায়শেখর, ঘনশ্যাম ইত্যাদি কবিদের আছে, কিন্তু এমন রূপমুগ্ধতার সহিত প্রেমবিহ্বলতা সে সকল পদে যেন নাই। গোরার রূপ ইহাতে যতটা না ফুটিয়াছে, কবির সেই রূপ ফুটাইবার জন্য আকুলিবিকুলির ভাবটা তাহার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছলিত হইয়াছে। রূপচিত্রণ অপেক্ষা ভাবাবেগ-সঞ্চারের মূল্য পদাবলী সাহিত্যে ঢের বড় কথা। এই অলৌকিক রূপ-দর্শনের প্রভাবে ভাবের ঘরে কি কাণ্ড ঘটিতেছে, কবি সে কথাও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই একটি বাক্যে চরম কথাটি বলা হইয়াছে।

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে।

এখানে 'পুরুষ'—লক্ষ্যার্থে অভক্ত, 'নারী' লক্ষ্যার্থে ভক্ত একথাও মনে করা যাইতে পারে। এইরূপ চকিতে দেখিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন—

এমন কেউ ব্যথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভৈরে দেখি ও-রূপখানি।

একে ত' ভুবন-ভুলানো রূপ, তাহার উপর অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নর্ত্তন। সে নৃত্যলীলা দেখিয়া—

কারু—গলিত অম্বর তাহা না সম্বর কারো বা গলিত বেণী।
যেন—চিত্রের পুত্তলী রহে সবে মিলি দেখে গোরা গুণমণি।
কেহ ভাব ভরে পড়ে কারু কোরে নয়নে বহয়ে ধারা।
কারো বা পুলক অঙ্গে পরতেক কেহ মুরছিত পারা।

সমস্তই সাত্ত্বিক ভাবেরই লক্ষণ। নদীয়ানাগরীদের মারফতে ভক্তজনহৃদয়ে ভাব-সঞ্চারেরই কথা। ভাগবত আকর্ষণকেই দৈহিক রূপের মোহনতার ভাষায় সমগ্র পদটিকে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে।

নদীয়ানাগরীদের রূপমুগ্ধতা ব্রজনাগরীদের রূপমুগ্ধতারই অনুস্মৃতি; যেমন, নবদ্বীপলীলা ব্রজলীলারই অভিনবরূপে পুনরাবৃত্তি।

ব্রজনাগরীরা ও নদীয়ানাগরীরা একই কল্পলোকের অধিবাসিনী। তবু নদীয়ানাগরীরা ব্রজনাগরীদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি পরিচিতা। ব্রজনাগরীরা গোষ্ঠভূমিতে দধি মন্থন করে; নদীয়ানাগরীরা আমাদের গৃহের অলিন্দে হলুদ বাটে। হলুদ বাটিতে গিয়া এক নাগরী বলিতেছে –

হলুদ বরণ গোরাচাঁদে প'ড়ে গেল মনে।
ছন্‌ছনানি মনে গো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাটা,
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা॥

যমুনার ঘাটপথে শ্যামকে দেখিয়া ব্রজনাগরীদের যে দশা, গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গিয়া নদীয়ানাগরীদেরও সেই দশা। গাগরীভরণে গিয়া নাগরীদের কি দশা হইল, কবি তাঁহার নিজস্ব ভাষায় ধামালী ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন একটি পদে—

এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।
ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলাম তাই॥
সে রূপ দেখে চম্‌কে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে।
দু'টি নয়ন রইল বাঁধা গৌরপানে চেয়ে॥
জলের ঘাটটি আলো ক'রে গৌর অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নও যুবতীর ঘটা॥
সাধ কৈরে দেখ্‌তে গেলাম এমন কেবা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে প্রাণকে ধ'রে টানে॥
উড়ু উড়ু করে যে প্রাণ রৈতে নারি ঘরে।
গোরাচাঁদকে না দেখিলে প্রাণ যে কেমন করে॥

চাইলে নয়ন বাঁধা রবে মনচোরা তার রূপ।
হাস্যবয়ান রাঙা নয়ান এই না রসের কূপ ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপী কূল যে রবে নাই।
কুলশীল তুই রাখবি যদি থাক না বিরল ঠাঁই ॥
কুল খোয়াবি বাউরী হবি লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ ॥

আকর্ষণটা প্রাকৃত রূপের হইলে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিত না। আকর্ষণটা অপ্রাকৃত বলিয়াই রসিক ছাড়া অন্যে বুঝিবে না। ভণিতার চরণের দ্বারাই অর্থ টা বাচ্যাতিশায়ী হইয়া গেল।

বাচ্যাতিশায়ী অর্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাচ্যার্থেই লোচনদাস এই রূপমুগ্ধতার ভাষায় কিরূপ কবিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ২।৩টি নিদর্শন দেখাই—

(১) কিবা সে লাবণ্য রূপ বয়সে উথান।
চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান ॥
জলের ভিতরে ডুবি তবু দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় হৈল গোরা চাঁদপারা ॥
মনে করি নৈদে জুড়ি এ বুক বিছাই।
তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই ॥

(২) গোকুলের নেটো কান বঙ্কিম আছিল গো
কালিয়া কুটিল তার হিয়া।
রাধার পীরিতি ওরে সরল করেছে গো,
সেই এই বিহরে নদীয়া ॥

(৩) কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপ নিরূপণ।

রূপ নিরখিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিয়া বাউল হ'ল মন ॥
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই পায় না টের
যত দূর শক্তি উড়ি' যায়।
সেই রূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায় ॥

(৪) অরুণ কমল আঁখি তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবুডুবু কৃপামকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা চান্দে ছটা হেরি প্রাণ কান্দে
কত মধু মাধুর্যানুবন্ধে।
পুলক ভরল গায় ঘর্ম বিন্দু বিন্দু ভায়
লোমচক্র সোনার কদম্বে।
প্রেমে টলমল তনু প্রভাতের ভানু জনু
আধ বাণী প্রেমের আরম্ভে ॥

(৫) চরণতলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়।
চলতে টলে ঢ'লে ঢ'লে পড়ছে সখার গায় ॥
আমার পানে নয়ন কোণে চাহিল একবার।
মনহরিণী পড়ল বাঁধা ভুরুর পাশে তার ॥
যদি বাঁধে বিনোদ ছাঁদে চাঁচর চিকন চুল।
তবে সতী কুলবতী রাখতে নারে কুল ॥
যারে ডাকে নয়ন বাঁকে তার কি রহে মান।
যদি যাচে তায় কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ ॥

কবি তাঁহার স্বকল্পিতা নাগরীদের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

লোচন বলে ভাবিস্ কেন থাক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরা নাগর আটক ক'রে ধর।

ভক্তি-সাধনার পথে প্রথম প্রেমের বিহ্বলতা নদীয়ানাগরীদের রূপমুগ্ধতার ভাষায় কবি এই-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কবি বলেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' ইহাতে পরমধনের জন্য আকাঙ্ক্ষাটুকু জাগিল ইহাতে অস্বস্তি ও অস্থিরতার-ত বিরাম নাই। পরমধনকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর ধ্যানযোগের দ্বারা আপন করিয়া লইতে হইবে। ইহাই তপস্যা। এ তপস্যা না করিলে সে পরমেষ্ট ধন অধিগত হইবে না। ব্রহ্মস্পর্শলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে—তাহাতে ব্রহ্ম-পিপাসারই সঞ্চার হয়। এই পিপাসা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য সাধনা বা তপশ্চরণে প্রেরণা দেয়। সে ব্রহ্মস্পর্শেরও মূল্য কম নয়। যিনি তাহা লাভ করেন, তিনি ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী। লোচন তাঁহার কল্পিতা ভাগ্যবতীদের বলিয়াছেন, "এইবার ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যান ধারণা কর। অবশ্যই তাঁহাকে পাইবে। ঐ সাধনাতেই অপ্রাপ্তির সকল বেদনা, অস্থিরতা, আকুলতা শান্ত হইয়া যাইবে।" লোচন একজন নাগরীব মুখ দিয়া ঐ কথাই ঠারেঠোরে বলিয়াছেন—

আর এক নাগরী বলে এই দেশে না র'বো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো॥
এ দেশে ত' কপাট দিলে সেই দেশই ত পাই।
বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই॥
সাপের মণি বা'র করিলে হারাই যদি মণি।
মণি হারাইলে তবে না বাঁচে সেই ফণী॥
যতন ক'রে রতন রাখা বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে বা'র করিলে চৌকি দিতে হয়॥

লোচন বলে ভাবিস কেন ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥

লোচন নদীয়ানাগরীদের রূপানুরাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই পদটিতে দিয়া রূপ হইতে ভাবের ঘরে গিয়া আত্মসমাহিত হইতে বলিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলার ভাবসম্মেলনের তাৎপর্য্যও ইহাই। বাঙলার বাউলরা লোচনের কাছে এই শিক্ষাই পাইয়াছিল।

লোচনদাস ব্রজলীলার পদ বেশি লেখেন নাই। যে পদগুলি পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, সেগুলিতেও লোচনের সেই নাগরী-ভাবের মুদ্রাঙ্ক আছে। লোচনের পদে শুধু সখী-ভাবের ভণিতা নয়, সমগ্র পদের ছন্দ, ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবই বৃন্দাবনের আভীররমণীর উপযোগী। এখানে আক্ষেপানুরাগের একটি পদ উৎকলন করি—

জ্বালার উপর জ্বালা লো সই জ্বালার উপর জ্বালা।
জলকে যাই পথ না পাই বসন টানে কালা॥
সরম কর্‌্যা ভরম কর্‌্যা বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা ধরে আমার হাতে॥
রস করিতে জানে যদি তবেই মনের সুখ।
গোপন কথা বেকত করে এই যে বড় দুখ॥
ঢলমল্যাকে চতুর বলি হেঁটমুড়্যাকে জপু।
রস জানিলে রসিক বলি—নৈলে বলি ভেপু॥
লোচন বলে আলো দিদি এহ বল্‌লি কেনে।
কালার সমান রসিক নেই এ তিন ভুবনে॥

বাংলার রাঢ় অঞ্চলের যে রাধা সঙ্গিনীদের সঙ্গে বৈকালবেলা জলকে চলে—ইহা যেন সেই রাধার উক্তি। লোচন বৃন্দাবনকে বাংলার ঘাটে, মাঠে, বাটে টানিয়া আনিয়াছেন। রাধাকে 'দিদি'

সম্বোধন করিতে আর কোন পদকর্ত্তা পারেন নাই। পদকর্ত্তারা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র পদের ভণিতায়,—লোচন পদ রচনা করিতেন একেবারে সখীভাবে আবিষ্ট হইয়া। লোচনকে সেকালের বৈষ্ণব সাধকরা বলিতেন "ব্রজের বড়াই।"

লোচনের ব্রজলীলার আর একটি বিখ্যাত পদ :—

এসো এসো বঁধু এস আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলায় পরি
ফুল নও যে মাথার করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
বঁধু, তোমায় যবে পড়ে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুলিলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পদটি উৎকলন করিয়া 'কমলাকান্তের দপ্তরে' একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ভণিতার কথা উল্লেখ করেন নাই। কোন কোন কীর্ত্তনিয়া চণ্ডীদাসের ভণিতা লাগাইয়া এ গান গায়। নানা পুঁথিতে নানা ভণিতায় এ পদটিকে দেখা যায়। কিন্তু এ পদ লোচনদাসের, অন্য কাহারও নয়। 'ব্রজের বড়াই' ছাড়া রাধাকে রন্ধন-শালায় আর কে পাঠাইবে? চণ্ডীদাসের রাধা পশারিণী বটে, কিন্তু রাঁধুনী নয়। আমরা শ্রীখণ্ড অঞ্চলে এ পদকে লোচনের বলিয়াই জানি॥

সজনি,—এ ধনি কে কহ বাটে।
গোরোচনা গোরি নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥

এই পদটি নিমানন্দদাসের পদরসসার ও কমলাকান্ত দাসের পদ-রত্নাকরের পুঁথিতে লোচনদাসের ভণিতায় আছে। পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে। এই পদেরই দুইটি চরণ :—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।

এই পদ যদি লোচনের হয়, তাহা হইলে ব্রজলীলার পদাবলী-রচনাতেও লোচনকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতে হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, লোচনের ব্রজলীলার বহু পদ চণ্ডীদাস বা অন্য কবির নামে চলিয়া গিয়াছে।

দামোদর, নরহরি ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া এবং মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে লোচন চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। লোচনের অভিপ্রায় ছিল না জীবনচরিত রচনা, তিনি শ্রীচৈতন্যের মহিমাপ্রচারের জন্য গুরু নরহরির আদেশে কাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাব্য অনেকটা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ধরণেই রচিত।

মঙ্গল কাব্যগুলিতে প্রধান চরিত্র গুলি শাপভ্রষ্ট দেব-সন্তান। দেবতারা আপন আপন পূজাপ্রচারের জন্য, হয় তাহাদের শাপভ্রষ্ট করাইয়াছেন—নয়ত তাহাদিগকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজেই অবতীর্ণ হইয়াছেন নিজের পূজাপ্রচারের জন্য। ভগবান নিজে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া 'আপনি আচরি' ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইলেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য কোন দিনই চাহেন নাই—তাঁহার নিজের পূজা প্রচারিত হউক বরং তিনি আবিষ্ট অবস্থায় যাহাই বলুন, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বা বাহ্য দশায় বলিয়াছেন—তিনি সাধারণ মানুষ, তিনি

একজন বৈষ্ণব ভক্তমাত্র। কিন্তু নরহরি, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ ইত্যাদি ভক্তেরা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পূজাই প্রচার করিলেন,—পৃথক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজারও আর প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইহাই গৌরপারম্যবাদ। তাঁহাদের মতানুসারী বৈষ্ণবগণ পরে শ্রীকৃষ্ণের বদলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহই মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লোচনদাস এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই মহাকবি। ফলে, তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গলের মতই একখানি মঙ্গল কাব্যের রূপ ধরিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের মত ইহারও প্রারম্ভে নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি আছে। মঙ্গলকাব্যের মত ইহাতেও দেবতা ও মানবের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের কথা আছে। সূত্র খণ্ডটি দেবতাদের লইয়াই রচিত। নারদ গোলোক, ব্রহ্মলোক ও কৈলাসে ছুটাছুটি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতারণের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছেন। অনেক জল্পনাকল্পনার পর নবদ্বীপধামে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। সূত্রখণ্ডের সমস্তটাই মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশের মত দেবদেবীর লীলা-প্রসঙ্গ লইয়া রচিত।

মঙ্গলকাব্যের মত ইহা গ্রামে গ্রামে গীত হইত। একজন বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়কের গৃহেই লোচনের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্য-চরিতগুলির মধ্যে একমাত্র চৈতন্যমঙ্গলই মঙ্গলকাব্যের মত গায়নদের সম্পত্তি ছিল।

গৌরভক্ত কবিরা তাঁহাদের কাব্যে গোরার জন্য কতই না অশ্রুপাত করিয়াছেন! কিন্তু গোরার ত' আধ্যাত্মিক বিরহ ছাড়া কোন বেদনা ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনাই ত' কবিচিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিবার কথা। শচীমাতার

অন্যও যে-কবিদের চিত্ত বিগলিত হইয়াছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তাঁহাদেরও চিত্ত বিগলিত হয় নাই। লোচনদাসই একমাত্র কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনা যাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে সবচেয়ে বেশী।

কবি চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বরজনীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট হইতে চিরবিদায়ের চিত্রটি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস তাহাতে দোষ ধরিয়া বলিয়াছিলেন—উহা অমূলক কল্পনামাত্র। বৃন্দাবনদাস ছিলেন চরিতকার, তিনি লোচনদাসের মত কবি ছিলেন না। তাই কবি তাঁহার কল্পনয়নে যে পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। চিত্রটি এই:—

দুনয়নে বহে নীর ভিজিয়া হিয়ার চীর বক্ষ বহিয়া পড়ে ধার।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে বার বার॥
শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দাও হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি!
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিয়া যায় হিয়া আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে তাঁহার স্বামী ভগবান নহেন, মানুষ। তাই তাঁহার চরণে এই নিবেদন। শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে কত বুঝাইলেন, সংসারের অনিত্যতা, জীবজগতের কল্যাণ, মহাব্রত উদ্‌যাপন ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠিল। শেষ পর্যন্ত তিনি যে মানুষ নহেন, জীব-উদ্ধারের জন্য ভগবানই অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাহাতেও বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিবুদ্ধি ঘুচিল না।

'তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ নিরখিয়া পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতর ক্রন্দন তাহাতেও থামে না। তখন চৈতন্যদেব—

"প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি কোলে করি করিলা প্রসাদ।"

স্বামীর আদর পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে মায়া বলিয়া মনে করিয়া বিভূতির কথা ভুলিয়া গেলেন। প্রিয়তম দ্বিভুজে বুকে

জড়াইয়া যে আদর করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার চিত্তে চিরদিনের নিত্যসঙ্গী হইয়া রহিয়া গেল। লোচনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার কেবলা মধুর রতির কথা বলিয়াছেন যেমন বৃন্দাবনদাস শচীমাতার কেবলা বাৎসল্য-রতির কথা বলিয়াছেন।

যে-সকল বৈষ্ণবকবি চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়াকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়াই যে রাধা। বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে চৈতন্যের সন্ন্যাসই নবদ্বীপলীলার মাথুর। বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন মাধুর্য্যের আনন্দলোক হইতে ঐশ্বর্য্যলোকে প্রয়াণ, নদীয়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমনও চৈতন্যের পক্ষে তাহাই। গৌরনাগরিয়া ভাবের কবিরা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া মাথুরসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি গভীর সমবেদনা এই সঙ্গীতগুলিকে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে—বিষ্ণুপ্রিয়া রাধার মত ভাববিগ্রহ নহেন, রক্তমাংসের চিরবিরহিণী কুলবধূ। বাসু ঘোষ বলিয়াছেন :—

অক্রূর আছিল ভালো রাজবলে লৈয়া গেল রাখিল সে মথুরানগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহার সংবাদ পায় ভারতী করিল দেশান্তরী॥

কবি ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনাকে রাধার বিচ্ছেদ-বেদনার চেয়ে অধিকতর শোকাবহ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা পদগুলিতে তাঁহার বিরহিহৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্পর্শী আবেদন ধ্বনিত হইয়াছে। লোচনদাস, ভুবনদাস ও শচী-নন্দনদাসের বারমাস্যা কবিত্বের দিক্ হইতে অতুলনীয়। ভুবনদাস

ও শচীনন্দনদাসের পদ দুইটি শব্দের চয়নে ও বয়নে, ছন্দের চাতুর্যে, ভঙ্গীর মাধুর্যে, বাগ্‌বিন্যাসের পারিপাট্যে গোবিন্দদাসের পদের মতই অনবদ্য। লোচনদাসের বারমাস্যা সাধারণ পয়ার ছন্দে সরল স্বাভাবিক ভঙ্গীতে রচিত,—বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মতই নিরাভরণা,—'বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।' গভীর আবেদনের বাস্তবতা ইহাকে মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তের চোখে গৌরাঙ্গের রূপ বাস্তবতাবর্জ্জিত। বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের চোখে তাঁহার আসল রূপটি বৈশাখের আবেষ্টনীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকলি বসনের কোঁচা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুঞি জীবোঁ কোন ছান্দে॥

জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলায় গঙ্গা হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া যখন স্নান করিয়া কলস ভরিয়া জল আনিতেন, তখন প্রত্যেক পদক্ষেপে পথের ধূলার তীব্র তাপ তিনি অনুভব করিতেন। তখন নিজের ব্যথাকে নগণ্য মনে করিয়া প্রভুর কথাই তিনি ভাবিতেন :

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপতসিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছটফট করে যেন জল বিনু মীন॥

শীতের দিনেও বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে ঐরূপ চিন্তাই জাগিয়াছে :—

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা॥

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন—রাম বনবাসে গিয়াছিলেন সন্ন্যাসী হইয়া। কই,

সীতাকে ত' গৃহে রাখিয়া যান নাই, তবে তুমি এমন করিলে কেন?

আবার বর্ষা-রজনীতে—

কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া সে কথাও গোপন করিতে চাহেন না।

বাস্তবনিষ্ঠ কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দিয়া এমন একটি কথা বলাইয়াছেন, যাহা অন্য কোন কবি বলিতে বা বলাইতে সাহস করেন নাই। সে কথাটি এই,—

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি॥

পৃথিবীর পক্ষ হইতে ক্ষতিবৃদ্ধি যাহাই হউক, বিষ্ণুপ্রিয়ার কোলে যদি একটি শিশুও থাকিত, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিঃসঙ্গ জীবনে কতকটা সান্ত্বনা হইত—ইহাই ব্যঞ্জনা।

নবদ্বীপ-লীলাকেই যে-সকল বৈষ্ণব সাধকগণ চরম লীলা মনে করেন—তাঁহাদের পক্ষ হইতে লোচনদাস একটি কথা বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুযোগের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নয়।"

অর্থাৎ প্রভু, তুমিই ত' বলিয়াছ, কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুমি দুর্দ্দান্ত সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসধর্ম্ম হরণ করিয়াছ, তুমি মনে প্রাণে জানো—সন্ন্যাসের চেয়ে সংকীর্ত্তন ঢের বড় ধর্ম্ম, তবে কি শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই তুমি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে?

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মেলনের গৌরগীতিকা লোচনদাসেরই লিখিবার কথা। হয়ত তিনি লিখিয়াছেন, সে পদ আমরা আজিও পাই নাই।

জগদানন্দের পদাবলী

পদকর্ত্তা জগদানন্দের জন্ম হয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুরপরিবারে। ইনি বিখ্যাত ভক্ত রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর। ইনি একটি পদে আত্মপরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

খণ্ডবাসিয়া খণ্ডকপালিয়া জগদানন্দ ভাষই।

জগদানন্দ সাধক ভক্ত ছিলেন। ভক্তগণের একটা লক্ষণ, তাঁহাদের যাহা কিছু সম্বল তাহাই সমর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতার উপাসনা করেন। যেমন—যাঁহার সৌকণ্ঠ্য আছে, সঙ্গীতে দক্ষতা আছে, তিনি সঙ্গীতের দ্বারাই উপাসনা করেন। চিত্রকর ভক্ত হইলে চিত্রাঙ্কনের দ্বারাই ইষ্ট-দেবের উপাসনা করেন। কবির ত' কথাই নাই। এই কবিদের মধ্যে যাঁহার পদ-বিন্যাস-কৌশলই প্রধান সম্বল, তিনি পদবিন্যাসের চাতুর্য্যের দ্বারাই ইষ্টদেবের সেবা করেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের অনেকে তাই সুনির্ব্বাচিত সুললিত শব্দ-কুসুমের মাল্য গাঁথিয়া শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারবেশ রচনা করিয়াছেন। জগদানন্দ সেই শ্রেণীর বৈষ্ণব কবি। এজন্য তিনি অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অনেক আয়োজনও করিয়াছেন।

তিনি এজন্য 'ভাষা-শব্দার্ণব' নামে একখানি পদকোষ রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের পুঁথির কতক অংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই পদ-কোষে তিনি অ-কারাদি-ক্রমে আনুক্রমিক শব্দ-সংকলন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত যে সকল শব্দের মিল বা মিত্রাক্ষরতা হইতে পারে, এমন সকল শব্দও চয়ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পদরচনা-কালে তিনি এই পদ-কোষের সহায়তা গ্রহণ করিতেন।

জগদানন্দের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য তাই অনুপ্রাসসমৃদ্ধ শ্রুতিসুখকর

পদলালিত্য। এই পদগুলির মধ্যে ভক্তিরস বা কাব্যরস হয়ত প্রভূত নাই। পদগুলি এক-একটি বর্ণবৈচিত্র্য-ময় পুষ্পের মত ইষ্টদেবতার উদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে। জীবের ভোগের জন্য চাই মধু, দেবতার চরণে অঞ্জলির জন্য পুষ্পে মধুর প্রয়োজন হয় না, এমন কি গন্ধ না হইলেও চলে, চন্দনই তাহার ক্ষতিপূরণ করে, কিন্তু বর্ণবৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে, কবি তাহাই বুঝিতেন। জগদানন্দ ছিলেন রূপের পূজারী। যে ফুলে রূপ নাই—তাহা তাঁহার অঞ্জলিতে স্থান পায় নাই।

এই পদগুলি মানুষের ভোগেও লাগে, যখন এইগুলি সুগায়কের কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়। সুগায়কের কণ্ঠে পদগুলি মধুগন্ধ আহরণ করিয়া মানুষেরও উপভোগ্য হইয়া উঠে। কুঞ্জভঙ্গের পালায় যাঁহারা 'অকরুণ পুন বাল অরুণ' পদটি উদ্‌গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিবেন। ঐ পদটির অর্থবোধ করা সহজ নয়, শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে পদটির অর্থ অপরিচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তবু উহা শুনিয়া রসজ্ঞ শ্রোতারা কতই না আনন্দ পান। ইহাকেই বলে অপ্রবুদ্ধ উপভোগ। পদের শব্দলালিত্য গায়নকণ্ঠের সুরমূর্চ্ছনাকে সহায়তা করে, তাহাতে গায়নকণ্ঠে মধুক্ষরণ হইতে থাকে। তাহাই শ্রুতিপথে নিপীত হইয়া শ্রোতার চিত্তে রসোদ্রেক করে।

জগদানন্দের বিখ্যাত গৌরচন্দ্রিকার পদ—

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু—হেমমহীধর শিখরে চামর দেই উর পর' ডারি॥
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ।
জনু—কনয়াভূধর বেঢ়ি বিলসই সুরতরঙ্গিণী গঙ্গ॥
আধ অম্বর আধ সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
জনু—জলদসঞে অভি বাল রবি ছবি নিকসে অধিক উজোর॥

জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ লখই ঐছন ছন্দ।
জনু—মীনকেতন করু নির্ম্মঞ্ছন চরণে দেই দশ চন্দ ॥

জগদানন্দ ভাবের কবি নহেন, রূপের কবি। তিনি স্বপ্নে শ্রীচৈতন্যের যে রূপ দর্শন করিয়াছেন, সেই রূপকে পদসৌষ্ঠব ও আলঙ্কারিক সুষমার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গকে যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—তাঁহারা আদর্শ ভক্তের রূপেই তাঁহাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কবিরা গৌরাঙ্গকে পাইয়াছেন অবিসংবাদিতরূপে অবতীর্ণ ভগবানরূপে। তাঁহারা আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া গৌরাঙ্গের দিব্যরূপ রচনা করিয়া লইয়াছিলেন। জগদানন্দ সেই কবিদের একজন।

তাহা ছাড়া, জগদানন্দ গৌরনাগরিয়া ভাবের প্রবর্ত্তক নরহরি ঠাকুরের বংশজ ও অনুবর্ত্তী। কাজেই তাঁহার শ্রীচৈতন্য সনাতনের 'হরিরিহ যতিবেশঃ' মুণ্ডিতমৌলি সন্ন্যাসী নহেন, নদীয়ানাগর,—যাঁহার চরণে মীনকেতন 'দশচন্দ্র দীপে নির্ম্মঞ্ছন' করে। হেমগিরির অঙ্গে সুরতরঙ্গিণীর মত যাঁহার কণ্ঠে শুভ উপবীত বিলম্বিত।

গৌরনাগরিয়া ভাবের পরমসাধক লোচনদাসের মত জগদানন্দও বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনায় ব্যথিত। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসই ইঁহার মতে মাথুর, বিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা। বিষ্ণুপ্রিয়ার সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নস্মৃতিই ইঁহার কয়েকটি রচনায় মাধুর্য্য সঞ্চার করিয়াছে।

সিংহভূপতি "রে রে পরম প্রেম সজনি"—ইত্যাদি পদে বিরহিণী রাধার ভাবলোকে পুনর্মিলন-স্বপ্নটিকে অপূর্ব্ব রূপ দান করিয়াছিলেন—জগদানন্দ সিংহভূপতির অনুকরণে একই ছন্দে বিষ্ণুপ্রিয়ার পুনর্মিলন-

স্বপ্নের (ভাবোচ্ছ্বাসের) যে রূপ দিয়াছেন, তাহা রীতিমত বাস্তব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে এবং আরও সরসমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। অনুকরণ অনুকৃতকে পরাস্ত করিয়াছে। পদটি এই—আলিরি……

হোত মনহুঁ উলাস সুলছন বাম নিজভুজ উরোজ ঘন ঘন
ফুরই দূর সঞে প্রাণ পিউ কিএ অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব আগেনি লেখ সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ সবহুঁ ভাওব রে॥
ত্রিপথগামিনী তীরে পিয় যব অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজি কুচ-কলস জোড় আ-গোরে সাজব রে॥
তবহি হিয় মাহ হার পহিরব বেণী ফণিমণিমাল বিরচব।
চলব জলছলে কলস লেই সব কেলেশ ভাজব রে॥
নদীয়াপুর জয়তুর বাওব হৃদয়তিমির সুদূর ধাওব,
ভকত নখতর মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে॥
গৌর-আঁগ যব আঙনে আওব ঘুঁঘুট দেই তব নিকট যাওব
নয়নজলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে।
রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব,
কছু, বিরস ভৈ কছু সরস দৈ দশ দোখে দোখব রে॥
পীন কুচ কর-কমলে পরশব খীন তনু মঝু পুলকে পূরব
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে।
বাহু গহি তব নাহ সাধব সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধুই সুধাময় অধর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে॥
মীনকেতন সমরে চেতন হীন হোয়ব নিশি নিকেতন,
অবি-রোধ বিনু অনুরোধ পিউ পরবোধ পাওব রে॥

(প্রচলিত ভাষায় রূপান্তর)

সখি রে— হৃদয়ে উল্লাস এ বড় সুলখন,
কাঁপিছে বামভুজ উরোজ ঘন ঘন,
তবে কি প্রাণপ্রিয় আসিছে দূর হ'তে আবার এই নদীয়ায় ?
যখন প্রভু মোর ত্যজিবে পরদেশ
পাঠাবে আগে হ'তে লিখন-সন্দেশ,
তখন বরণের ভূষণ চারু বেশ শোভন হবে মোর গায়।
সখি রে— গঙ্গাতীরে যবে আসিবে প্রিয়তম,
বারতা তার কেহ শুনাবে কানে মম,
অগুরু চন্দনে উরোজ-ঘটযুগ তখন সাজাইব রে ॥
তখন পুন হার পরিবে হৃদি মম,
রচিব মণি দিয়া কবরী ফণিসম,
চলিব জল ছলে কক্ষে গাগরীটি কাঁকণে বাজাইব রে ॥
সখি রে— নদীয়াপুরী যবে বাজাবে জয়তূরী,
আমার হৃদয়ের আঁধার যাবে দূরি'
ভক্ততারাগণ মাঝারে দ্বিজরাজ যখন হবে শোভমান।
যখন প্রিয়তম আসিবে অঙ্গনে
ঘোমটা টানি শিরে মিলিব তাঁর সনে
ধুইব সেই কলধৌতসম পদ আঁখির জল করি দান ॥
সখি রে— পশিবে যবে প্রিয় শয়নগৃহে আসি'
বসিব পিছু ফিরি তাহার পানে হাসি'
বিরস হ'য়ে কভু সরস হ'য়ে কিছু দূষিব দশদোষে তায়।
পীবর কুচ করকমলে পরশিবে,
এ ক্ষীণ তনু মোর পুলকে হরষিবে,

রুষিব রস রাখি মুদিয়া র'ব আঁখি বলিয়া না—না রসনায়।
সখি রে— বাহুটি ধরি যবে সাধিবে মোর স্বামী,
তখন ধরা দিব সময় বুঝি আমি,
অধর সুধাময় পিইলে প্রিয় তায়:পিয়াব মিটাইয়া সাধ।
লীলার কৌতুকে চেতনাহীন রহি
করিব নিশি ভোর তাহারে বুকে বহি
বিরোধ বহিবে না কি কাজ অনুরোধে, প্রবোধে দিব পরসাদ॥

প্রোষিত প্রিয়তমের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় এই যে সুখস্বপ্নের মানসচিত্র, ইহা সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশের রসিকসমাজে সমান সমাদর পাইবার যোগ্য। ইহার অপূর্ব্বতা তাহাতেও নয়। এই স্বপ্নকল্পনার ব্যঞ্জনায় যে গভীর কারুণ্য তাহাই ইহাকে অনন্যসাধারণতা দান করিয়াছে। রাধিকার এইরূপ স্বপ্নচিত্রও করুণ সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনই আমরা ভাবি, তাহা ত শ্রীভগবানের লীলারই অঙ্গ, রাধার বিরহে তখন আর কারুণ্যের নিবিড়তা থাকে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বপ্নচিত্রের কারুণ্য আমাদের মর্ম্মকে আকুল করিয়া তোলে, যখনই ভাবি শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীধাম হইতে আর ফিরেন নাই, আর বিষ্ণুপ্রিয়া বাঙ্গালী ঘরের নিতান্ত অসহায়া সরলা কুলবধূমাত্র, নিত্যধামের মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি নহেন।

রূপের কবি জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের রূপের যে অনবদ্য বাঙ্ময় চিত্রগুলি রচনা করিয়াছেন সেগুলিও অতুলনীয়। যেমন—

১। জয়তি গোকুল গ্রামে শ্যামর নাম নব যুবরাজ।
চপল বনফুলদাম কামক ধাম জাহু বিরাজ।

খীন কটিতটে চীনভব অতি পীন পীতিম বাস।
বদনে বিলসিত ইন্দু বিকসিত কুন্দনিন্দুকহাস।

পর্ব্বে পর্ব্বে আদ্য মিলগুলি ছন্দকে হিল্লোলিত করিয়াছে!

২। উলাসিত অলিক স-কম্পিত চুম্বনে কম্পই সুললিত মাল।
অধর সুধাকণ মিলিত সমীরণে বাওই বেণু রসাল।
ভাবিনী সরম ভরম ভয় ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ-চিতে নিতি নিতি বিহরতু ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

৩। মৌলিমিলিত শিখিশিখণ্ড চলকুণ্ডল ললিত গণ্ড,
জলধর জনু ডগমগ তনু জগজন মনোহারী!
মদনসদন বদন ইন্দু নিরখি যুবতি হৃদয়সিন্ধু—
ছল ছল দিঠি জলছলে কিএ উছলি পড়ত বারি ॥
খঞ্জন গতি গরব ভঞ্জ অঞ্জনযুত নয়ন কঞ্জ,
অবিচলকুল কুলযুবতিক কুল টলমলকারী ॥
লাখ লখিমী করত আশ জগদানন্দ নবীন দাস
রাতুল থল জলরুহদল পদতল বলিহারি ॥

এইরূপ একই কথা সব কবিই বলিয়াছেন—তাহাতে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই জগদানন্দের। কত মধুর করিয়া সে কথা বলা যায় জগদানন্দ তাহাই লক্ষ্য করিতেন। রাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুকুলিত পূর্ব্বরাগ জগদানন্দের ভাষায় কিরূপ পুষ্পিত লইয়াছে তাহার একটু দৃষ্টান্ত দিই—

বিহসি অঞ্চলে রোপ গোপই আধকুচ দরশায়।
থোরি বয় সখে গোরী মঝু মন চোরি রাখল ছাপায়।
শ্রবণে বচনহিঁ বদন অধরহিঁ দশন নয়ন ভুলায়।
নাসা সৌরভে আশা মাতল পরশরস তনু চায়।

ব্রজনারীগণ 'দেহদীপতিতে' বনের তিমির নাশ করিয়া কনকনূপুর বাজাইয়া কিঙ্কিণীকঙ্কণে ঝঙ্কার তুলিয়া অভিসারে চলিয়াছেন—ইহা যেন কুলশীল লাজকে পরাভব করিয়া বিজয়যাত্রা। কবি শব্দের ঝঙ্কারে ভূষণ-ঝঙ্কারকে যেন প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন—

মঞ্জু বিকচ কুসুম কুঞ্জ মধুপশব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত-কঞ্জনয়নী খঞ্জন অনুকারী।
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভরি অনঙ্গ,
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ কালিদমনদমন রঙ্গ,
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল সাড়ী॥

সমস্ত পদটিতে ভূষণশিঞ্জন যেন অনুরণিত হইতেছে। গোবিন্দদাসের মত জগদানন্দ ক, খ, গ,—ইত্যাদি-ক্রমে একাক্ষরের অনুপ্রাসে সমগ্র পদও রচনা করিয়াছেন। এগুলিতে বাহ্যচিত্র-গীতের চাতুর্য্যেরও চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন কবি। যেমন—খ ও গ অক্ষরের—

১। খোলি খাপসেঁ খড়্গ খরতর মদন মারত ধাবই।
খসঞে খীন শশী খসি কি খিতি পড়ি রাহুভয়ে গড়ি যাবই।
খেদ কি কহিব খিপত সমগতি খনহি খল খল হাসই।
খণ্ডকপালিয়া খণ্ডবাসিয়া জগত আনন্দ ভাষই॥

২। গাম গোকুল গোপ গৃহ সঞে গোপ নাগরী ধায়।
গিরিগোবর্দ্ধন গহন গহ্বর গেহগরভে লোটায়।
গুরুক গঞ্জন গভীর গরজন গারি ভয় নাহি মান।
গৌরীগণ সঞে সপিনী মনে মনে গরল গর নব কান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগদানন্দের কুঞ্জভঙ্গের দুইটি পদের তুলনা নাই। শব্দালঙ্কারের পরাকাষ্ঠা এই দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আভরণের আতিশয্য কবিত্বের আবরণ হইয়া উঠে নাই।

রাধাকৃষ্ণ সারা রাত্রি রসলীলা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া শেষ রাত্রির দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, অথচ তাঁহারা অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন। চারিদিকে পশুপক্ষী জাগিয়া উঠিয়াছে, গোকুলের নরনারী জাগিয়া পথে চলাচল করিতেছে, সখীরা মহাপ্রমাদ গণিল—জাগাইতেও মায়া হইতেছে, অথচ না জাগাইলেও চলে না। কাজেই 'বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুরুগণ গতি কহই মন্দ।' কবির চিত্তেও যুগপৎ সরসতা ও বিরসতা দুই ভাবই জাগিতেছে। জাগরণীগীতি দুইটিতে সখীস্থানীয় কবির মনে ভাবদ্বন্দ্বে উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। কবির কুঞ্জভঙ্গের দুইটি মাত্র পদ আছে—দুইটিই একই ছন্দে একই ভাব অবলম্বনে রচিত। কিছু কিছু অংশ এখানে উৎকলন করি—

(১) উদিতারুণ হসিত মলিন মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন
হৃত সায়ক দুখ দায়ক রতিনায়ক ভাগে।
ফুকরত শুক সারিক দুহুঁ কোকিল কুল কুহরই মুহু
দেখ ভাবিনি গজগামিনী নহি কামিনী জাগে।
কহ সহচরি শ্রবণ ওর পরিহর ধনি হরিক কোর
কিএ দোষব তব তোষব যব রোষব রাগে॥

(২) অকরুণ পুন বাল অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ্মিনিক সদন সাজে।
গলিত ললিত বসন সাজ মণিযুত বেণি ফণি বিরাজ
উচ কোরক রুচ চোরক কুচজোরক মাঝে॥

তড়িতজড়িত জলদভাঁতি দুহুঁ শূতি সুখে রহল মাতি
জিনি ভাদর রসবাদর পরমাদর শেজে ॥
বরজ কুলজা জলজনয়নি ঘুমল বিমলকমলবয়নি
রতি-লালিস-ভুজ বালিশ আলিস নাহি তেজে ॥

কুঞ্জভঙ্গের উৎকণ্ঠার চেয়ে রাধার বর্ষাভিসারে কবির উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। কারণ, কবির আরাধ্য শ্রীচরণ এখানে ব্যথিত।

যো পদ শরদ কোকনদ দলহিঁ ধূলি পরশে সীতকার।
উচ নীচ কিচ বীচ অব সো পদ কৈছনে করব সঞ্চার।
[শরতের কোকনদসম যেন রাঙাপদ ধূলিতেও করে যে শীৎকার,
উঁচু নীচু কাদা পথে সে পদ এ কুহুরাতে কি প্রকারে করিবে সঞ্চার ?]

সকারণ মান খুব সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেই ঘুচিয়া যায়। অনিদান মান বড় সাংঘাতিক। অথচ গভীর প্রেমে কবির স্বপ্নে অনিদান মান অনিবার্য্য। যে সত্য সত্যই ঘুমায় তাহাকে জাগানো সোজা, কিন্তু ছল করিয়া যে ঘুমায় তাহাকে জাগানো শক্ত। এরূপ মানের হেতু না পাইয়া সখীরা মানিনীকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ধিক্কারের একটি পদ এখানে তুলি—

তুয়া বিনা আন স্বপনে নাহি জানত তুহু বন্ধু কণ্ঠক মালা।
সো রস গুণনিধি তাক জীবন বধি কি সিধি সাধলি বালা ॥
মানিনি কি তুয়া হৃদয় কঠোর।
সো হেন পুরুষবর উপেখিতে অন্তর দরবিত না ভেল তোর।
কত নব যুবতী সুমূরতি রসবতী ইতি উতি পড়ু নিতি পায়।
বিনি অপরাধে দোখ বিনি রোখসি এ দুখ কহব মু কায়।
রসবতী মাঝে কবহু নাহি বৈঠসি না বুঝলি পীরিত-রীত।
জগদানন্দ তোয়ে কত সমুঝায়ব মাথে শপতি দেই নিত ॥

ইহাতেই শ্রীরাধার হাসিয়া ফেলিবার কথা। যে পীরিতের পরে আর 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' হয় না, সেই পীরিতির মূর্ত্তিমতী নায়িকা রাধা 'পীরিতরীত' শিখিবেন সখীদের কাছে আর কবির কাছে? রাধা ইহাতে না হাসিয়া রহিলেন কি করিয়া?

জগদানন্দের রাধার মান অনিদান হইলেও সহজেই ভাঙ্গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের একটি দীর্ঘনিশ্বাসের তাড়নাতেই মানের জলদ সরিয়া গিয়া রাধার মুখচন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে—

মানজলদ সঞে নিকসয়ে মুখশশী কানুক দীর্ঘনিশাসে।

যেটুকু বাকি ছিল তাহা—

কনয়াচলরুচ উচকুচ চুচুকে সরসাই পরশহিঁ নাহ।
মানক লেশ শেষ রসসূচক আধমুদিত দিঠি চাহ॥
অধর সুধারস পিবইতে যব ধনি বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দ ভণ তবহুঁ সফল করু হরিমন মনসিজ বাধা॥

জগদানন্দ বাংলায় বেশী পদ লিখেন নাই। তাঁহার রচনারীতিতে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বস্বর প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল, ছন্দের হিল্লোলসৃষ্টির জন্য। প্রভৃত অনুনাসিক-বর্ণযুক্ত যুক্তাক্ষরেরও প্রয়োজন ছিল, অতি-পরিচিত শব্দগুলিকে এড়াইবার জন্য। এজন্য তিনি ব্রজবুলিকেই তাঁহার কবিশক্তির বাহন করিয়াছিলেন। শুকসারিকাদ্বন্দ্বেরও একটি বাংলা পদ আছে। খাঁটি বাংলা ভাষা ছাড়া এ দ্বন্দ্বকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বন্দ্ব বেশ জমে নাই, কারণ, শুক সব শুনিয়া একপ্রকার পরাভব স্বীকার করিয়াই সন্ধি করিয়া বসিল।

শুক কহে সারী কি কর দ্বন্দ্ব দোঁহে সমগুণ কে বলে মন্দ
জগদানন্দ পরমানন্দ রসবতী রসরাজে॥

আর একটি বাংলাপদ স্বপ্নবিলাসের। গৌরাঙ্গ যে শ্রীকৃষ্ণেরই

অবতার—এই কথাই কবি কৌশলে বলিয়াছেন। এ বিষয়ে কবি শ্রীখণ্ডের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন—গৌরাঙ্গকে রাধাভাবাবিষ্ট কল্পনা করেন নাই, রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপকল্পনাও করেন নাই। পদটি এই—

নিধুবনে দুহুঁ জনে চৌদিকে সখীগণে শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে রসমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি কাঁদি কাঁদি কন বঁধু পাশে ॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ এক যুবা গৌরবরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি শত কোটিকাম রসরাজ রসের সদন ॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি নাচে গায় মহামত্ত হইয়া।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি মন ধায় তাহারে হেরিয়া ॥
নবজলধর রূপ রসময় রসকূপ ইহা বই না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্বিত কহ নাথ ইহার কারণে ॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে বিপরীত মন না হইল কদাচন এ গৌরাঙ্গ ধরে মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনী মূর্চ্ছাপ্রায় হ'ল জনি বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি মুখ চুমে বেরি বেরি হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥

নদীয়ানাগরী ভাব লইয়া নরহরি-লোচনের মত জগদানন্দ বাড়াবাড়ি করেন নাই বটে, তবে তিনি যে ঐ 'গণের'ই একজন, তাহার ইঙ্গিত মাঝে মাঝে আছে। যেমন—

১। হেরই যাকর কচরুচি বিগলিত কুলবতী হৃদয়দুকূল।
সো কি এ পামরী চামরী ঝামর চামর সমতুল মূল ॥

২। যাহা হেরি সুরপুরনারী নয়ন ভরি বারি ঝরব অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ তাহা কি ধিরজ ধর দ্বিজবর কুলক কুমারী।

৩। কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুলগৌরব গৌরক সৌরভে চৌরসদৃশ ভেল মোয়।

জগদানন্দের পদের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু অল্পসংখ্যক পদেই তিনি প্রায় সকল ছন্দেরই নিদর্শন দিয়াছেন। নিম্নে যে ছন্দটির নিদর্শন উৎকলন করা হইল, শশিশেখর ছাড়া অন্য কবির রচনায় সে ছন্দ বড় একটা দেখি নাই।

ব্রজ কুলজ কামিনী জিতল তনু দামিনী
মধুসূদন বিধুবদন মধুসূদন (ভ্রমর ?) লোভা।
বর শরদ যামিনী বিহরে গজ গামিনী
উরু জিতল গুরু কদল তরু যুগল শোভা॥
চলল গজগামিনী মধুর মধু যামিনী
মীন দিঠি খীন কটি চীন ধটি জাগে।
মিলিত মধু ভাষিণী ললিত মৃদু হাসিনী
কনকরুচ ললিত উচ যুগল কুচ ভাগে॥

নীরস পয়ারে গৌরাঙ্গের বাল্যশিক্ষার কথা অনেকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাও যে অপূর্ব্ব ছন্দোবন্ধে কত সরস করিয়া বলা যায় জগদানন্দ তাহা দেখাইয়াছেন।

দিন দিন অপরূপ শচীর কুমার।
ত্রিজগত তাত তাতমাত আচরু বালক কাল উ- চিত ব্যবহার॥
লিখিত ধরণীতল তদনু তালদল আদি কাদি বরণাবলী আর।
জানল অলপ কলাপ আলাপন পঞ্চ অবদে সব শবদবিচার॥
বেদ বিভেদ খেদ করু পড়ি পড়ি সকল নিগম আগম ফল সার।
পহিল বিচারে সপই যশ জগজন দীগবিজয়ী জগত জয়কার॥

রায় শেখর

পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শেখরভণিতা-যুক্ত সমস্ত পদগুলিকেই রায়শেখরের পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদ যেমন নিজের নামের ভণিতায় ছন্দের প্রয়োজন-মত 'রাম' বাদ দিয়া শুধু 'প্রসাদ' কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন, 'শেখর" তেমনি চন্দ্রশেখর, শশি-শেখর এইরূপ কোন নামের অংশ হওয়াই স্বাভাবিক। কবিশেখর নাম নয়—উপাধি। শেখর তাহার অংশ হওয়া স্বাভাবিক নয়। অতএব বিদ্যাপতি-কবিশেখরই হউক—আর বাংলার কোন কবিশেখরই হউক তাঁহাদের উপনামের অংশ এই 'শেখর' নিশ্চয়ই নয়।

রায় শেখর ও শেখর যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সতীশ বাবু সব চেয়ে বড় প্রমাণ দিয়াছেন নিম্নলিখিত যুক্তিতে—

"শেখর-ভণিতার সকল পদের সহিতই রায়শেখরের পদের সৌসাদৃশ্য আছে এবং ঐ পদগুলি সমস্তই রায়শেখরের স্বকৃত পদের দ্বারা পূর্ণ দণ্ডাত্মিকা নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।" বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে নিতান্ত গায়ের জোরে শেখরের পদগুলিকে বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়াছেন, সতীশবাবু তাহারও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পদকল্পতরুর ভূমিকাটা পড়িলেই দেখিতে পাইবেন।

একটী পদের ভণিতায় আছে—

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবি শেখর গতি নাই আর ॥

এই কবিশেখর কে? রঘুনন্দনের চরণবন্দনা হইতেই বুঝা যায় ইনি রায় শেখর। রায় শেখরই শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। তবে

কি কবিশেখর রায়শেখরেরই উপাধি এবং কবিশেখরের সংক্ষিপ্ত রূপ শেখর? না, এখানে "কহে কবি শেখর"—কবি এখানে শেখরের সঙ্গে সমাসবদ্ধ পদ নয়। কবিশেখর ভণিতার পদগুলির ২।৪টি বিদ্যাপতিরও হইতে পারে। কিন্তু এ নামে বাঙ্গালা পদও যে অনেক। এ কবিশেখর কে? যেখানেই কবিশেখর ভণিতা আছে—সেখানেই কি "কবি" কথাটা শেখরেরই বিশেষণস্থানীয়? এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। কবি শেখর রায় যে কবি রায়শেখর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই: রায় শব্দেই তাহার প্রমাণ। আমার এই আলোচনায় কবিশেখর—ভণিতার পদগুলিকে সংশয়াত্মক বলিয়া বর্জ্জন করিলাম। তবে যেখানে একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তুর পদ-মালার মধ্যে অঙ্গীভূত কোন পদে কবিশেখর ভণিতা আছে, সেখানে সে পদকে কবি বিশেষণ-যুক্ত শেখরের পদ বলিয়াই ধরা হইয়াছে।

শেখর বৃন্দাবনের সকল লীলার পদ লেখেন নাই, লিখিলেও আমরা পদকল্পতরুতে পাই না। প্রধান প্রধান পদকর্ত্তারা যে প্রকরণগুলির পদ রচনা করিয়াছেন, ইনি সেগুলি কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। ইনি দুই একটি অপ্রধান প্রসঙ্গ লইয়াই অনেক পদ রচনা করিয়াছেন, এইগুলি অষ্টকালীন নিত্যলীলার মধ্যে পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শেখরের পদে রঙ্গলীলা, স্নানভোজন, বনে দেবপূজা, রাধা-যশোমতীর বাৎসল্য-লীলা, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, রাধাকৃষ্ণের বনভ্রমণ, ঝুলনলীলা, নৃত্যগীতোৎসব, নিশাজাগরণ, কুঞ্জভঙ্গ, বটুবেশে শ্রীকৃষ্ণের ছলনা, বংশী হরণ ও বংশীসন্ধান ইত্যাদি অপ্রধান লীলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শেখরের অধিকাংশ পদ এই সকল অপ্রধান বিষয় অবলম্বনে রচিত। লীলাকল্পনায় শেখরের কিছু মৌলিকতা, বাস্তবতা ও লৌকিকতা আছে, কিন্তু এইগুলিতে যশোদার মাতৃহৃদয়ই সব চেয়ে চমৎকার

ফুটিয়াছে। এইগুলি পড়িলে শেখরকে প্রধানতঃ বাৎসল্যরসের কবিই বলিতে হয়।

রায়শেখর ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। একটি বাংলা পদে তিনি রাধা-শ্যামের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। পদটি খাঁটি বাংলায় রচিত হইলেও কবি ব্রজবুলির পদের মত দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্থলে স্থলে রক্ষা করিয়াছেন; যেমন—

"আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি।"

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে মণ্ডিত চরণটি সুরচিত। চাঁদ এখানে শ্যামের ললাটে চন্দনের ফোঁটা, রবি এখানে রাধার ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা।

রায়শেখরের অভিসারোৎকণ্ঠার নিম্নলিখিত পদটি চমৎকার। বর্ষার দুর্দ্দিনে শ্যাম সঙ্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন, রাধা গুরুজনভয়ে গৃহে রহিয়া শ্যামের জন্য ভাবিয়া আকুল। রাধা দুর্গমপথ ও কুলিশপতনের ভয় করে না, গুরুজনের দারুণ নয়নকেই ভয় করে। এই পদে রাধার দারুণ উৎকণ্ঠা রসরূপ লাভ করিয়াছে অতি অপূর্ব্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে।—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ-পাতন-শবদ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হমারি কান্ত নি-তান্ত আগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

নগেনবাবু এই পদে রায়শেখরের স্থলে কবিশেখর বসাইয়া বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবিশেখর বসাইলে যে ছন্দঃপতন হয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। একেবারে শেখর উড়াইয়া 'বিদ্যাপতি কবি বচনে অভিসর'—করিলেই পারিতেন, মিল না হয় না-ই হইত! এই পদের ভণিতাও বিদ্যাপতি কবির ভাবের অনুবর্ত্তী নয়। বরং বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত—'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটীর 'বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমায়ব'—স্থলে 'ভনহু শেখর কৈসে গোঙায়ব' পাঠ যে হরেকৃষ্ণ বাবু ও সুকুমারবাবু পুঁথিতে পাইয়াছেন—তাহাই যথার্থ মনে হয়। এই পদের ভাব, ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বর্ষাবিরহের ঐপদটীর এমনই সগোত্রতা আছে যে উহাকে শেখরের পদ বলিয়াই মনে হয়।

অভিসারোৎকণ্ঠার আর একটী পদ—

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধারা।—ইত্যাদি পদটী গোবিন্দদাসের 'অম্বরে ডম্বর, ভরু নব মেহ' পদের অনুস্মৃতি।

রায়শেখরের দানলীলার পদে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই—ইহা সম্পূর্ণ মামুলি প্রথায় শ্যামবিদূষণ মাত্র। কেবল ভণিতাটি সুন্দর—

একই নগরে ঘর দেখাশুনা আট পর তিল আধ নাই আঁখিলাজ।

রায়শেখরে কয় রাজারে না করে ভয় এদেশে বসতি কিবা কাজ॥

রায়শেখরের বংশীধ্বনির দুরন্ত প্রভাব অবলম্বনে দুইটি পদ আছে। পদদুইটিতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

রায়শেখরের ব্রজবুলিতে রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির মধ্যে 'নাচত নগরে নাগর গৌর' পদটি সুরচিত।

মাহিষ দধি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাস বিলাস।

জিতল পুলক কদম্ব কোরক অনুখন মনভোলনী॥

অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মঁজীর রঞ্জ
নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী ॥
বদন চৌদিগে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম
অমিয়াঝরণ মধুর বচন কত রসপরকাশনি ॥
মহাভাবরূপ রসিকরাজ শোহত সকল ভকত মাঝ,
পীরিতি মুরতি ঐছন চরিতি রায়শেখর ভাষণী ॥

কবি শ্রীচৈতন্যের পরিধেয় বসনের শুভ্রতার উপমা দিয়াছেন মাহিষ দধির শুভ্রতার সহিত এবং স্বেদবিন্দুশোভিত বদনকে উপমিত করিয়াছেন মুক্তাদামমণ্ডিত কনক কমলের সঙ্গে।

৬+৬ মাত্রার তিনটি চরণের শেষে ১০ মাত্রার চরণ বিন্যাস করিয়া এই যে স্তবক-বন্ধন ইহা গোবিন্দদাস ও জগদানন্দের পদেই দেখা যায়। এই পদের ছন্দ, শব্দঝঙ্কার ও ভাষার দ্বারা ইঁহাদের সঙ্গে রায়শেখরের সগোত্রতা অনুসূচিত হয়। নিকুঞ্জকুটীরে গীতোৎসবের বর্ণনায় কবি ঠিক এই ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি স্তবক উৎকলন করি—

ফূলি অনিল বহন ধীর ফূলি চলই যমুনাতীর
ফূলি কানন ফূলি মদন ফূলি বয়নি শোহিনী।
ললিতা কহত মধুর বাত কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গ ভঙ্গ সরসরঙ্গ কহত শেখরমোহিনী ॥

রায়শেখর ভণিতা নাই—বোধহয় রায় শব্দ ব্যবহারের ঠাঁই নাই এখানে বলিয়াই। ছন্দের জন্যই ভণিতার আক্ষরিক তারতম্য হয়।

গৌরচন্দ্রিকার আর একটি চমৎকার পদ—

কুন্দন কনককমলরুচিনিন্দিত সুরধুনীতীরবিহারী।
কুঞ্চিতকণ্ঠকলিতকুসুমাকুল কুল-কামিনী-মনোহারী ॥

জয় জয় জগ-জীবন যশ ধীর।

জাহ্নবি যমুনা যেন জলধার বরিখন ঐছে নয়নে বহে নীর।

পহুমিনি পুরুষ-পিরিতি পুলকায়িত পরিজন-প্রেম পসারি।

পহিরণ পীত পট নিপতিতাঞ্চল পদপঙ্কজ-পরচারী।

রসবতী-রমণি-রঞ্জন রুচিরানন রতি-পতি রঞ্জিত তায়।

রসিক-রসায়ন রসময় ভাষণ রচয়তি শেখর রায়॥

জগদানন্দী বা গোবিন্দদাসী অনুপ্রাসের ঘটা আছে এই পদে।

গুরু রঘুনন্দনের উদ্দেশে তিনি চমৎকার ভক্তিগর্ভ একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদটি এই—

শ্রীবৃন্দাবন-অভিনব স্থমদন শ্রীরঘুনন্দন রাজে।

লাখ লাখ বর বিমল সুধাকর উয়ল শ্রীখণ্ড-সমাজে॥

জয় পহুঁ নটন-কলা-রস-ধীর।

নিখিল-মহোৎসব গৌর-গুণার্ণব প্রেমময় সকল শরীর॥

রুচির তরুণতর নটবরশেখর পীতাম্বর-বর-ধারী।

গাই-গাওয়ায়ত গৌর-গুণামৃত ভব-ভয়-খণ্ডনকারী॥

পদতল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল পদ-নখ-বিধু পরকাশে।

সে পদ রজনি দিনে শয়ন স্বপন মনে রায়শেখর করু আশে॥

উদ্ধবের একটি পদে আছে রঘুনন্দন যখন বালক ছিলেন—তখন গোপীনাথকে নাড়ু খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন মুকুন্দের পুত্র, নরহরিদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই রঘুনন্দনকেই রায় শেখর গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙা পায় শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।

রায়শেখরের বাৎসল্যরসের পদই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি পদের কিয়দংশ উৎকলন করি—

হিয়ার আগুনি ভরা আঁখি বহে বহু ধারা দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘরপর যে না জানে সে জনা চলিল বনে এ তাপ কেমনে স'বে মায় ॥
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জনি সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাঁপে।
বাড়ব অনল প্যারা বিষম রবির খরা কেমনে সহিবে হেন তাপে ॥
কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড় শুনিতে সিঞ্চিয়া পড়ে গায়।
শিরীষকুসুমদল জিনিয়া চরণতল কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥

ঠিক এই ছন্দেই এই ভাষাতেই গোষ্ঠগামী বলাইএর উত্তর পরেই আছে পদকল্পতরুতে।

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না ভাবিহ দুখ। ইত্যাদি

এইপদে কেবল 'শেখর' ভণিতা আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়—শুধু 'শেখর' ভণিতারও বহুপদ রায়শেখরেরই।

রায়শেখরের—'সখীগণ কর্ত্তৃক বংশীহরণের' কতকগুলি পদ আছে—পদগুলি একত্রে মিলিয়া একটি অবিচ্ছেদ দীর্ঘ কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদগুলির মধ্যে কেবল একটিতে 'রায়শেখর' ভণিতা আছে—বাকিগুলিতে ভণিতা আছে শেখর। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয়, যেখানে পাঁচ কিংবা ছয় মাত্রার প্রয়োজন হইয়াছে—সেখানেই তিনি রায়শেখর ভণিতা দিয়াছেন, আর যেখানে তিন কিংবা চারি মাত্রার প্রয়োজন সেখানে শুধু 'শেখর' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

যশোদা রাধাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লইয়া বলিতেছেন—

ধাতার মাথায় বাজ যেবা হেন করে কাজ আমারে ভাণ্ডিল কোন দোষে।
বাছার বিবাহ তরে হেন নারী নাহি পুরে চাহিয়া না পান কোন দেশে।
যশোদা বিষাদ-কথা শুনি বৃষভানুসুতা বদনে বসন দিয়া হাসে।

পুলকে পূরল গা মুখে না নিঃসরে রা রাধিকা তোমার হেন জানি।
সখা সব পূরে বেণু খিড়িকে ডাকিছে ধেনু সাজাও রাখালশিরোমণি ॥

যশোদার উক্তি, রাধার মুখে কাপড় দিয়া হাসি এবং রসকর্ত্তার বিষয়ান্তরে যশোমতীর চিত্তাকর্ষণ সবে মিলিয়া একটা রসের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীরাধার প্রতি যশোদার মাতৃমমতা এই পদগুলিতে যেরূপ পরিস্ফুট পদাবলী সাহিত্যে আর কোথাও তেমনটি নাই।

মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনঘন। স্তনক্ষীরধারে অঙ্গ করয়ে সিঞ্চন ॥

বাৎসল্যরসই যে মধুররসের লালনাঙ্গ এই পদগুলিতে তাহার ইঙ্গিত আছে। নন্দযশোমতীর গার্হস্থ্য চিত্রে গোপগণের ও গোপপতির গৃহের আবেষ্টনীটি পরিস্ফুট হইয়াছে অতি সুন্দর ভাবে।

শেখরের দূতীসংবাদের নিম্নলিখিত পদটি বড়ই করুণ। পদটির বৈশিষ্ট্য—রাধা কেবল নিজের বেদনার কথাই মধুপুরে দূতীর মারফতে প্রেরণ করিতেছেন না, শ্রীদাম, সুবল, যশোমতীর কথাও স্মরণ করাইতেছেন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মুই এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরুশাখায় রৈল শারী শুকে।
মোর দশা পিয়া যেন শুনে এর মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর হরিণী রঙ্গিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥

শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহার সবার সনে পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাইক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥

শেখরের পদে আলঙ্কারিতার বাড়াবাড়ি নাই। বাঙলা পদগুলির ভাষা নিরাভরণ স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। ব্রজবুলির পদগুলিতে চিরপ্রচলিত অলঙ্করণ কিছুকিছু আছে—অলঙ্কারপ্রয়োগে গোবিন্দ-দাসের মত মৌলিকতা কোথাও বড় নাই। নিম্নলিখিত পদে রাধাশ্যামের রূপবর্ণনায় চণ্ডীদাসের অনুসরণে তিনি কতকগুলি উপমানের সমবায়ে একটা অপরূপ রূপের আভাস দিতে চাহিয়াছেন—

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর-কিশোরী রূপ পসারই সরস রসের কূপ।
অরুণ-কিরণে মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে।
চান্দের ভরমে চকোর মাতল ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
চান্দের উপরে চান্দ পেখলুঁ ইন্দুর উপরে শশী।
প্রেমের আবেশে পিয়া রস-সুধা খঞ্জন-যুগল পশি॥
যমুনাতরঙ্গে অরুণ উদয় তারার পসার তথা,
অরুণ ঝাঁপিয়া তিমির রহল কিয়ে অদ্‌ভূত কথা।
কনকলতায় সুমেরুশিখর ঘনের জনম তায়।
ঘনের লতায় মুকতা ফলিল কেবা পরতীত যায়।
সে রাধামাধব রসের বৈভব কহিতে শকতি কায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়॥

শেখরের অভিসার পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি প্রসিদ্ধ। পদটি পড়িতে পড়িতে গোবিন্দদাসের বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমই পদটির উৎকর্ষের নিদর্শন!

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ গজগতি চলিলহিঁ থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার। গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন ভার॥
কমলিনি মাঝা খিনি উচ কুচ-জোর। ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা। নব অনুরাগিণি নব-রসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার। নূপুর-কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলা-কমল উপেখলি রামা। মন্থর-গতি চলু ধরি সখি শ্যামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা। শেখর অভরণ চলল বহন্তা॥

চিত্রদর্শনে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের যতগুলি পদ আছে, তাহাদের মধ্যে শেখরের 'রহ রহ সখি ভালো ক'রে দেখি আঁখি না পিছলে মোর' পদটি চমৎকার। চিত্রদর্শনে রাধার যে অপ্রকৃতিস্থ ভাব ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা রেখাবর্ণেও চিত্রণের যোগ্য।

রায়শেখরের কুঞ্জভঙ্গের পদেও কবিত্ব আছে। রজনী শেষ হইয়া আসিতেছে—আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাধাশ্যামের "গরগর অন্তর ঝরয়ে নয়ান।"

নিশবদে শূতল নিন্দ নাহি ভায়। বিয়োগ বিয়াধি বিথারল গায়॥

ইহাও একশ্রেণীর প্রেম-বৈচিত্ত্য। কাল রাধাশ্যামেরও কাকুতি শুনে না—রাত্রি প্রভাত হইল। বিদায় লওয়ার সময় হইল। কবি বলিয়াছেন—

ভীতক চীত পুতলি সম দুঁহু জন রহলি বিদায়ক বেলা।
প্রেমপয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু চেতনে অচেতন ভেলা॥

দুহুঁ জন চীত রীত হেরি সহচরী ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনী পোহায়ল সব জন জাগল সে ডরহি অধিক ডরায় ॥

'রাধাশ্যাম ত অচেতন চেতনে,' সহচরীরাই বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

শেখরের সম্ভোগের পদ বৈশিষ্ট্য-শূন্য। কিন্তু রসোদ্‌গার ও আক্ষেপ অনুরাগের পদে মাধুর্য্য আছে। রসোদ্গারের নিম্নলিখিত পদটি খুবই প্রসিদ্ধ।

মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে—পিছিলা ঘাটে সে নায়।
(মোর) অঙ্গের জল-পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া ধায় ॥
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।
(মোর) নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া নেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরে সে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সেদিন সেদিকে থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু বুঝে অনুমানে ॥

আক্ষেপ অনুরাগের নিম্নলিখিত পদটি চমৎকার।

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু সে কাল গেল বৈয়া ॥
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করি তা রৈয়া।
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত কিছু বনে।
নাগরীর সনে নাগর হৈলা আর সে চিনিবা কেনে ॥
কুলি বেড়াইয়া নাম লৈয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া ॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলুঁ কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কভু কালা ॥

আর একটি পদের এখানে উল্লেখ করি—

হেমজ্যোতি বরতনি ঐ তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥
চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখছ কি।
কানুকোলে কড়ি খেলে কোন রাজার ঝি॥
মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর।
পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর॥
পরের বোলে সেজন ভোলে কি বলিব তারে।
চড়ি গাছে ভ্রূকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে॥
শেখর রুষি কহে হাসি ধনী আগেয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আন॥

আরও একটি পদ—

পাইয়া বাঁশি নাগর হাসি বসি সভার পাশে।
সকল বালা চাঁদের মালা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে॥
হৈয়া শীতল কামে বিকল রাধাকানুর মন।
মদন কলা কহে বালা পাইয়া বিরল বন॥
চতুর সখী দোঁহায় রাখি কেলিবিলাসঘরে।
ছলা করি আইলা সরি ফুল গাঁথিবার তরে॥
তবে যুবতী নাগরী তথি নাগর করি কোলে।
মদন দুখী শেখর সুখী তিতিল আঁখের জলে॥

উল্লিখিত তিনটি পদ লোচনদাসের ভঙ্গীতে লেখা। পদের ভাষা চল্‌তি বাংলা; প্রথমটির ছন্দ লঘুত্রিপদী ও ধামালির মাঝামাঝি। দ্বিতীয়টি ধামালী ছন্দেই লেখা। রচনার ভঙ্গীতে এগুলি রায়শেখরের বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়টিতে পাঁচ মাত্রার ত্রিপদী ও ধামালির

মাঝামাঝি বলিতে হয়। ইহাতে অনুমিত হয়—সকল প্রকার ছন্দ ও ভাষাবিন্যাসে রায়শেখরের দক্ষতা ছিল।

শেখরের কোন কোন পদে বেশ রসকৌশল আছে। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে কুঞ্জভবনে রাধার সহিত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করিয়া স্বগৃহে প্রভাতে নিদ্রিত। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইতেছেন।

উঠহ বাছনি মু হাত নিছনি আলস করহ দূর।
তোর সখাগণে ভরিল ভবনে উদয় হইল সূর॥
রামের বসন পরিলা কখন কে নিলে বসন তোর।
রাতা উৎপল নয়ন যুগল কি লাগি দেখিয়ে ভোর॥

[রামের বসন অর্থাৎ নীলাম্বর অর্থাৎ রাধার বসন। অন্ধকার রজনীতে কুঞ্জভবনে রাধার সঙ্গে বসনের বিনিময় হইয়া গিয়াছে।]

দীন চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের যে প্রভেদ দণ্ডাত্মিকার অষ্টকালীন নিত্যলীলার পদাবলীর সঙ্গে রায়শেখরের অন্যান্য পদেরও সেই প্রভেদ। দণ্ডাত্মিকার ঐ পদগুলিতে বর্ণনাচাতুর্য্য আছে কিন্তু কলামাধুর্য্য নাই। দুইজন কবি যে পৃথক্ তাহা মনে করিবার কারণ যে একেবারে নাই তাহা নয়। দীন চণ্ডীদাসের পদের মত স্থলে স্থলে কবিত্বও আছে।

রায়শেখরের পদের ভণিতাগুলি সুন্দর—বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদে পদকর্ত্তা নিজেকে সখাস্থানীয় কল্পনা করিয়া যশোদাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। ব্রজলীলার অন্য পদগুলির ভণিতায় প্রধানতঃ সখীভাবের কথাই আছে। যত প্রকারে পরিচর্য্যা দৌত্য ও আনুগত্য সম্ভব, শেখর কবি তাহাদের কোন চর্য্যাই বাদ দেন নাই এই ব্যাপারে শেখরের মৌলিকত্ব আছে।

১। শেখর ধোয়ায় সখড় হাত। কহিতে অবশ আউলায় গাত। রাধা ভোজন করিয়াছেন—সখীভাবাপন্ন পদকর্ত্তা তাঁহার এঁটো হাত ধোয়াইয়া দিতেছেন।

২। স্বেদবিন্দু দেখি দুহুঁজন গায়। শেখর করু তহি চামর বায়॥

৩। দুহুঁজন জাগল অতি ভয় পাই। হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই। সখীদের ডাকাডাকিতে প্রাতে রাধশ্যামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শেখর হাসিতে হাসিতে দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

৪। শেখর সত্বর হৈয়া আসল ডাবর লৈয়া আচমন করাবার আশে।
বিলাসমন্দির মাঝে রচিল পালঙ্ক শেজে তাম্বূলসম্পুট তার পাশে॥

শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সমাপ্ত—শেখর ডাবর লইয়া হাজির হইয়াছেন, আর
দুহুঁ মেলি শূতল অলসল গায়। দুহুপদ সেবয়ে শেখর রায়॥

৫। রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে বসিলা রাজার ঝি।
সব সখীগণ যোগায় যোগান শেখর যোগায় ঘী॥

৬। শেখর কেবল কুঞ্জভঙ্গে দ্বার খুলিয়া দেন না। বিদায়ের সময় আসন্ন বলিয়া তিনি বিচ্ছেদও ঘটান।

শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব দুহুঁ সঙ্গ-ভঙ্গ করায়।

৭। শেখর রাধার মঙ্গলের জন্য জটিলার মৃত্যু কামনাও করে—
শেখর আগে বর মাগে শুন দিবাকর।
সে-না বুড়ী মরুক পুড়ি রাখ রাধার ঘর॥

যে পদগুলির ভণিতায় সখীভাবের দ্যোতনা নাই—সেগুলি আরো সুন্দর। ১। কহে কবি শেখর রায়। ধরম সরম কভু ও রস নিভায়?

২। মন্দ পবন মলয় শীতল কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।

৩। কহয়ে শেখর বন্ধুর পীরিতি কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে॥

ভাবসম্মেলন

পদাবলীসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে পরিণাম-রমণীয় করিয়াছে ভাবসম্মেলন। কবি অনন্তদাস বলিয়াছেন—

দাবানলে পুড়ে ফুল বিথারল যৈছে লবঙ্গলতা।

শ্রীমতীর দুর্বিষহ বিরহে আর্ত্ত গৌড়জনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন কবিদের এই ভাবসম্মেলনের সমাবেশ।

ভাবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন নিত্যমিলন। বৈষ্ণবকবিরা রসসম্ভোগের জন্য 'ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ' দিয়াছিলেন। এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন অন্যভাবে—অরূপ লীলারস-সম্ভোগের জন্য রাধাকৃষ্ণ এই দুই রূপে প্রকট হইয়াছিলেন তারপর লীলান্তে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) 'রূপ আবার ভাবের মাঝারে' ছাড়া পাইল—'অসীম সে সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা অসীমের মাঝে হারা হইল।' বৃন্দাবনের রূপলীলাই বিরহ, রূপের ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসম্মেলন। এই মিলনই নিত্যমিলন। এই মিলনের আনন্দই ভাবসম্মেলনের প্রধান উপজীব্য।

জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন—'এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া কেমনে আছিলা তুমি'? বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।

রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"প্রিয় বস্তু হৃদয়ের ভিতরকার বস্তু, তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে।" ইহাইত বিরহ! সেইজন্য তাহাকে ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় হইতে রাধাকে, রাধার হৃদয় হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বাহির

করিয়াছেন বৈষ্ণব কবিরাই। ইহাতেই ত বৃন্দাবনলীলা। সমগ্রলীলা হিয়ার ভিতর হইতে বহিষ্কারিত হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের হিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার নামই ভাবসম্মেলন। এই সম্মেলনের সম্ভোগই চরম সম্ভোগ। ইহাকেই কবিরা বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। বৃন্দাবনে সকল লীলাই মিলনান্ত—কিন্তু সকল মিলনের সম্ভোগই সংকীর্ণ, সকল মিলনেই ব্যবধানজনিত বিষাদের ছায়া থাকে। ভাবসম্মেলনের আর কোন ব্যবধানের মলিনচ্ছায়া নাই—তাই ইহাই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। ইহা ছাড়া সকল মিলনই বিরহান্ত, মিলনের পর আবার বিরহ আসিবেই। তাই—"দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" কিন্তু ভাবসম্মেলনের পর আর বিরহ নাই। লীলার মঞ্জরীই নিত্য মিলনের শিলাঘাতে ঝরিয়া পড়ে—লীলান্তের পর আর বিরহের ভয় নাই। এই ভাবসম্মেলনের আসল তথ্য বিদ্যাপতি বিরহের একটি পদে বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই।"

অনুখণ প্রিয়তমের চিন্তা করিতে করিতে তদ্গতা শ্রীমতী প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মক হইয়া গিয়াছেন, দ্বৈত ব্যবধান আর নাই। এই সোঽহং-ভাবইত ভাবসম্মেলন। ইহাতে ত দিব্যানন্দের সঞ্চারের কথা। কিন্তু বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ইহাতে 'বাঢ়ত বিরহক বাধা।' ইহার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রাধিকার হ্লাদিনী সত্তা মাধবের সঙ্গে একাত্মক হইয়াছে তাহাতে তাঁহার জীবসত্তার ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাই বিরহ দ্বিগুণিত হইল। দ্বৈতলীলার কবি জীবসত্তার কথাই কাব্যে রূপ দান করেন। সে জন্য কবি বিরহবৃদ্ধির

কথাই বলিয়াছেন। রাধার এই জীবসত্তাই আমাদের মানবিক সত্তা। আমাদের আনন্দ ভাবসম্মেলনে নয়, লীলাসম্ভোগেই আমাদের আনন্দ।

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

এই হ্লাদিনী ব্রহ্মে সংহৃত হইলে আমাদের ব্রহ্মবিরহ ঘটে। এই বিরহের কথাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন। যে লীলানন্দ উপভোগের জন্য ব্রহ্মের নররূপধারণ, তাহা বস্তুতঃ মানবিক আনন্দ, তাহাতে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দভোগের চেয়ে এই বেদনান্তরিত বিরহের দ্বারা উপচিত আনন্দের তীব্রতা ঢের বেশী—নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলোআঁধারি, এমন কি মাঝে মাঝে আঁধারও যেমন স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। সেই জীবসত্তার তীব্র আনন্দ ভক্তগণকে দান করিবার জন্য ব্রহ্মের হ্লাদিনীর সহিত দ্বৈতব্যবধান। ব্রহ্মের এই সাধ যখন মিটিয়া গেল, তখন আমাদের জীবসত্তায় হাহাকার পড়িয়া গেল। মানবিক-লীলার মধ্যে যাহাকে আমরা হৃদয়ের কাছাকাছি পাইয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহা যখন অনন্ত অসীম পরমব্রহ্মে পরিণত হইল, তখন আমরা তাহার বিরহে তাহার মিলনতৃষ্ণায় আকুল হইলাম। আমরা বৃন্দাবনলীলায় তাঁহাকে পাইয়াছিলাম বিনা তপস্যায়। তপস্যার সূত্রপাত ঐ ভাবসম্মেলন হইতেই। বৈষ্ণব কবিরা বৃন্দাবনেই ভাবসম্মেলন দেখাইয়াছেন, কিন্তু সমস্ত বৃন্দাবনধামকে আর তাহাতে যোগ দেওয়াইতে ত পারেন নাই। নিম্নলিখিত কবিতায় এই কথাটিই ব্যক্ত।

অক্রূরের রথে চড়ি লীলারঙ্গ পরিহরি কবে শ্যামরায়
কাঁদাইয়া গোপীগণে কাঁদাইয়া বৃন্দাবনে গেল মথুরায়।
গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্বচনীয়।
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হ'য়ে নিমগন হলো অতীন্দ্রিয়।

অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধূপে, কানু বৃন্দাবনে।
তাই আজো গোপিকার আর্তনাদ হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে।
গুমরে গিরির বুকে ধ্বনিছে নির্ঝর মুখে নদী কলকলে।
মর্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বারিদমণ্ডলে।
সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে কারে যেন চায়।
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে স্বস্তি নাহি পায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করেনাক মন মিটেনাক সাধ।
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায় সকলি নিঃস্বাদ।
ব্রজের সজল-আঁখি যত মৃগ যত পাখী নব জন্ম লভি'
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি ?
রাধার বিরহ রাগে তাদের কল্পনা জাগে হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি করেছে করুণ।
জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন সুদূরের কথা পূর্ণের পিপাসা,
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে অমৃত তিয়াসা।
নিখিল ভুবন ভ্রমি বিশ্বসীমা অতিক্রমি লক্ষ্য নাহি জানি'।
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত সুরে তাহাদের বাণী।

ভাবসম্মেলনের পরে এই যে বিরহ এ বিরহ রাধিকার নয়, এ বিরহ ব্রজের, এ বিরহ বিশ্বমানবের।

ভক্ত তুলসীদাস যেমন সীতাহরণ ও সীতাবর্জন স্বীকার করেন নাই, বহু বৈষ্ণব ভক্ত তেমনি মাথুর ও ভাব সম্মেলন স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, আজিও রাধাকৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনলীলাই করিতেছেন। তাঁহারা সেই লীলানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। বাকি সকল ভক্ত হাহাকার করিয়া বলে, "শ্রীমতি, তুমিত প্রিয়তমের সঙ্গে চিরমিলনে মিলিত হইলে আমরা এখন কি করি ? আমরা

বাস্তব লোকের জীব—ভাবলোকে কেমন করিয়া যাই? তোমার লীলাসহচর লীলাসহচরী আমরা—লীলার বাহিরে তোমাকে আমরা চিনিতেও পারি না। তুমি সরল গোপগোপীদের ছাড়িয়া কি বৈদান্তিকের অধিগম্য হইলে?”

যে কবিরা চিরদিন ব্রহ্মের দ্বৈত ভাবকে বাণীরূপ দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অদ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দেওয়ার ভাষণ জানিতেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দ্বৈত ভাবের ভাষাতেই অদ্বৈত মিলনকেও বাণীরূপ-দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্বৈতমিলনকে কাব্যরূপ দেওয়াই যায় না—মহাকবি রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী হইয়াও তাহা পারেন নাই। তিনিও দ্বৈতমিলনের ভাষায় অদ্বৈতের প্রেমস্বরূপের প্রকাশ দান করিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, ভাবসম্মেলনের তত্ত্ব এক বস্তু, আর তাহার কাব্যরূপ অন্য বস্তু। কাব্যরস উপভোগ করিতে হইলে তত্ত্বটি ভুলিয়া যাইতে হইবে। কীর্তনের রাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মেলনের পদগুলি উপভোগ করিবার আগে তেমনি ভাবসম্মেলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য, তত্ত্বটুকু না জানিলেও পদগুলি উপভোগ করা যায় রাধাশ্যামের পুনর্মিলনের রসচিত্র মনে করিয়া। তাহাতে রোমান্টিক রসটুকু পাইতে অসুবিধা নাই, তাহাতে মিষ্টিক রসটুকু মিলে না। ব্রহ্ম হইতে যে লীলাচক্রের মধ্য দিয়া ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তনের সত্যটি ভক্তকবিগণ পদাবলীতে বাণীরূপ দিয়াছেন—সে চক্রের কথা না জানিয়া তাহার পরিধির যে কোন অংশই উপভোগ করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত বলিবেন—‘এহো বাহ্য, আগে কহ আর।’

বৈষ্ণবকবিরা এই ভাবসম্মেলনকে রসসাহিত্যে পরিণত করিবার জন্য রূপসম্মেলনের ভাষা ও ভঙ্গীরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকেও একটি সম্ভোগান্ত লীলায় পরিণত করিয়া শ্রীমতীর মাথুর বিরহে আতুর গৌড়জনকে দিয়াছেন সান্ত্বনা। মথুরা হইতে সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কুঞ্জে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এ যেন কপালকুণ্ডলার পরিশিষ্ট 'দামোদরের মৃন্ময়ী'। সুখের বিষয়, ইহা মৃন্ময়ীর মত ব্যর্থ রচনা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে যে ব্যবস্থা করিতে হয় কবিরা সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন রাধার শোচনীয় দশা দেখিয়া দূতী মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতিভার ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধাওল দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল বরিখে বরিখে কত ভেল ॥
আওব করি করি কত পরবোধব অব জিউ ধরই না পার।
জীবন মরণ অ-চেতন চেতন নিতি নিতি ভেল তনু ভার ॥
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর কোই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব তব কি করব জ্ঞানদাস ॥

কেবল আবেদন নয়, দূতী শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক ধিক বঁধু লাজ নাহি বাসো লেহের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলে অনল ভেজায়ে জ্বালাইতে আর দেশ ॥

অগাধ জলের মকর যেমন না জানে মিঠ কি তিঁত,
স্থরস পায়স চিনি পরিহরি চিটাতে আদর এত।
চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে।
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়ায় কুবুজা বসেছে খাটে॥

এদিকে ঘনশ্যামের দূতী বিরহিণী শ্রীমতীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন--

হিয়ে বিরহানল জলত নিরন্তর লখই না পারই কোই।
জনু বাড়বানল জলনিধি অন্তর বাহিরে বেকত না হোই॥
সজনি কো কহু কানু স্বতন্ত্র?
তুয়া গুণগান গুপত অবলম্বন সোই সতত জপমন্ত্র॥

গোবিন্দদাসের দূতী আরও রঙ চড়াইয়া বলিলেন—

পীত নিচোলে নয়ন যুগ মোছই ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি খিতি লুঠই পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত অতয়ে বুঝলুঁ অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কতহুঁ না রোয়ত গোবিন্দদাস পরমাণে॥

দূতীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া শ্রীমতী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি চারিদিকে প্রিয় মিলনের শুভলক্ষণ গুলিও দেখিতে লাগিলেন—

বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে দুজনার এক কথা।
বঁধু আসিবার ঠিকন শুধাতে নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমরকোকিল শবদ করয়ে শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরুমৃগগণে করয়ে মিলন যৈছন পূরব মিত॥

খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈঠয়ে শারীশুক করে গান।
বংশী কহয়ে এমন লক্ষণ কভু না হইবে আন ॥

শ্রীমতী ভাবঘোরে তখন কল্পনা করিতে লাগিলেন—কি ভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। কি কি কামকলাকৌশল অবলম্বন করিবেন—

যবহু পিয়া মঝু ভবনে আওব দূরে রহি মঝু কহি পাঠাওব,
সকল দূখন তেজি ভূখন সমক সাজব রে।
লাজনতি ভরে নিকটে আওব রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভায়ব
কাম কৌশল কোপ কাজর তবহু রাজব রে ॥
কবহু কোকিল মধুর কুহু কুহু কবহু কপোত কণ্ঠরব মুহু
করজ শাসন কলা আসন কছু না গোয়ব রে ॥
যতন করি হরি কত না ভাখব আশ দেই পিয়া পাশ রাখব
সময় বুঝি তহি মাঝি হোই পুন সাঝি হোয়ব রে ॥
কবহু দুহু মেলি গীত গাওব কবহু কর গহি কণ্ঠে লায়ব,
কবহু কৈতব কোপ কিয়ে রস রাখি রূষব রে ॥
বচন ছলে যব সাধ মানব, মীনকেতন যুঝত জানব,
মদন ময় মাতা হাতী মাতব অচিরে মুষব রে ॥

এই যে মিলনস্বপ্নচিত্র দীর্ঘ বিরহের পর, একি শুধু রাধিকার? সর্বযুগের সর্বদেশের মিলনোৎকণ্ঠা বিরহবিধুরা তরুণীদের প্রাণের আকুতি ইহাতে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। সিংহভূপতির এই পদের অনুসরণে জগদানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহার্ত হৃদয়ের একটি মর্ম্মস্পর্শী মিলনস্বপ্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। পূর্বেই তাহার আলোচনা হইয়াছে। অনন্তদাসের শ্রীমতী ঐ কথাই সরল ভাবেই বলিয়াছেন।

"বঁধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া বদন ঝাঁপিব বাসে ॥

তা দেখি নাগর রসের সাগর আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি গদ গদ করি কহিবে বচন থোর॥
তবহি মলিন দেখিয়া বদন হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছল ছলে গর গর বোলে কত না সাধিবে মোরে॥
সকল জানিয়া থীর মানিয়া পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি কহয়ে অনন্তদাস।"

গোবিন্দদাসের শ্রীমতী প্রিয়তমকে বরণ করিবার জন্ম সখীগণকে যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছেন—

মঙ্গল কলস তঁহি নবপল্লব রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহগণ গণক আনি কর বিভূষিত তুরিতে আওত আজু শ্যাম॥
স্ববরণ ভাজন লাজহিঁ ভরি ভরি রাখহ নয়ন সমীপে।
হারিদ দাড়িম দরপণ অঞ্জন দধি ঘৃত রতন প্রদীপে॥
নবনব রঙ্গিনী দেহ হুলাহুলি বসন ভূষণ করি শোভা।
প্রাণ প্রাণহরি নিজ গৃহে আয়ব গোবিন্দদাস মনোলোভা।

বিদ্যাপতির শ্রীমতী বলেন—'না না বাহিরের আয়োজনে প্রয়োজন নাই—সব মঙ্গল উপচারই ত আমার অঙ্গেই আছে।' সম্ভোগের কবি বিদ্যাপতির শ্রীমতী দেহের দেহলীতে দীপালি জ্বালিয়া প্রিয়তমের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে। মঙ্গল যতহু করব নিজ দেহে॥
কনয় কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি। দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর ভঙ্গমে॥
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব। আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুকম্প।
নিশিনিশি আনব কামিনী ঠাট। চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ। দু'য় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

এ দিকে দূতীর মুখে শ্রীরাধার শোচনীয় দশার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

তিল এক নয়ন ওত জিউ না সহ না রহু দুহু তনু ভীন।
মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয়ে ঐছন রহু নিশিদিন।
সজনি কোন পর জীয়ব কান।
রাই রহল দূর হাম মথুরাপুর এতহু কি সহয়ে পরাণ॥
ঐছন নাগর ঐছে নব নাগরী ঐছন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়ে নয়ন না তাজিয়ে লোর॥
সোই যমুনা জল সোই রমণীগণ শুনইতে চমকিত চিত।
কহ কবিশেখর অনুভবি জানলুঁ বড়কা বড়ই পিরীত।

শ্রীকৃষ্ণ আর মথুরায় স্থির থাকিতে পারিলেন না—পড়িয়া থাকিল তাঁহার রাজপদ, রাজসম্পদ, মথুরানাগরীগণ। 'বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া' ব্রজের দুলাল ব্রজে ফিরিয়া আসিল।

মথুরা সঞে হরি করি পথচাতুরী মীলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুমপশু পাখীকুল বিরহে বেয়াকুল পাগল আনন্দপুঞ্জে॥
বরজ নারীগণ বিরহে অচেতন পুন ফিরে পাইল পরাণ।
দাবদগধ যেন ছটফটি জীবন যৈছন অমিয়া সিনান॥
দেখ রাধামাধব কেলি।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ চীত পুতলি সম ভেলি॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘর ঘর থকিত কণ্ঠসর দুহু বিবরণ দুহু ভোর॥
হোই সচেতনে কি কহব নাহি জানে যৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ প্রাণদ ঐছন ক্ষেম॥

এ মিলন বৃন্দাবনলীলার অন্য মিলনের মত নয়, ইহাতে সাত্ত্বিক ভাবেরই প্রাবল্য। কারণ, ইহা রূপসম্মেলন নয়, ভাবসম্মেলন। সে জন্য অশ্রু, বেপথু, রোমাঞ্চ, বাকৃস্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ইত্যাদির দ্বারা এই মিলন পরিকল্পিত হইতেছে। বৃন্দাবনের আভিসারিক মিলন ও ভাবাবেশে এই মিলনের ভাষা একরূপ নয়—এ মিলন যে নিত্যমিলন তাহাই আভাসিত হইয়াছে রাধামোহনের পদে—

দিনকর কিরণ রহিত ঘন কুঞ্জহি মিলল যুগল কিশোর।
দুহুকর কিরণহি গেও সব আঁধিয়ার জনু কোটি রবিক উজোর॥
সজনি দেখ রাধামাধব-কেলি।
অনিমিখ নয়ন চষক ভরি পীয়ত দুহু রূপ সুধাসম মেলি।
পরশহি দুহু তনু মনিক পুতলি জনু মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মীলত কত সুখ পাওত না রহ লব উন খেদ॥
চিরদিন মিলন করত নিধুবন আনন্দ সায়রে বূর।
রাধামোহন পহু অহোনিশি ব্রজে রহু সকল মনোরথ পূর।

শ্রীরাধা ভাবোল্লাসে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন—

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কৈলু যতন। এবে হাম জানলু পিয়া বড় ধন।
আঁচব ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তবু হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।
শীতের উড়নি পিয়া গিরীষের বা। বরিবার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী। সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥

[অদ্বৈতের ভবনে শ্রীচৈতন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই পদটি গাহিয়া আচার্য্য উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে মাতিয়া ছিলেন। বিদ্যাপতির এই পদ বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া বাংলা পদে পরিণত হইয়াছে।]

ভাবোল্লাসের আর একটি বিখ্যাত পদ—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইলুঁ পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টূটল সবহি সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

এই দুইটি পদে যে উল্লাস পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বৃন্দাবনলীলার আর কোন মিলনে নাই। সকল মিলনেই ছিল দেহের ব্যবধান তাই সকল মিলনসম্ভোগই ছিল সংকীর্ণ সম্ভোগ। এই ভাবমিলনে কেবল কোন বাধা নাই, ব্যবধান নাই, কুণ্ঠা নাই সঙ্কোচ নাই, মানাভিমানের পূর্ববর্তিতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। সম্ভোগের উল্লাসও তাই অকুণ্ঠিত।

অই ভাবোল্লাস যখন শ্রীচৈতন্যদেব উপভোগ করিতেন তখন সহচরগণ বিদ্যাপতির এই পদ দুইটি গাহিয়া সে উল্লাসকে নিবিড়তর ও উৎসবকে উত্তালতর করিয়া তুলিতেন।

দুস্তর ও নৈরাশ্যময় বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের মিলন হইলে প্রিয়তমা আমাদের লৌকিক জীবনে যে কথা বলে বৈষ্ণবকবিগণ সেইরূপ কথাই শ্রীরাধার মুখে বসাইয়াছেন। শ্রীরাধা যেন বলিতে চান, বৃন্দাবনলীলায় এত জ্বালা, এত বেদনা তাহা কে জানিত? আর লীলায় কাজ নাই, আর যেন বিচ্ছেদ না হয়। শ্রীমতী যেন বলিতে চান, রূপলোকে বিচ্ছেদ আছে, ব্যথা আছে; রূপলোকের লীলায় আর

কাজ নাই, ভাবলোকই আমাদের ভালো! পরমেষ্ট ধন হৃদয়ের মধ্যেই থাকুক হৃদয় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আর খুঁজিয়া মরিতে পারি না।

শ্রীমতী বলিতেছেন—

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেথানে পরাণ সেখানে রাখিয়া থোব।
কালো কেশের মাঝে তোমারে রাখিব পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে প্রবোধিব পরিয়াছি কালো পাটের জাদ।
নহেত নেহের নিগড় করিয়া বাঁধব চরণারবৃন্দ।
কেবা নিতে পারে লউক আসিয়া পাঁজরে কটিয়া সিন্ধ।

শ্রীমতী বলিতেছেন,—"হে প্রিয়তম, তুমি হইলে ভাববিগ্রহ, তোমার স্থান হৃদয়ের বাহিরে নয়, হৃদয়ের ভিতরে। হিয়ার ভিতর হইতে বাহির করিয়া বড় শাস্তি হইয়াছে। আর না।"

আমার পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার করমের দুখ সকলি হইল ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়াল রহিব একই যোগ।

শ্রীকৃষ্ণও রাধাকে বলিতেছেন—

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা সিরজিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কল্প ধরি যদি নিরবধি দেখি॥

তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥
যতনে আনিয়ে যদি ছানিয়ে বিজলী।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়য়ে পুতলী।
রসের সায়রে যদি করয়ে সিনান।
তবু ত না হয় তব নিছনি সমান।
হিয়ার ভিতর থুইতে নহ পরতীত ॥
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত ॥
হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির ॥
তেঞি বলরামের পহুর চিত নহে স্থির ॥

শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেন—

তোমা বিনা যেবা যত পীরিতি করিনু কত
সে পীরিতে না পূরিল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু স্বতন্ত্র না ভেল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস।

কেবল রাধার পীরিতি সম্ভোগের জন্যই স্বতন্ত্র তনু ধারণ। নতুবা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন—

রাই তুমি যে আমার গতি
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।

লীলারস আস্বাদনের জন্যই বৃন্দাবনলীলায় অদ্বৈতের দ্বৈতরূপ—অদ্বৈতানন্দে দ্বৈতরূপের অবসানই ভাবসম্মেলন।

নাথ-সাহিত্য

বাংলায় শৈবধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সহিত মিলিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল বিচিত্ররূপ লাভ করে, নাথযোগীদের প্রচারিত ধর্ম্ম তাহাদের অন্যতম। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ ইত্যাদি সিদ্ধ যোগিগণের প্রচারিত ধর্ম্মই নাথধর্ম্ম। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়—কিন্তু সেকালে সূত্রপাত হইলেও বর্ত্তমানে প্রচলিত নাথসাহিত্য বহু পরে রচিত হইয়াছে। নাথযোগিগণের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের জন্য নাথসাহিত্য রচিত হইয়াছে। নাথসাহিত্যই নাথধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে। সিদ্ধযোগীদের সাধনা ও নাথসম্প্রদায়ের ভক্তগণের জীবনের যে ঐতিহাসিকতা ছিল, তাহা অলৌকিকতার বর্ণনাতিশয্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাথধর্ম্ম গুরুপূজামূলক। ইহাতে উচ্চনীচজাতিবিচার ছিল না। হাড়িডোমশ্রেণীর সিদ্ধপুরুষদেরও অলৌকিক বিভূতিদর্শনে দলে দলে লোকে তাহাদের ভক্ত হইয়া পড়িত। যাহারা বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িত, ঐ গুরুগণ তাহাদের গুহ্য সাধন শিক্ষাদান করিতেন। এই সাধনা বৈরাগ্যমূলক। সাধারণ লোকে এই যোগীদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত এবং ইহাদের কৃপায় পারমার্থিক অপেক্ষা ঐহিক ইষ্টসাধনের চেষ্টা করিত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই নাথধর্ম্মের অনুরাগী ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে—যেমন নিত্যানন্দ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসমাজ একটা স্বতন্ত্র জাতির রূপ ধরিয়াছে।

নাথসাহিত্যের গ্রন্থগুলির মধ্যে মাণিকচন্দ্রের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গাথাগুলি হইতে নাথগুরুদের অলৌকিক কাহিনী; সেকালের বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। স্থলে স্থলে কবিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নাথযোগীরা শিব ও মহামায়াকে মানিতেন, কিন্তু শিব ও মহামায়া, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, কানু পা, হাড়ি পা ইত্যাদি সিদ্ধযোগীদের মতই আদ্যা হইতেই উৎপন্ন। এই আদ্যা নিরঞ্জনের ঘর্ম্ম হইতে এবং নিরঞ্জন শূন্য হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্ব নাথ সাহিত্যে অনেকটুকু স্থান জুড়িয়া আছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সেকালের অধিকাংশ কাব্য গ্রহণ করিয়াছিল।

নাথযোগীরা বৌদ্ধ দোহা ও গানে উল্লিখিত সহজসিদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগীদের সম্প্রদায়ের ধারারক্ষক ছিলেন! ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তন বাঙ্গালী বৌদ্ধভাবাপন্ন হিন্দুর কীর্ত্তি—উহা বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাথযোগীরা ধর্ম্মদেবতার উপাসক নহে, তাহারা তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব পাইয়াছিল—তিব্বত বা নেপাল হইতে। সেজন্য তাহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতিতে দেবতাগণ যে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন—নাথপন্থীদের উপাসনায় সিদ্ধযোগিগণ সেই স্থান পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে এমনি অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত যে, নাথসাহিত্যে যমাদি দেবতারাও ইঁহাদের বশীভূত এইভাবে কল্পিত করা হইয়াছে। আদিদেব ধর্ম্মনিরঞ্জনের পূর্ণাধিপত্য-গৌরব অবশ্য সম্পূর্ণই স্বীকৃত লইয়াছে।

রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন সহজসিদ্ধ গোরক্ষনাথ। তাঁহার

কৃপায় ময়নামতী মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার উপগুরু ও গুরুভাই ছিলেন সিদ্ধ হাড়ি পা—একজন হাড়ী। তাঁহার শক্তি ছিল আরও বেশি। অতিরিক্ত করভারে পীড়িত হইয়া প্রজারা ধর্ম্মঠাকুরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানায়, তাহাতে রাজার মৃত্যু হয়। ময়নামতী রাজাকে বাঁচাইবার জন্য যমের সঙ্গে অনেক লড়াই করেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ময়নামতী এজন্য যমরাজাকে দারুণ প্রহার করিতে ছাড়েন নাই এবং নানা জীবজন্তুর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে নাস্তানাবুদ করিলেন। রাজার যখন মৃত্যু হইল তখন গোপীচন্দ্র ছিল ময়নামতীর গর্ভে।

গোপীচাঁদের জন্মের পর রাণী তাহার হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনার বিবাহ দিলেন। রাণী নিজের গুরুদত্ত মহাজ্ঞানবলে জানিতে পারিলেন—গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে এক বৎসর পরে মারা যাইবে। সে জন্য রাণী গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজার নব যৌবন, অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে। সে সন্ন্যাসগ্রহণে রাজী হইলনা, সে মায়ের কথাও বিশ্বাস করিলনা। রাণীরাও কাঁদাকাটা করিয়া বাধা দিতে লাগিল। রাণীরা ষড়যন্ত্র করিয়া শাশুড়ীকে বিষ খাওয়াইল—ময়না মহাজ্ঞানবলে প্রাণ রক্ষা করিল। রাণীর কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাহাকে সাতদিন ধরিয়া আগুনের উপর উত্তপ্ত তৈলের কড়ায় সিদ্ধ করা হইল—সাত দিন পরে রাণী বাঁচিয়া উঠিল। তখন গোপীচাঁদ সন্ন্যাসগ্রহণে স্বীকৃত হইল—কিন্তু হাড়ীর কাছে দীক্ষা লইতে রাজী হইল না। রাণী হাড়ীকে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে অনুরোধ করিল। হাড়ী নানা

প্রকারের ইন্দ্রজাল দেখাইল। রাজা তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় বারো বছরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হাড়ির সঙ্গে চলিলে—হাড়ী কত প্রকারে ছলনা ও পরীক্ষা যে করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বারো বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া হাড়ীর কৃপায় গোপীচন্দ্র আবার রাজ্যলাভ করিল। ইহাই ময়নামতীর গানের মোটামুটি গল্পাংশ। গুরুবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন এই গানগুলি রচিত। শূন্য পুরাণ যদি ধর্ম্মমঙ্গল হয়—এই গানগুলিকে তবে গুরুমঙ্গল বলা যাইতে পারে।

গুরু এখানে দেবতাস্থানীয় এবং গুরু যেন নিজের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতেছেন—এবং বিভূতি দেখাইতেছেন।

সাহিত্যহিসাবে ইহাব মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। আজগুবি হইলেও ইহার মধ্যে একটি গল্প আছে এবং অদুনা পদুনার বিলাপটি মর্ম্মস্পর্শী।

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কাহার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥

এমন বয়সে তুমি ছাড়িয়া গেলে আমার বৃথা গাভুরালি। যদি নিতান্তই যাও তবে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও—

গ্রীষ্মকালে বদনত দিব পাখার বাও। মাঘমাসি শীতে ঘেঁসিয়া রমু গাও।"

ময়নামতীর গান বা মাণিকচন্দ্রের গানের ছন্দ অত্যন্ত এলো মেলো—কাঠামোটা পয়ারেরই বটে, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। গাওয়া হইত কাজেই গায়করা স্বর টানিয়া বা খাটো করিয়া সুশ্রাব্য করিয়া লইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলের বালাই নাই।

ভাষার নমুনা নীচে দেওয়া হইল—

তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
বেয়াল্লিশ ভইষ হইল মুরত বদলাইয়া।
ঐ দরিয়ায় ভইষ পড়িল ঝম্প দিয়া।
মার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিট্টিয়া।
ঐ ত গোদা যম আটিয়া বজ্জর
ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল রড়। *

ময়নামতীর গানে আর কোন সাহিত্যিক মূল্য না থাকুক—উহার মধ্যে যতই আজগুবি ঘটনা থাকুক—যতই অমানুষিক ও অলৌকিক ব্যাপারের সংঘটন থাকুক—বঙ্গ-সাহিত্যে ইহাতে বোধ হয় সর্বপ্রথম মানবহৃদয়ের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। ময়নামতীর জীবনে গুরুদত্ত শক্তির বিচিত্র লীলার প্রাধান্যের মধ্যে তাহার মাতৃহৃদয়টি উত্তপ্ত তৈলকটাহের মধ্যে সরিষাবীজের মত চিরসঞ্জীবিত। সন্তানের দীর্ঘায়ু, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ময়নামতীর দারুণ উৎকণ্ঠা ও সেজন্য তাঁহার দারুণ দুঃখ, লাঞ্ছনা, পীড়ন ও কলঙ্ক ব্যথা সহ্য করা সাহিত্যেরই বস্তু। যে সন্ন্যাসের জন্য মন প্রস্তুত নয়, যে সন্ন্যাসের মূল্য কিছুই বোধগম্য নয়, কেবল মাতৃআজ্ঞায় একটা কল্পিত কারণে, গোপীচন্দ্রের পক্ষে প্রথম যৌবনে সোনার সংসার সুন্দরী পত্নী ত্যাগ করিয়া সে সন্ন্যাস গ্রহণ সাহিত্যেরই বস্তু।

একদিকে মাতৃআজ্ঞা ও মৃত্যুভয় অন্যদিকে রাজসংসার ও যৌবন সঙ্গিনীরা,—গোপীচাঁদের পক্ষে দারুণ সমস্যা। একদিকে একমাত্র সন্তানের

---

* পরবর্ত্তী কালে দুর্লভমল্লিক নামক একজন কবি এই গানকে মার্জ্জিত রূপ দিয়া নিয়মিত পয়ারে গোবিন্দচন্দ্রের গান বলিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। নমুনা—

আঠারো বৎসর হৈলে উনিশে মরণ। শূন্যভরে গোদা যম আসিবে তখন।
নিদারুণ যম আসি গলে দিবে পা। কাড়্যা লবে প্রাণের সুয়া কান্দিবেক মা।

সুখসৌভাগ্য, অন্যদিকে তাহার জীবন। মা হইয়া ময়নামতীকে সন্তানের অঙ্গে যোগিবেশ তুলিয়া দিতে হইতেছে—দারুণ দুঃখ ভোগের জন্য সুখের সংসার হইতে সন্তানকে বিদায় দিতে হইতেছে। ময়নামতীর জীবনেও নিদারুণ সমস্যা। এই সমস্যা ও রাণীদের বিচ্ছেদ বেদনা লইয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারিত। কিন্তু লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টি ত উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধ নাথগুরুর মহিমা কীর্ত্তন। যেটুকু সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিনা প্রয়াসে বিনা উদ্দেশ্যেই।

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থখানিকে ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গানের সামসময়িক ও পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। ইহার ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্বাচীন হইলেও—কতক কতক অংশ প্রাচীন এবং মূল উপাখ্যান ও কাঠামোটি বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থ পুনর্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে ভাষার শিথিলতা অল্প এবং অপেক্ষাকৃত সুনিয়মিত পয়ারে ইহা রচিত। এই গ্রন্থের দুইটি নাম,—একটি গোরক্ষবিজয় আর একটি মীনচেতন। মীননাথ নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, গোরক্ষনাথ তাঁহার শিষ্য ও এই সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা।

এই গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে গোরক্ষনাথ সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সকল প্রলোভন ছলনা, রক্তমাংসের সকল দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া আদর্শ যোগিগুরুরূপে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য ইহার নাম গোরক্ষবিজয়। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কিন্তু মায়াবিনীর মায়াজালে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন—শিষ্য গোরক্ষনাথই গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য দান করেন। সে জন্য ইহার অপর নাম মীনচেতন।

ইহার ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মের সমন্বয়ে গঠিত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্ম্মমতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে গোরক্ষবিজয়ের মূল্য যথেষ্ট, আর যদি উপাখ্যানের ব্যঙ্গার্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য কম নয়।

মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মীননাথের চিত্ত বিচলিত হয়, সে জন্য মহামায়া মীননাথকে অভিশাপ দেন—

ষোলশত নারী লৈয়া কর তুমি কেলি।
কদলীর রাজা হইয়া ঝাট যাও চলি॥

মীননাথ ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচাব করিতে যান কদলীরাজ্যে। কিন্তু সেখানে মোহিনীদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জীবনব্যাপী সাধনায় জলাঞ্জলি দিলেন। কবি এই রাজ্যের একটা বর্ণনা দিয়াছেন—

এহি রাজ্য বড় পুত্র ভালা। চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের গোলা।
লোকের পিঁধন পাটের পাছড়া। প্রতিঘর চালে দেখ সোনার কোমড়া॥
কার পখরির পানি কেহ নাহি খায়। মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুকায়॥

গোরক্ষনাথ যখন শুনিলেন তাঁহার অধঃপতনের কথা। তখন তিনি নর্ত্তকীর বেশে সে রাজ্যে গেলেন, কারণ, সে রাজ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মীননাথের সভায় কোনপ্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়া—

নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর। মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচেন্ত গোর্খনাথ ঘাগরীরবোলে। কায়াসাধ' কায়াসাধ' মাদল হেনবোলে।

মাদলের গুরু গুরু তান শুনিয়া মীননাথ বিচলিত হইলেন। তিনি বলিলেন—আমার দুই শিষ্য আছে, এক গোর্খাই আর গাভুর সিদ্ধাই—'তুমি কেন গুরু হেন মোরে বল ছলে।' মীননাথ শেষ পর্য্যন্ত বুঝিলেন—গোর্খ তাহাকে লইতে আসিয়াছে। কিন্তু মীননাথের

কদলীমোহপাশ ছিন্ন করিয়া ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। গোরক্ষনাথ তখন গান ধরিলেন—

ঠগের হাতেতে গুরু সঁপিলা ভাণ্ডার।
ঢাঙ্গাতীর হাতে ভরা সঁপিলা তোমার।

মাছের প্রহরী দিলা দারুণ সে উদ। বিড়াল প্রহরী দিল ঘন আওটা দুধ। ধান্যের ভাণ্ডারে যেন ইঁদুর প্রহরী। শৃগালের হাতে যেন হংস দিলা ধরি। হিমানীতে সমর্পিলা বিমল কমল। জলের প্রহরী যেন দিয়াছে অনল॥

গুরুর মোহ ক্রমে কাটিয়া গেল। গোরক্ষনাথ বিভূতি প্রকাশ করিয়া গুরুকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। মীননাথ তখনও সম্পূর্ণ মোহমুক্ত নহেন। তিনি ধনরত্ন সঙ্গে আনিলেন—গোরক্ষনাথ সে ধন পথে ছড়াইয়া কামিনী কাঞ্চন দুইয়ের মোহ হইতেই গুরুকে রক্ষা করিলেন। মীননাথ বিস্মৃত মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এই কাহিনীর মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা এই—

বহু কঠোর সাধনা করিয়া যে যোগী ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে কিংবা যে প্রবৃত্তির পরিপাকের পর নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে, মোহিনী মায়ায় সে কখনো বিচলিত হয় না। কিন্তু যে যোগী শুধু সবলে ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বৃদ্ধবয়সেও পদস্খলন হয়। এখানে গোরক্ষনাথ নিজের কঠোর সাধনাবলে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—মীননাথ মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন ফাঁকি দিয়া। তাই তিনি মোহিনী মায়ায় মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বৈরাগ্যের মহাশত্রু মহামায়া। তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে লালন করেন এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করেন। মীননাথ মহামায়ার ছলনায় ভুলিলেন। গোরক্ষনাথকে ছলনা করিতে আসিয়া মহামায়ার লাঞ্ছনার একশেষ হইল। মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল—

এমন জননী পাইলে—'তাহান কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।' মহামায়া মোহিনী মূর্ত্তিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, যে মা বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লয়—সেই বাঁচিয়া যায়। মাতৃরূপে মহামায়ার ভজনার ইহাই মূল সূত্র।

গুরু নিজে সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইয়াও যদি অনন্যসাধারণ শিষ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার দীক্ষামন্ত্রে শিষ্য গুরুরও গুরু হইয়া উঠিতে পারেন—এমন কি যদি গুরুরও পদস্খলন হয় তাহা হইলে সেই শিষ্য তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। মীননাথ মীনের মতনই পঙ্কে ডুবিলেন—গোরক্ষনাথ সেই পঙ্ক হইতে গুরুকে উদ্ধার করিয়া গুরু-রক্ষও হইলেন। এত বড় গুরুদক্ষিণা আজ পর্য্যন্ত কোন শিষ্য গুরুকে দেয় নাই।

হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তপঃক্লিষ্ট তাপস জীবনে
মহাজ্ঞান হ'তে তাহা ঢের বড়। বিরূপা শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।
মা ব'লে শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে,
বামারে দক্ষিণা তুমি করেছিলে সাধনার ধামে।
মনে জাগে সেই চিত্র, ভক্তিভরে ধরি দুটি হাতে
পঙ্কিল পল্বল হ'তে উদ্ধারিছ গুরু মীননাথে।
গুরু হ'তে শিষ্য বড়, এই সত্য জাগে তায় মনে,
জগতের জ্ঞানলোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তনে,
শিষ্যপরম্পরাক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়,
শিষ্যধারা মগ্নতনু ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হয়ে ব্রতভঙ্গে গুরু যদি সুখতন্দ্রাগত:
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত সংকল্পিত ব্রত।

বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণদের ও বৈষ্ণবদের প্রভাব সঞ্চারিত হইবার আগে তান্ত্রিকতার কিরূপ প্রভাব ছিল এবং সাধারণ লোকের নৈতিক আদর্শ ও ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের যোগী সন্ন্যাসীরা কিরূপ হঠযোগাদির সাহায্যে অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি লাভ করিয়া জনসাধারণের চিত্তের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন এবং জনসাধারণ কিরূপ মন্ত্র তন্ত্র ও যৌগিক ক্রিয়াকলাপকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিত—এই গ্রন্থে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ নীতিসূত্র, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগ রহস্য, আত্মসংযম ও বৈরাগ্যের মহিমা, বৌদ্ধ মহাযোগীদের যুক্তি-সূত্র এই গ্রন্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত আছে। বুদ্ধ যেমন মারের ছলনা ও প্রলোভন হইতে আপনার নৈতিক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—গোরক্ষনাথ তেমনি মহামায়ার মায়াজাল ও ছলনা হইতে কঠোর সংযমের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতেছেন। গোরক্ষ নাথের অবিচলিত চরিত্রে যে নির্বিশেষ শ্রেয়োবোধ আছে—তাহা সাহিত্যেরই উপজীব্য। সাহিত্যসৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। লেখক যদি ইচ্ছা করিতেন—গোরক্ষনাথের সাধকজীবন অবলম্বনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিতে পারিতেন, Tennyson যেমন Sir Galahad ও Laneclot কে লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের প্রভাবে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক শৈবধর্ম দেশের রাজা রাণী হইতে অস্পৃশ্য হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত দেশের আপামর সাধারণ সকলের অধিগম্য ও অনুশীলনীয় হইয়া পড়িয়াছিল—ধর্ম্মসাধনার উচ্চতম স্তরেও সাধনামার্গের উচ্চতম গ্রামেও জনসাধারণের প্রবেশাধিকার

জন্মিয়াছিল—ব্রাহ্মণ্য শাসনের ও শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের নিষেধ গণ্ডী অনেক স্থলেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বেদের বন্ধন বহু স্থলেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল—সাধারণ লোকের মনে স্বাধীন চিন্তা উন্নতশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—জাতিভেদের কড়াকড়ি কমিয়া আসিয়াছিল—দেবভীতি ও স্বর্গনরকের কল্পিত আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল এবং মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ও মানবাত্মায় অন্তর্নিহিত শক্তির অপরিসীমতা সগৌরবে স্বীকৃত হইত। এই যুগের রচনাগুলিতে এসকল কথার আভাস পাওয়া যায়।

এই যুগের সাহিত্যে চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত সাহিত্য বা ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। এইগুলি বাংলার মাটির খাঁটি ফসল—বাংলার অমার্জিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনধর্ম্মের সৃষ্টি এইগুলি। বাঙ্গালী জাতিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এই সকল রচনার অনুশীলন প্রয়োজন। কেবল ধর্ম্মজীবন নয়, সেকালের সামাজিক. গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের অনেক কথাই এই গুলি হইতে জানিতে পারা যায়। সে কথা বলাই বাহুল্য।

অনেক স্থলে ঠারেঠোরে তত্ত্ব কথা বিবৃত হইয়াছে—যেমন—

প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে ?
আল বান্ধি কিবা ফল জল আগে গেলে ?
মূল কাটা গেলে গুরু না জীয়য়ে গাছ।
বিনা জলে কোথা কি শুনিছ জিয়ে মাছ ?

ভারতচন্দ্রের ছন্দ

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কবিদের মধ্যে ব্রজবুলির কবিদের বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের মতন এমন ছন্দের বৈচিত্র্য, পারিপাট্য ও অনবদ্য গঠন আর কাহারও নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীতেই রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এমন নিখুঁত পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর আদ্যন্ত সমাবেশ অন্য কাহারও কাব্যে দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালার পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপে অক্ষরমাত্রার সহিত পদাংশ মাত্রার (Syllabic) মিশ্রণ ঘটান নাই। এই দুই ছন্দের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পূর্ব্বভাগে উৎকলন করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের লঘুত্রিপদী অক্ষরমাত্রিক, ৬+৬+৬+২ অক্ষরে গঠিত। যুক্তাক্ষরের জন্য কোথাও দুই মাত্রা ধরেন নাই—সর্ব্বত্রই একমাত্রা ধরিয়াছেন। লঘুত্রিপদী অক্ষরমাত্রিক হইলে সুশ্রাব্য হয় না, এ কথা কামিনী রায় পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী কোন কবি লক্ষ্য করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজ্ঞ কর্ণে ইহা প্রথম ধরা পড়িয়াছিল। বিহারীলাল যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের লঘুত্রিপদীর রূপের দৃষ্টান্ত—

(ক) কৈলাস ভূধর। অতিমনোহর। কোটি শশী পর-। কাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর। যক্ষবিদ্যাধর। অপ্সরোগণের। বাস॥
রজনী বাসর। মাস সংবৎসর। দুই পক্ষ সাত। বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ। কিছু নাহি ভেদ। সুখ দুঃখ একা-। কার॥

লঘুত্রিপদীর পংক্তির সঙ্গে অৰ্দ্ধ পংক্তির মিলন-বৈচিত্র্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে—

দিনপতি চাহ দীনে।

তোমার মহিমা। বেদে নাহি সীমা। ক্ষমাকর গুণ-। হীনে॥

লঘু ত্রিপদী চরণের সর্ব্বত্র কবি প্রথম দুই পর্ব্বে মিল দিয়াছেন।

ভাটের মুখে কবি হিন্দিভাষায় প্রাকৃতের স্বরমাত্রিক লঘুত্রিপদী ছন্দ বসাইয়াছেন।

ভূপমে তি। হারি ভট্ট। কাঞ্চীপুর। যায়কে।
ভুপকো স-। মাজ মাঝ। রাজপুত্র। পায়কে॥

ভারতচন্দ্র দুই-একস্থল ছাড়া প্রকৃত লঘু ত্রিপদীর স্বরমাত্রা অনুসরণ করেন নাই বটে, কিন্তু যেখানে যুক্তাক্ষর একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন—সেখানে স্বরমাত্রিক লঘু ত্রিপদীর মতই হইয়াছে। যেমন—

কত মায়া কর। কত মায়া ধর। হেরি হরি হর। হারে।
জিতজরামর। হয় সেই নর। তুমি দয়া কর। যারে॥

ঘন ঘন অনুপ্রাস ও মিলের প্রাচুর্য্যে ছন্দোলালিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

লঘুত্রিপদীব শেষার্দ্ধ চরণের দুইবার প্রযোগ করিয়া পূর্ণচরণের সঙ্গে স্তবক গঠনের দৃষ্টান্ত বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়।

কোটাল বলিছে। রাগি। কি বলে রে বুড়া। মাগী।
ঘরে পোষে চোর। আরো করে জোর। এ বড় কুটনি। ঘাগী।
হীরা বলে পুন। জোরে। কুটিনী বলিলি। মোরে॥
রাজার মালিনী। বলিলি কুটিনী। কালি শিখাইব। তোরে।

রবীন্দ্রনাথের—পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ।

এই ছন্দেরই অনুসরণ।

লঘুচৌপদী রচনায় কবি যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াছেন তাহার ফলে ইহা স্বরমাত্রিক হইয়া পড়িয়াছে।

আহা ম'রে যাই। লইয়া বালাই। কুলে দিয়া ছাই। ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া। ইহারে লইয়া। যাই পলাইয়া। সাগর পারে।

এই ভাবে প্রত্যেক চরণে তিন পর্ব্বেই মিল দিয়াছেন। তবে একেবারে প্রাকৃত স্বরমাত্রিক লঘু চৌপদীর দৃষ্টান্ত যে মিলে না তাহা নয় যেমন—

করবিলসিত। রত্নদর্ব্বী। পানপাত্র। সারদা।
ভবনিপতিত। ভারতস্থ। ভবজলনিধি-। পারদা।

স্বরমাত্রিক প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর কবিতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে খুব বেশি নাই—যাহা আছে তাহার গঠন-পারিপাট্য সুন্দর। বিদ্যাসুন্দরের বিহারবর্ণনা এই ছন্দে। এই ছন্দ সাধারণতঃ ব্রজবুলিতেই রচিত হইত বলিয়া কবি ইহাও ব্রজবুলিতেই লিখিয়াছেন। অশ্লীলতায় আবরণ দেওয়ারও উদ্দেশ্য ছিল। ঐ কবিতা হইতে কোন অংশ না তুলিয়া গঙ্গাস্তব হইতে দৃষ্টান্ত দিই—

টট্টল ঢল ঢল। চল চল ছল ছল। কল কল তরল-ত-। রঙ্গে।
পুলকিত শিরজট। বিঘটিত সুবিকট। লটপট কমঠ ভু-। জঙ্গে।

যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করায় ছন্দোহিল্লোলের অভাব হইয়াছে। স্বরমাত্রিক প্রাকৃত দীর্ঘচৌপদী (চৌপঈআ, মরহট্টা ইত্যাদি) ছন্দে ভারতচন্দ্র কয়েকটি স্তব ও গান রচনা করিয়াছেন।

২—৮+৮+৮+৫

জয়—শিবেশ শঙ্কর। বৃষধ্বজেশ্বর। মৃগাঙ্কশেখর। দিগম্বর।
জয়—শ্মশাননাটক। বিষাণবাদক। হুতাশ-ভালক। মহত্তর॥

২—৮+৮+৮+৬

জয়—কালি কপালিনি। মস্তক মালিনি। খর্পর ধারিণি। শূলধরে।
জয়—চণ্ডি দিগম্বরি। ঈশ্বরি শঙ্করি। কৌষিকি ভারত-। ভীতিহরে।

এই দুইটি দৃষ্টান্তে স্বরবিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে। ১মটিতে পর্ব্বের ২য় ও ৪র্থ অক্ষরে এবং ২য়টিতে ১ম ও ৪র্থ অক্ষরে দীর্ঘ স্বরের ধ্রুব সন্নিবেশ আছে।

৮+৮+৮+৮—

(১) শিব শিবকায়া। হর হরজায়া। পরিহর মায়া। অব অবিলম্বে।
যদি কর মমতা। হত হয় যমতা। দিবি ভুবি সমতা। গুহ হেরম্বে।

(২) ব্রাহ্মণ রাজপুত। ক্ষত্রিয় রাহুত। মোগল মাহুত। রণ অনিবারা।
ভাঁড় কলাবত। নাচত গায়ত। ভারত অভিমত। গীত সুধারা।

সাত মাত্রায় রচিত প্রাকৃত হরিগীতা ছন্দের দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিকঙ্কণ যেমন ইহাকে অক্ষরমাত্রিক ধরিয়াছিলেন, ইনি তাহা না ধরিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরমাত্রিক রূপই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকার করেন নাই।

কত—নিশান ফর ফর। নিনাদ ধর ধর। কামান গর গর। গাজে।
যত—জুয়ান রাজপুত। পাঠান মজবুত। সেপাহিগণ। রণ-সাজে।

কিন্তু একটি স্তবে যথাযথ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ স্বীকার করিয়া প্রাকৃতের যথাযথ স্বরমাত্রিক রূপ রক্ষা করিয়াছেন।

২–৭+৭+৭+৪

জয়—কৃষ্ণ কেশব। রাম রাঘব। কংস দানব-। ঘাতন।
জয়—পদ্মলোচন। নন্দনন্দন। কুঞ্জকানন-। রঞ্জন।

এই স্তবে কেবল যথাযথ মাত্রিক রূপ রক্ষিত হয় নাই, ছন্দের সমধিক উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছে প্রত্যেক চরণে তিন পর্ব্বে একই মিল দেওয়ায়।

যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া একটি গানে কবি এই ছন্দের স্বরমাত্রিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ একেবারে ধরা হয়

নাই বলিয়া ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ছন্দোলালিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গানটির দুইটি চরণ উৎকলন করি।

৭+৭+৭+৫

কুসুমে পুন পুন। ভ্রমর গুণ গুণ। মদন দিল গুণ। ধনুক হুলে।
যতেক উপবন। কুসুমে সুশোভন। মধু মুদিত মন। ভারত ভুলে।

আর একটি দৃষ্টান্ত—৭+৭+৭+৪

লপট লট পট। ঝপট ঝটপট। রচিত কচজট। কমনিয়া।
কুটিল কটুতর। নিমিষ বিষতর। বিষম শর শর। দমনিয়া॥

৭+৭+৭+২—

ভুলিয়া তার ভাবে। পতি না তোরে চাবে। কথাও হবে ভাঁড়া। ভাঁড়ি।
রাঁধিয়া দিবে ভাত। ফেলিবে আঁটু পাত। ঘুচিল হাত নাড়া! নাড়ি॥

সমস্ত কবিতাটিতে বাড়াবাড়ি+ছাড়াছাড়ি+পাড়াপাড়ি+আড়া আড়ি—এইরূপ ধরণের মিল দেওয়া আছে।

ভারতচন্দ্র স্বরমাত্রিক লঘু ত্রিপদী ও চৌপদী একেবারে রচনা করেন নাই—তাহা নয়। তবে কবিতায় প্রয়োগ করেন নাই, গানে স্তবকবন্ধনে প্রয়োগ করিয়াছেন।

লক লক ফণি জটা বিরাজ। তক তক তক রজনীরাজ।
ধক ধক ধক দহন সাজ। বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল। হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল!
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল। প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত স্বরমাত্রিক লঘুত্রিপদীর স্তবক নয়—যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত বাংলা লঘু ত্রিপদীর স্তবক। সে জন্য ছন্দোহিল্লোল নাই।

কখন নাপিত কখন কাঁসারী। কখনো সেকরা কখন শাঁখারী
কখনো তামুলী তাঁতী মনিহারী। তেলী মালী বাজিকর হে।

১১ অক্ষরে রচিত একাবলী ছন্দের কয়েকটি রচনা আছে। ইহাতে যুক্তাক্ষরকে এক মাত্রা ধরিলে শ্রুতিসুখকর হয় না। ভারতচন্দ্র অক্ষর-মাত্রাই প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হইয়াছে, যেখানে ছন্দোলালিত্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

(১) পুন না কহিও আমার কাছে। যে শুনে তাহার পাতক আছে।

(২) বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট। রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট।

(৩) বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

১০ অক্ষরে গঠিত খণ্ড পয়ারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

না জানিয়া করিয়াছি। দোষ। দয়াময়ি দূর কর। রোষ॥

কেন দিলা নিদারুণ। শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক। পাপ।

গিয়াছিনু নাগরীর। হাটে। (তারা) কথায় মনের গাঁটি। কাটে।

এই দশাক্ষরী চরণের দুইবার প্রয়োগ করিয়া তাহার সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপদীর পূরা একটি চরণ লইয়া কবি এক প্রকারের স্তবক গঠন করিয়াছেন—

প্রভাত হইল বিভাবরী। বিদ্যারে কহিল সহচরী

সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা সখী তোলে ধরাধরি করি।

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে। ধরা তিতে নয়নের জলে।

কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বানে কি হৈল কি হৈল ঘন বলে।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ভারত যুক্তাক্ষর একেবারে বর্জ্জন করিয়া এবং তিনপর্ব্বে মিল দিয়া একটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করায় ইহা স্বরমাত্রিক রূপ ধরিয়াছে—অথচ একেবারে দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ না থাকায় ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাকে প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীও বলা যায় না, ইহা দুই-এর মাঝামাঝি একটি চমৎকার রূপ।

শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব জীব শিব হয় শিব সেবনে।

দীর্ঘচৌপদীর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় গানে। যেমন—

খসিল বাঘের ছাল। আলুথালু হাড়মাল।
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা। পিনাক ত্রিশূল।
ভারতের অনুভবে। ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে।
ভাবিনী ভাবেন ভব। ভাবভরাকুল।

শেষপর্ব্বে আরো একমাত্র বাড়াইয়া—

না ছিল কোকিল শব্দ। ভ্রমর আছিল জব্দ।
উত্তরে বাতাস স্তব্ধ। বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি। শুষ্ককাষ্ঠ মুঞ্জরিলি।
ভারতেরে ভুলাইলি। আ আরে বসন্ত।

ভারতচন্দ্রের দীর্ঘ চৌপদীর একটি বিশেষ লক্ষণ—প্রথম তিন পদে অধিকাংশস্থলে একই মিল থাকে।

ভারত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় যথাযথ রূপ দান করিয়াছেন। যেমন—ভুজঙ্গপ্রয়াত—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট জটাজূট সংঘট্টগঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া শিব রোষে মহারুদ্র রূপ ধারণ করিয়া দক্ষালয়ে চলিয়াছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের সমাবেশে ভুজঙ্গপ্রয়াতের সাহায্য লইয়া কবি মহাদেবের রুদ্ররূপের আভাস দিয়াছেন। ছন্দের ও শব্দবিন্যাসের গুণে রুদ্রের তাণ্ডবধ্বনি যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

কবি তূণক ছন্দের একটা বাংলারূপ দিয়াছেন। ইহাতে পর্ব্বে

পর্ব্বে মিল ভারতের নিজস্ব যোজনা। দক্ষযজ্ঞনাশের রুদ্রতাণ্ডবের উপযোগী ছন্দ।

ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্রসূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নগকূর্ম্ম নাড়িছে।
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু ছিঁড়িছে।

কিন্তু কবি ক্রমে কৌতুকের সমাবেশ করিয়া ছন্দের এবং সেই সঙ্গে রুদ্রতাণ্ডবের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই।

ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়িছে।
ভুতভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে। ইত্যাদি।

কবি তোটক ছন্দটিকে বড় অপকার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন—

রতিরঙ্গরণে মজিলা দু'জনে। দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।

ভারতচন্দ্রের হাতে পয়ার তাহার সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। কবি এই পয়ারে বড় বড় সংজ্ঞাবাচক শব্দেরও সুবিহিত স্থান দান করিয়াছেন।

জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম। সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম।

হিল্লোলিত পয়ারের রূপ—

কি বলিলি মালিনী লো ফিরে বল বল। রসে তনু ডগমগ মন টলমল।
হিয়া কৈল জরজর আঁখি ছলছল। ভারত ভাবিয়া তায় ভাব ঢলঢল॥

হসন্ত শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগে পয়ারের গতি দ্রুততর হইয়াছে—

আথরপাথর কাট্ কেটে ফেল হাড়। ইট কাট কাঠ কাট মেদিনীপাহাড়॥
ডাকাত ছিনারচোর হাজারহাজার। বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার।

বারো অক্ষরের মাত্রার চরণে একটি করিয়া 'গো' যোগ করিয়া কবি আর এক শ্রেণীর পয়ার লিখিয়াছেন। গো-এর মিল অবশ্য মিল নয়—

মিল তাহার আগেকার বর্ণে বর্ণে। একই 'নি'-এর মিল গোটা কবিতায়—

ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো। তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো।

কবি অর্দ্ধচরণকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া কবিকঙ্কণের অনুসরণে একশ্রেণীর পয়ারও লিখিয়াছেন—

শুন—শ্বশুর ঠাকুর শুন—শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর।

মালঝাঁপ পয়ারেরই একটি রূপ।—তিন পর্ব্বে মিল আছে।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে।

ভারতের রচিতের অমৃতের ভার। ভাষাগীত সুললিত অতুলিত তার।

যেখানে পয়ার পংক্তিতে কবি দীর্ঘস্বরের দীর্ঘমাত্রা স্বীকার করিয়াছেন—সেখানে পয়ার পজ্ঝটিকার রূপ ধরিয়াছে। তবে ইহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

ধাঁধাঁ। গুর গুর। বাজে না-। গারা।
বাজে র-। বাব মৃ-। দঙ্গ দো-। তারা॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ধামালী শ্রেণীর ছন্দের একটি মাত্র উদাহরণ আছে। ভারতের সহযোগী কবি রামপ্রসাদের এই ছন্দই ছিল প্রধান উপজীব্য। এই ছন্দে তিনি চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই ছন্দের যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় তিনিও এই ছন্দে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। যে ধামালী ছন্দে গান রচনা করিয়া রামপ্রসাদ বঙ্গদেশের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ কবি হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র সে ছন্দে কবিতা লিখিলে তাঁহার নাগরিক আভিজাত্য নষ্ট হইবে মনে করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র রঙ্গরসের কবি; তাঁহার কাব্যে এই ছন্দের

উপযোগী বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। ভারতচন্দ্রের রচিত ধামালী ছন্দের গানটি তুলিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি।

আই আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।
উমার কেশ চামর ছটা,
তামার শলা বুড়োর জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া
বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছারকপালে ছাই কপালে দেখেই লাগে ডর লো।
উমার গলে মণির হার
বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন ক'রে ওমা উমা করবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া
ভাঙর পাগল ঐ না বুড়া,
ভারত বলে পাগল নহে অই ভুবনেশ্বর লো॥

ভারতচন্দ্র ছিলেন ভাষার রাজা। কবিতারচনায় শব্দের দৈন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদেরও হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের মিল দেওয়ার জন্য শব্দসম্ভারের ভাণ্ডারে দৈন্য ছিল। ভারতচন্দ্র মিলের জন্য শব্দের দৈন্য কোন দিন অনুভব করেন নাই।

কবিকঙ্কণের ছন্দ ও ভাষা

যে কয়টি কাহিনী লইয়া বাংলার মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনীই প্রধান। এই কাহিনী লইয়া এ দেশে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলই কালের কষ্‌টি পাথরের পরীক্ষায় টিকিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের কালবিজয়ী হওয়ার প্রধান কারণ ইহার ছন্দোরচনার চমৎকারিতা। সে যুগে কবিকঙ্কণের মত অনবদ্য ছন্দোরচনায় দক্ষতা অন্য কবির ছিল না। কবিকঙ্কণের পয়ার আদর্শ পয়ার বলিয়াই গণ্য। তবে মাঝে মাঝে হসন্ত মাত্রাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে পাদকমাত্রিক (Syllabic) ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। যেমন—

হেলন দোলন চলন খানি দেখাইতে পারে,
ভালো হইল আইল সাধু আপনার ঘরে।
উহার হাতে রাঙা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ যে জানে স্ত্রীয়ের কলা মোহন চাতুরী॥
উহার হাতে রাঙা শাঁখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা॥

কবিকঙ্কণ দীর্ঘ ত্রিপদীর খুব অনুরক্ত ছিলেন। কালকেতুর উপাখ্যানে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের খুব বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ছন্দেও মাঝে মাঝে হসন্ত মাত্রাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথবা হসন্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরান্ত ব্যঞ্জন মিলাইয়া একমাত্রা ধরিয়াছেন। ইহাই হইয়া উঠিয়াছিল পরে পাঁচালির প্রধান ছন্দ।

কবি লঘু ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার বেশী করেন নাই।

নিম্নলিখিত অংশ মূলতঃ লঘু ত্রিপদী, কিন্তু শব্দবিন্যাসের গুণে ইহা অভিনব ছন্দঃস্পন্দ লাভ করিয়া নূতন ছন্দেরই রূপ ধরিয়াছে। কবিতার গোড়ায় যে সুর ও ছন্দোহিল্লোল আসিয়া পড়িয়াছে তাহা শেষের দিকে অক্ষর বিন্যাসের নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া গিয়াছে।

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল পাব বহড়ার বদলে গুয়া॥
পাট শণ বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জার বদলে পলা।
চিনির বদলে দানা কর্পূর আলতার বদলে শাটী।
সগল্লাদ বদলে পামরী পাব কম্বল বদলে পাটী।
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হীরা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব জোয়ানী বদলে জিরা॥
চইএর বদলে চন্দন পাব ধূতির বদলে গড়া।
শুকুতা বদলে মুকুতা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাষ মসুরী তণ্ডুল বরবটী বাটলা চণক চিনা।
বলদশকটে তৈল ঘৃত ঘট সদাগর আনিল কিনা*
(এই অংশের একাধিক পাঠান্তর আছে)

* এই কবিতা হইতে বাণিজ্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। কারণ, পণ্যদ্রব্যগুলি ইহাতে ছন্দের প্রয়োজনে সাজানো হইয়াছে মাত্র। প্লবঙ্গ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, শুকুতা, মুকুতা, ইত্যাদি শব্দালঙ্কার সৃষ্টির জন্য ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ চণ্ডীমঙ্গলে অধিকাংশ স্থলেই সুনিয়মিত।

বণিকের সহিত কালকেতুর কথোপকথন—স্তবকবদ্ধভাবে রচিত দীর্ঘ ত্রিপদী। এক একটি স্তবক এইরূপ—

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।

কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ আমি যে আলাঙ তার হেতু॥

বণিক লুকায়ে ঘরে আসিয়া বাণ্যানী তারে বলে ঘরে নাহি জোতদার।

সকালে তোমার খুড়া গেলা খাতকের পাড়া কালি সে মাংসের পাবে ধার॥

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহের কবিতাটিও এইরূপ পাঁচ স্তবকে বিভক্ত। এক একটি স্তবক এইরূপ—

পূরব জন্মের ফলে আসিয়া আমার জলে প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।

মহিষ ছাগল মেষ মায়া কৈলা অবশেষ সেই বধ লাগিবে তোমায়॥

নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।

স্ত্রী হইয়া কৈলা রণ বধিলা অসুরগণ সমরে করিলা পান সুরা॥

স্থলে স্থলে মিলের চাতুর্য্যও আছে। যেমন—

গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব গুরু মোরে কৈল মন্দ।

শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন।

প্রাকৃতের দীর্ঘ ত্রিপদীতে দীর্ঘ স্বরকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এই ছন্দের নিদর্শনও স্থলে স্থলে আছে। যেমন—

জগদবতংসে। পালধি বংশে। নরপতি শ্রীরঘু-। রাম।

শ্রীকবিকঙ্কণ। করয়ে নিবেদন। অভয়া পূর তার। কাম॥

এই ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কবি এই ছন্দের প্রত্যেক পর্ব্বে মিল দিয়া এবং প্রত্যেক পর্ব্বের শেষাক্ষরে দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ রক্ষা করিয়া সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদী ও প্রাকৃতের দীর্ঘ ত্রিপদীর একটা মাঝামাঝি রূপ দিয়াছেন। যেমন—

খরতর নখরে। হয় গজ বিদরে। নৃসিংহরূপিণী। শিবা।
শোণিতের তটিনী। অতিশয় বলনী। নরশির কমঠের। শোভা।
তবকীর গুলি। কানে লাগে তালি। মেঘে যেন বরষয়ে। শিল।
শোণিতের সাগরে। ঘোড়াহাতী সাঁতরে। রাজা যেন ভাসে। তিমিংগিল॥

কবি একটি কবিতায় ছোট ছোট স্তবক রচনাও করিয়াছেন। স্তবকের নমুনা কি কারণে ভাব নাথ দুখ।
বিভারাত্রি অমঙ্গল লোচনে পড়য়ে জল ভৃঙ্গারে পাখাল্য চাঁদমুখ॥

কবি দুইবার একাবলী ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। একবার 'খুল্লনার সাধে'।

যদি ভাল পাই মহিষা দই। ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই।
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়। খেতে মনে সাধ করেছি বড়।

আর একবার শিশু শ্রীমন্তের সোহাগে! এখানে ছন্দ অনিয়মিত।

গগন মণ্ডলে পাতিয়া ফাঁদ। ধরিয়া আনিব গগন চাঁদ।
সে চাঁদ আনি তোয়ে পরাব ফোঁটা। গড়াইয়া দেব সোনার কাঁটা।

এক স্থলে ধামালী বা ছড়ার ছন্দও পৃথকভাবে অর্থাৎ পয়ারের মিশ্রণ না ঘটাইয়াও রচনা করিয়াছেন···

দুই বহিনে দুই সতীনে বসি একুই বাসে।
আঁখ্যার তারা পুত্রহারা মোরে না জিজ্ঞাসে॥
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল সকল লাজে।
নিষেধ না মানে ছুঁড়ী না মানে দোহাই।
ষাঁড়-চায়্যা বুলে যেন বাতানিঞা গাই।
উহার হাতে রাঙা শাঁখা উহার গোরা গা॥
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা।

কবিকঙ্কণের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও চলতি বাংলা শব্দের সুন্দর সম্মিলন ঘটিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের বহু বাংলা শব্দ এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে,—কোন কোন শব্দ এখনও রাঢ়দেশে প্রচলিত আছে। বুহিতাল, উড়ুষ, বুহিত, গাবর, ঋারি, মেলানি, কাঁড়, অগলী, রেজা, নেজা, মাকন্দ, দম্ভোল, আয়াত, লালমডোর, ঘড়াল, দিশপাশ, আওয়ার, ঘনা, দাপনি, নেত, ধাওয়াধাই, পাকল, জেঠী, নিবড়িল, বালতী, তপাস, বাহুড়িয়া, নেউটিয়া, গাড়র, ফেফাতুয়া, ঢোল ইত্যাদি শব্দের আর প্রচলন নাই। কাঁথ, খাঁকার, পৌটি, উটকানো, লেটা, পগার, পাখলানো, পারোশ, জোখা, ছোঁচা, আড়া, পেলা, হাপুতি, ডেও, তামী, ঠেকার, ছাঁই, ন্যাকার, ভুঁকে, হোলা ইত্যাদি শব্দ এখনো রাঢ়দেশে চলে। কবিকঙ্কণ সফর, ইনাম, সদাগর, দলিজ, মোকাম, শিরান, নিকাহ্, ফরিয়াদ, উজবুক, খানখানা, সীপ, ফারমানি, শিকার, নিশান, জিঞ্জির, আন্দাস, বেগর, কারিগর ইত্যাদি পার্শী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কবি আয়তি অর্থে আয়াত, হিমালয় (হিমবন্ত) অর্থে—হেমন্ত, আদেশ অর্থে আরতি, তৃষ্ণা অর্থে শোষ, ডাকাতি অর্থে ডাকা, যোদ্ধা অর্থে যুঝারিয়া, ব্যবহারের স্থলে ব্যভার, বিবাহের বদলে বিভা, নগরকোটাল অর্থে নিশীশ্বর, পীড়ি অর্থে পৃষ্ঠা, ধূলি অর্থে পরাগ, অরি অর্থে ঐরী; অশ্রুপূর্ণ অর্থে অশ্রুত, ছাগলী অর্থে ছেলী, সহিত অর্থে সংহতি ব্যবহার করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুখের চল্‌তি কথাও ব্যবহার করিয়াছেন—যেমন—বয়েস, অতিথ, পুতস্তি, হাপুতি, অল্লাই।

কবি বাংলায় অপ্রচলিত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—তুণ্ড, ভ্রমসি, আখেটিক; সব্যকর।

কতকগুলি অলঙ্কৃত বাক্য—

রূপনাশ কৈলা প্রিয়া রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলা কাচের বদলে!
নারীর পরম ধন যৌবনসম্পদ। যৌবন ফুরালে আর কি করে ঔষধ।
কর নানাপরিবন্ধ লেপহ কুমকুমগন্ধ আর নাহি উঠিবে যৌবন।
নিরবাণ অনলেতে যদি দিই ফুক। উতকট করে প্রাণ ছাইএ পুরে মুখ।

পূর্ব্বে জানিতাম আমি অধীন আমার স্বামী স্মরজোরে পোহাব রজনী।
না জানি দৈবের মায়া আনি কোন পথ দিয়া নারিকেলে সান্ধাইল পানি॥
জানিতুঁ এমন যদি বিপাকে পাড়িবে বিধি করিতাঙ প্রকার প্রবন্ধ।
শুনগো শুনগো সই লোচনে দংশিল অই কোনখানে দিব তাগাবন্ধ॥

একফুলে মকরন্দ পান করি প্রেমানন্দ ধায় অলি অপর কুসুমে।
এক ঘরে পায়্যা মান গ্রামযাজী দ্বিজ যান অন্যঘরে তেমনি সম্ভ্রমে।

এতেক সাজনী ছার নরের কারণে। গরুড় সাজিল কিবা মূষিকের রণে॥
তোমার সমরে হরিহর দেয় ভঙ্গ। গাড়লের রণে কেবা যুঝায় মাতঙ্গ॥

না জানি কেমন পত্র আইল বিপাকে। আরোহণ করে মন কুমারের চাকে।

অসাধুর বোল কিবা যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা প্রবেশয়ে ভিতরে বাহিরে
সুকৃতীজনের অন্ত যেন কুঞ্জরের দন্ত নাহি গিয়া প্রবেশে অন্তরে।

জাতীয় জীবন ও প্রাচীন সাহিত্য

সাহিত্য জাতীয় জীবনেরই অভিব্যক্তি। সাহিত্যের চিক্কণ মসৃণ অঙ্গে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত হয়। জাতীয় চরিত্রই সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর রূপ লাভ করে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, তাই তাহার সাহিত্যে ভাবাকুলতার প্রাবল্য। বাঙ্গালী জাতি যেমন, তাহার সাহিত্যও হইয়াছে তেমনি। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, ঈসাখাঁর শৌর্য্যের আজ আমরা যতই গুণ গান করি না কেন, তাঁহাদের শৌর্য্যাবদান সেকালে কোন সাহিত্যেরই প্রেরণা দেয় নাই। কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালী জাতির চরিত্রেই পৌরুষ ও শৌর্য্যের অভাব। কাজেই ইতিহাসে শৌর্য্যের দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার সাহিত্যে শৌর্য্যভাব বা পৌরুষভাব প্রাধান্য লাভ করে নাই।

বাঙ্গালী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, পুরুষকারকে নিয়তির চেয়ে হীনশক্তি মনে করে। তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যে অদৃষ্টের দোহাইএর ছড়াছড়ি। বাঙ্গালীর রামচন্দ্র লবকুশের কাছে হারিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ও অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছে। পুরুষকারের অবতার ধনপতি ও চাঁদের পরাজয় ঘটাইয়া তবে বাঙ্গালী কবি স্বস্তি পাইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তথাকথিত বীরগণ—রামচন্দ্র, লাউসেন, ইছাই ঘোষ, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের বলে বলী হইয়াই জয়ী হইয়াছেন। নিয়তি ও দৈবশক্তি পুরুষকারের চেয়ে ঢের বড়। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন অভয়া বিমুখী হওয়াতেই প্রতাপের পতন। নিজের সাধনায় ও বিক্রমে মানুষ কত বড় হইতে পারে,

তাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে পাই না ; দৈব শক্তি লাভ করিয়া বা গুরুদত্ত যোগশক্তি লাভ করিয়া সে অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছে—এইকথাই সাহিত্যে বিশেষ মর্য্যাদা পাইয়াছে।

অল্পেতেই বাঙ্গালীর চোখে জল পড়ে। তাহার অন্তর কারুণ্যময়, মমতায় ভরা। তাই তাহার সাহিত্য চোখের জলেরই সাহিত্য ; কেবল দুঃখের অশ্রু নয়, প্রেমের অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, রূপোন্মাদের অশ্রু, বাৎসল্যের অশ্রু, এমনকি আনন্দেরও অশ্রু। তাই মেনকা উমাকে বক্ষে ফিরিয়া পাইয়া কাঁদিয়াই আকুল। তাই বাঙ্গালী কবি লেখেন— "দুহুঁ ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

বাঙ্গালী ভক্তি-প্রবণ, তাই বাঙ্গালী সাহিত্যে ভক্তির ছড়াছড়ি। এই ভক্তিই বাঙ্গালীর কাব্যে কত রসের সহিতই না মিশিয়াছে, কত রূপ-রূপান্তরই না লাভ করিয়াছে! বাঙ্গালী ধর্ম্মভীরু ও স্নেহভীরু। বাঙ্গালীর ভীতি-বৈচিত্র্য হইতেই নানা দেবতার উৎপত্তি। সেই দেবতাদের শঙ্কাবহ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জন্য রচিত হইয়াছে বহু সাহিত্য। বাঙ্গালীর সাহিত্য উপদ্রুত ও লাঞ্ছিত হওযার, বিপন্ন হওয়ার ও শেষপর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করার চিত্রে পরিপূর্ণ। যেখানে শৌর্য্যের বর্ণনা, সেখানে রচনা তেমন বাস্তবনিষ্ঠ হয় নাই, যেখানে পরাজয়ের বর্ণনা সেখানেই যেন একটা স্বাভাবিক প্রাণবত্তার সঞ্চার হইয়াছে।

বাঙ্গালী নিঃসঙ্কিগ্ধ ও সরল জাতি। ভয়াতুরতা ও এই সারল্য তাহার বিচারবোধ ও সন্দেহ করিবার সুস্থ সরল মনোবৃত্তি হরণ করিয়াছে। ইহাতে তাহার বিশ্বাস করিবার শক্তি হইয়াছে অগাধ। অতিলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত অবাস্তব সমস্তই সে বিশ্বাস করে। তাই তাহার সাহিত্য অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কল্পিত সংঘটনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালী গতানুগতিক জাতি, নূতন কিছু আবিষ্কার করিবার শক্তি তাহার ছিল না। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে সে একটাও নূতন আখ্যানবস্তুর আবিষ্কার করিতে পারিত না। ৫।৬ শত বৎসর ধরিয়া তাহারা তাই চারটি আখ্যানবস্তু লইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়াছে। নূতন রচনাভঙ্গীও তাহার মাথায় আসে নাই। তাই একই বিষয় লইয়া একই ভঙ্গীতে শত শত কবি কাব্য বা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। একই ধরণের রচনার পুনরাবৃত্তি করিতে সে সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

পরাধীন রাষ্ট্রিয় জীবনে নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও সে যেমন বিদ্রোহী হয় নাই—সাত বৎসর ধরিয়া আবিসিনিয়ার খোজার রাজত্ব শাসনেও তাহার আত্মমর্য্যাদা মাথা তুলিয়া উঠে নাই। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই। বাঁধা পথ হইতে সে একচুলও নড়ে নাই। খৃষ্টান মাইকেলের মত প্রচলিত পদ্ধতিকে সবলে সরাইয়া দিয়া নূতন ভাবভঙ্গী বা নূতন আদর্শের একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

বাঙ্গালী উচ্চাভিলাষবর্জিত, অল্পে সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় জাতি। তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে সংকীর্ণ গৃহসংসারের অনাড়ম্বর স্বস্তিশান্তির কথাই খুব ফুটিয়াছে। গাঙ্গিনী নদীর নেয়ে অন্নদার সাক্ষাৎ পাইয়া বর চাহিয়াছে, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে", ইহার বেশী কিছু না। কবি নিজেও অন্নদার কাছে অন্ন ছাড়া আর কিছু চান নাই। শিবায়নের শাশুড়ী জামাতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে "হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত।"

বাঙ্গালী রসিক জাতি, হাস্য-পরিহাস ঠাট্টা তামাসা আমোদ প্রমোদ ভালবাসে। তাই তাহার সাহিত্যে হাস্যপরিহাসের অভাব নাই। দেবতাদের লইয়াও সে হাস্যপরিহাস করিয়াছে। হর-গৌরী, রাধা-

কৃষ্ণও রঙ্গরসিকতার দ্বারা সাহিত্যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু আমোদ প্রমোদের জন্যই সে বহু সাহিত্য রচনা করিয়াছে। এ যুগের কবি তাই বলিয়াছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'।

বাঙ্গালী রসকলহ, কথাকাটাকাটি, বিবাদ, দলাদলি ও গালাগালি ভালবাসে—এইগুলি তাহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে কবির গান পর্য্যন্ত সর্বত্রই প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালী বড় দরিদ্র জাতি, দারিদ্র্যের দুঃখ চিরকালই তাহাকে পীড়া দিয়াছে। প্রাকৃতিক উপদ্রব, ও সামাজিক উপদ্রব, রাজকীয় উপদ্রব, আলস্য, গৃহসুখপ্রিয়তা, স্বল্পে সন্তুষ্টি, অদৃষ্টবাদ, দেশাচারনিষ্ঠতা, উদ্যমহীনতা চিরদিনই তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। এই দারিদ্র্যের দুঃখ তাহার সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

দারিদ্র্য হইতেই অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে ভোজনলালসা। এই ভোজনলালসা প্রাচীন সাহিত্যে বহু স্থলেই ফুটিয়াছে। এমন কাব্য নাই যাহাতে উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা নাই। এমন কাব্য নাই, যাহাতে ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা ভোক্তার তৃপ্তিসঞ্চারের চেষ্টা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত তত্ত্বমূলক কাব্যেও নিরামিষ ভোজ্যদ্রব্যের লম্বা লম্বা তালিকা আছে। ভক্তেরা বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারাই শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তিপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে।

বাঙ্গালী সুর অপেক্ষা ভাবেরই অধিকতর পক্ষপাতী। তাই তাহার সঙ্গীতে ভাবাকুলতার প্রাবল্য। ভাবপ্রধান কীর্ত্তনগানের সৃষ্টি বাংলা দেশেই হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

নারী জাতির প্রতি বাঙ্গালী বেশ সুবিচার করিত না তাহাদিগকে অতিরিক্ত শাসনে রাখিতে চাহিত। সেজন্য তাহার সাহিত্যে নারী-নির্য্যাতন, নারীর সতীত্বপরীক্ষা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত এত বেশী।

বাঙ্গালীর কাব্যে ও উপকথায় 'বড়র ঝিয়ারী' 'বড়র বৌয়ারীদেরও' দুঃখিনী জীবন যাপন করিতে হইয়াছে।

নারীজাতির সতীত্বের আদর্শ খুবই উচ্চ ছিল। পাতিব্রত্য ও একনিষ্ঠতা তাহাদের পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। সাহিত্যে পাতিব্রত্যধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন যেমন দেখা যায়, সতীত্বের জন্য নারীর আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তও তেমনি দেখা যায়।

বাঙ্গালী মায়ের অন্তর ননী দিয়া গড়া, তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যে কৌশল্যা, কুন্তী, ময়নামতী, যশোদা, মেনকা, সুমিত্রা, সনকা, ইত্যাদি জগতের আদর্শ মমতাময়ী জননী রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

একটানা 'একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জাতীয় জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না। সাহিত্যের বিবিধ শাখার মধ্যে এক গীতিকবিতার জন্ম হইতে পারে—তাহাতেও বৈচিত্র্য থাকে না।

জাতীয় জীবনে গৌরবময় বৈচিত্র্য ঘটিলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্রিয়াশক্তি শতগুণে বাড়িয়া যায় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়। ইউরোপে Augustus এর সময় রোমে, এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে, ষোড়শ লুই এর সময় ফ্রান্সে এবং আমাদের দেশে গুপ্তরাজদের সময়ে ও হর্ষবর্দ্ধনের সময় যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার কারণ কি জাতীয় জীবনের বিজয়োজ্জ্বল শ্রীবৃদ্ধি নয়?

আমাদের বাঙ্গালীজাতির জীবনে সে বিজয়শ্রী—সে গৌরব কোনদিন আসে নাই। আমাদের জাতীয় জীবনে অন্যপ্রকার বৈচিত্র্যেরও অভাব! একটানা বৈচিত্র্যহীন জীবনে ক্রমে উদ্ভাবনী শক্তি লোপ পায়—উদ্ভাবনী শক্তি লোপ পাইলে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি কোথা হইতে হইবে? বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ সাহিত্যের কাঠামো বা কঙ্কাল, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যের প্রতিমা গঠিত হয়। সাহিত্যে

তাহার মূল্য কম নয়। এই বিষয়বস্তুতে যদি অপূর্ব্বতা না থাকে, তবে তাহা সাহিত্যের আশ্রয় লইতে পারে না। জাতীয় জীবনে কোন প্রকার বিশিষ্ট ঘটনাসংঘাত বা আলোড়ন না আসিলে অপূর্ব্ব বিষয়বস্তু লাভ করা যায় না।

সাহিত্যের আখ্যান রচিত হয় যে সকল উপকরণ উপাদানে তাহা পাওয়া যায় জাতীয় জীবনের উত্থানপতন, সংঘর্ষদ্বন্দ্ব, আলোড়ন ও চঞ্চলতা হইতে—ঘটনাপরম্পরার সংঘাত হইতে। যেখানে এই সকলের অভাব, সেখানে মানুষের কল্পনার পাথায় পক্ষাঘাত হয়--তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমে লোপ পায়। আমাদের দেশে উদ্ভাবনী শক্তি যে একেবারে লোপ পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের অসংখ্য কাব্যের মাত্র ৫।৬টির বেশী বিষয়বস্তু ছিল না। শ্রীকৃষ্ণলীলা, লাউসেনের গল্প, চাঁদসদাগরের গল্প, ধনপতি শ্রীমন্তের গল্প ও বিদ্যাসুন্দরের গল্পই ছিল সম্বল। এই কয়টির এক-একটি আখ্যান লইয়া পাঁচশত বৎসর ধরিয়া অগণ্য কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন—নূতন কোন আখ্যানবস্তুর আবিষ্ক্রিয়া বা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই—এমন কি করিবার প্রয়োজন আছে, তাহাও মনে করেন নাই। জাতীয় জীবন যদি বৈচিত্র্যহীন না হইত—তাহা হইলে জাতীয় জীবনই বহু বিষয়বস্তু দিতে পারিত—কবির কল্পনাকে ক্রিয়াশীল ও ভাববস্তুর সন্ধানে প্ররোচিত করিত—অনুরূপ বিষয়বস্তু সৃজন করিতে প্রবৃত্তি দান করিত!

আখ্যানবস্তুর অভাবে ও নবপ্রবর্ত্তনার প্রবৃত্তির অভাবে দেশে নাটক, কথাসাহিত্য, মহাকাব্য ইত্যাদি আখ্যানমূলক সাহিত্যের সৃষ্টিই হয় নাই। আখ্যানবস্তুর নিজেরই এমন একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রবণতা থাকে যে প্রবৃত্তি বা প্রবণতাই নির্দ্দেশ দেয় তাহা উপন্যাসে, কি কাব্যে, কি নাট্যে রূপলাভ করিবে। কবিদের মাথায়

এমন কোন আখ্যানবস্তু আসেই নাই, যাহা তাঁহাদিগকে কথাসাহিত্য বা নাট্যে বাণীরূপ দিতে প্রবর্ত্তিত করে। প্রাচীন কবিগণ নাট্য কাহাকে বলে—কথাসাহিত্য কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না তাহা নয়—কারণ সংস্কৃতে সবই ছিল।

বিজেতা ও শাসক শ্রেণীর নির্য্যাতন ও উপদ্রব সাহিত্যসৃষ্টির পরম বাধা। ইংলণ্ডে এই উপদ্রব হয় নাই—তাহার ফলে ইংলণ্ডের সাহিত্যধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ফ্রান্সে তাহা চলে নাই, Valois ও Bourbon রাজগণের অত্যাচারে, Louis XIV এর খড়্গ শাসনে এবং ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডবলীলায় সাহিত্যসৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্পেনেও Inquisitionএর অত্যাচারে সাহিত্যসৃজনশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশের সম্বন্ধেও একথা হয়ত সত্য। কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেনে খড়্গশাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল—পরে সেই চেষ্টা ও মুক্তির আনন্দ সাহিত্যসৃষ্টির প্রচুর প্রেরণা দিয়াছিল। বঙ্গদেশে সে চেষ্টাও হয় নাই—মুক্তির আনন্দ ত দূরের কথা।

Arthur এর Round Table অথবা Charlemagneএর Knightদের কাহিনীর মত শৌর্য্যকাহিনী আমরা পাই নাই। স্কটলণ্ডের Ministrelরা, দক্ষিণ ফ্রান্সের Troubadarরা এবং রাজপুতনার চারণকবিগণ যে শৌর্য্য-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালীরা রাজপুতনার বীরজীবনের সংবাদই রাখিত না। ইউরোপে কোন জাতির মধ্যে একটা দশাবিপর্য্যয় ঘটিলে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্যজগৎ আলোড়িত হইত। ফরাসী বিপ্লবই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের দিল্লীর সিংহাসন টলিলেও বাঙ্গালীর ধ্যানভঙ্গ হইবার সুযোগ ঘটিত না। রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী-উৎসব কবিতায় তাহাই বলিয়াছেন।

ফলে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতীয় উত্থানপতনও বাঙ্গালী জীবনে সাহিত্যসৃষ্টিতে কোন প্রেরণা দেয় নাই। এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকদের স্বাধীনতাসংগ্রামও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মর্ম্মস্পর্শ করে নাই। এমন কি শিবাজীর কথাও বাঙ্গালীর কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই কবিগুরু বলিয়াছেন—

"সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে, পায়নি সংবাদ।
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে শুভশঙ্খনাদ।"

বাঙ্গালী জাতির জীবনের মস্তবড় ঘটনা মুসলমান অধিকার। এই অধিকার হইয়াছে বিনা যুদ্ধে অবাধে। এদেশ পাঠানদের অধিকৃত হইলেও তাহাতে জাতীয় জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। পাঠানরা রাজ্য অধিকার করিল, কিন্তু বাঙ্গালীর মনের রাজ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। তাহারা শিক্ষাদীক্ষাসভ্যতার এমন কোন বিশিষ্ট ধারা এদেশে আনিতে পারে নাই, যাহাতে বাঙ্গালীর জীবনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। বাঙ্গালীর রাজধানীতে করগ্রাহী প্রবল ব্যক্তি হিন্দুই থাকুক, বৌদ্ধই থাকুক, আর মুসলমানই থাকুক তাহাতে বাঙ্গালী জাতির কিছুই যায় আসে নাই। যেভাবে মুকুট ও সিংহাসন হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহাতে জাতীয় জীবনে কোন আলোড়নই জাগে নাই। পাঠান যুগে দেশে যুদ্ধ দুই একটা যাহা হইয়াছিল—তাহা দিল্লীর ফৌজের সঙ্গে বাংলার সুলতানী ফৌজের। তাহার সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে কোন প্রাণের যোগ ছিল না। মোগল যুগে দিল্লীর ফৌজের ভৌমিকদের রাজ্য দখলকেও আসল যুদ্ধ বলা যায় না। বাঙ্গালী জাতিকে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় নাই, নূতন রাজাকে বাধা দিতেও হয় নাই, একদিনের জন্য দেশে একটা চাঞ্চল্যকর

সাড়া পড়িয়াও যায় নাই—তাহাদের একটানা জীবনস্রোতে সামান্য একটু বিক্ষোভও জাগে নাই। নূতন রাজার আগমে এমন একটা বিদ্রোহও হয় নাই যে জন্য সে রাজাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল বা দেশে কোন প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময় যেমন বাঙ্গালীরা আম্রবণচ্ছায়ায় মহাভারত রামায়ণের কাহিনী শুনিত, তোগলক খিলিজীদের সময়েও তাহাই শুনিয়া অবসরকাল কাটাইত।

পাঠানরাজত্বের কালে দেশে একটি নূতন ধর্ম্মের প্রবেশ লাভ ঘটিল। তাহাতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষ বাধিল, ইহাতে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল তাহার ফল অবশ্যই আমরা পাইয়াছি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষের ফলে দেশে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল—আঘাতের দ্বারা লুপ্ত হিন্দুধর্ম্ম জাগিয়া উঠিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। ঐ ধর্ম্মের বাণী লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। সমগ্র দেশের ভাবজীবনে একটা বিরাট আলোড়ন আসিল—দেশের বহির্জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে তিনি আবির্ভূত হ'ন নাই। ভাবজীবন আলোড়িত, উন্মাদিত, উল্লসিত হওয়ার যে ফল দেশ তাহা লাভ করিল। ভাবজীবনের বিক্ষোভে গীতি কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে—বঙ্গদেশে যে গীতিকবিতার প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বন্যার ফলে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল।"

কথিত আছে—বিরূপাক্ষ নামক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ যে বিগ্রহে দৈবীশক্তি না থাকিত সেই বিগ্রহকে প্রণাম করিলেই তাহা ফাটিয়া

যাইত। তিনি এই ভাবে বাংলা দেশের দেবতা ফাটাইয়া বেড়াইতেন—তাহা হইতে একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে কালাপাহাড়ের কাট আর বিরূপাক্ষের ফাট। সম্ভবতঃ বিরূপাক্ষ যোগসিদ্ধি-শক্তিবলে বাঙ্গালার দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেব দেবীর বোধহয় বিরূপাক্ষের চেষ্টাতেই তিরোধান ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে বাঙ্গলায় মৃন্ময়ী মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত হয়।

যাহাই হউক একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেবদেবীর পূজার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য দেবদেবীর নূতন করিয়া মহিমা কীর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

মনে হয় কালাপাহাড়ের দেবমন্দিরধ্বংসও ঐ দিকে কিছু সহায়তা করিয়াছিল। কালাপাহাড় যখন অনায়াসে দেববিগ্রহ ও মন্দির চূর্ণ করিতে লাগিলেন, দেবতারা আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না—তখন ভক্তদের মনেও দেবতাদের সিংহাসন টলিল। কালাপাহাড় তাহার কুঠারাঘাতে বাঙ্গালীর মনের বিগ্রহও চূর্ণ করিয়াছিলেন ইহাই স্বাভাবিক। ভক্তদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস ছিল, দেবতার অঙ্গে হাত দিলে কালাপাহাড়ের শিরে বজ্রাঘাত হইবে। যাহাই হউক, দেবতাদের তখন দুর্দ্দশার অবধি থাকিল না। তখন দেবপূজাই যাহাদের উপজীবিকা, দেবতাই যাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন, মানুষের মনে তাহাদের প্রয়োজন হইল দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার অর্থাৎ দেবতারা তখন ভক্ত সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

তাহা ছাড়া, মুসলমান ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও সংঘর্ষ ছিল—তাহাতে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইত। ইহার ফলেই কি মঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি না হউক, পুষ্টি?

বঙ্গদেশে তিন চারদিনের জন্য মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার পূজাপদ্ধতি হইতেই বোধ হয় আগমনী-বিজয়ার গানের সূত্রপাত হইয়াছে।

মোগলদের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বারভূইঞারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ইহাতে নিশ্চয়ই জাতীয় জীবনে অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী জীবনে একটা চাঞ্চল্য, একটা উদ্দীপনা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অনিবার্য্য সাক্ষী যে সাহিত্য, তাহা কই? ঐতিহাসিকরা বলেন—বারভূইঞাদের বিদ্রোহ নিতান্তই ব্যক্তিগত, আদৌ জাতিগত নয়। সেজন্য উহা জাতীয় জীবনকে বিচলিত করে নাই।

নবাবী আমলে এদেশে বর্গীর উপদ্রব হইত—তাহাতে বাঙ্গালী জীবনে একটি ভাবের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল—তাহার নাম ভীতি। প্রীতি হইতেই সাহিত্য জন্মে,—ভীতি হইতে ঘুমপাড়ানী গান ছাড়া আর কিছুর জন্ম হইতে পারে না। বাঙ্গালী ছেলেভুলানো ছড়ায় বর্গীর উপদ্রবকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

জাতীয় জীবনে প্রকৃত বৈচিত্র্য ঘটিল ইংরাজের আগমনে। এ বৈচিত্র্য গৌরবময় নয় বটে,—কিন্তু ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে দারুণ আলোড়ন উপস্থিত হইল, জীবনধারা একেবারে আমূল বদলাইয়া গেল। ভাবজীবনে যেমন পরিবর্ত্তন আসিল, বহির্জীবনেও তেমনি পরিবর্ত্তন আসিল। ইংরাজ আমাদের শুধু রাজ্য জয় করে নাই, মনও জয় করিয়াছে। রোমানরা যেমন দেশ জয় করিয়া দেশবাসীকে Romanise করিত, গ্রীকরা—Hellenise করিত, ইংরাজ তেমনি আমাদের Anglicise করিয়াছে। তাহার ফলে, আমরা তাহাদের আদর্শ, ভাব, চিন্তা, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা এমনকি তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষারও অধিকারী হইয়াছি। ইহার ফলে সাহিত্যসৃষ্টি অনিবার্য্য। অবশ্য ইহাতে যে

সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য নয়—তাহা ইউরোপের সাহিত্যেরই অনুকৃতি। অনুকৃতি হইলেও ইহার মূল্য যথেষ্ট। মাইকেল হইতেই এই সাহিত্যের ধারার সূত্রপাত হইয়াছে। বিলাতী আদর্শ, শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবচিন্তা আমাদের নিজস্ব সুপ্ত শক্তিসামর্থ্য ও ভারতীয় আদর্শকেও আজ প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও অন্য জাতির জীবনের বিপর্য্যয়-বিপ্লব যদি বিশ্বতোমুখী হয়, তবে এযুগে সকল জাতির জীবনকে আন্দোলিত করিতে পারে। প্রাচীন যুগে ইহা সম্ভব হইত না। কারণ, বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান বা প্রাণের গভীর যোগ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে কোন জাতির জীবনের একটা বৈচিত্র্যময় আলোড়ন বিশ্বের সকল জাতিকেই প্রভাবিত করে। শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক হইতে ত বটেই, অন্যান্য জাতির চিন্তারাজ্য ও রসসৃষ্টির রাজ্যেও একটা ভাব চেতনা আনয়ন করে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "ইউরোপের ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। সেইজন্য দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দবোধের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই, সেই সময়েই ইউরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছিল। আমাদেরও সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদের মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দ্দেশ করল বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য সম্পদও আপন উদ্ভব-স্থানকে

অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়।

একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্ম্মই হোক, রাজশক্তিই হোক, যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় যে সাহিত্য সে সাহিত্য সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য। সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা।"

বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথে জগতের জাতিতে জাতিতে প্রাণের গভীর যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন জাতির জীবনে বৈশ্বমানবিক আদর্শের বিপ্লব, বিপর্য্যয় বা আলোড়ন ঘটিলে সকল জাতির জীবনকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে, নবচেতনা প্রবুদ্ধ করে এবং সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। এই সৃষ্টিও হয় বিশ্বতোমুখী—তাহা স্বদেশের চিন্তা, কল্পনা বা বাসনার আবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আপন উদ্ভব-স্থানকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগৎ ও সমগ্র কালের দিকে বিস্তারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবপুষ্ট ইউরোপীয় চিন্তাধারাই রবীন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই বিশ্বতোমুখী—তাহার প্রসার বঙ্গদেশ এমনকি ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপীয় চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাজীবনে এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে, তাহার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও রবীন্দ্রসাহিত্য।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের প্রভাব

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বঙ্গসরস্বতী একদিকে সর্বপ্রথম গ্রাম্য পরিবেষ্টনী হইতে নগর-পথে প্রবেশ করিলেন, অন্যদিকে পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে ঐতিহাসিক গণ্ডীর মধ্যে পদার্পণ করিলেন। অন্নদামঙ্গলে গ্রাম্যতা ও নাগরিকত্বা, পুরাণ ও ইতিহাস, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়াছে।

কেবল নগরের রাজপথে নয় একেবারে নগরের রাজসভায় বঙ্গবাণীর সহসা আবির্ভাব হইল। তাঁহার সাজসজ্জাও হইল রাজসভারই উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন:

"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো। যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

অন্নদামঙ্গলে বাঙ্গালার তৎকালপ্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারা যেমন একদিকে অনুসৃত হইয়াছে, তেমনি পরবর্তী যুগের কাব্যধারারও সূত্রপাত হইয়াছে। একদিকে যেমন রাজকীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার অনুস্যূতি ঘটিয়াছে—অন্যদিকে তেমনি কাব্যের প্রাচীন আদর্শের সহিত অর্বাচীন আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে কেবল ভাবে নয়, ভঙ্গীতে, ভাষায় ও রসলীলায়। বাংলার সম্পূর্ণ স্বকীয় কাব্যধারার অনুবর্তন করিতে যাইলে বলিতে হয়, ঈশ্বর গুপ্ত ন'ন, ভারতচন্দ্রই যুগসন্ধির কবি।

গীতিকাব্যের সহিত চিত্রাত্মক কাব্যের শুভসম্মিলন হইয়াছে অন্নদামঙ্গলে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অন্নদামঙ্গল অনেকটা

গীতিরসপ্রধান। ইহাতে প্রসঙ্গপল্লবের মাঝে মাঝে অনেক গীতিকুসুম সৌরভ বিস্তার করিতেছে। এইজন্যই অন্নদামঙ্গলের অংশবিশেষকে পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ গীতিনাট্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অন্নদামঙ্গলের পটভূমিকার শ্যামশ্রী অধিকতর সুরভিত। বাংলার কাব্যকাননে ভারতচন্দ্র উদ্যানের পারিপাট্য ও মালঞ্চের পরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি করিয়াছেন। হীরা মালিনীর মালঞ্চের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের উপমা চলিতে পারে। দুইয়েতেই বসন্ত ছাড়া অন্য ঋতু নাই।

অন্নদামঙ্গলের ভাষাতেই বর্তমান যুগের আদর্শ ভাষার সূত্রপাত। নব-যুগের সূত্রধার ঈশ্বর গুপ্ত ভাষার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রেরই শিষ্য, মূলাজোড় হইতে কাঁচড়াপাড়ার দূরত্ব ত বেশি নয়। অন্নদামঙ্গলের ভাষা বর্তমান যুগের ভাষার মতো "যাবনীমিশাল।" সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলির রূপ বর্ত্তমান যুগেরই মত। ভারতচন্দ্রের প্রত্যেক প্রবাদ-প্রবচন ও লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ আমাদের সুপরিচিত। বাংলার প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন যেমন তাঁহার রচনায় অবাধ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাঁহার রচিত সুবচনগুলি তেমনি বর্ত্তমান যুগে অভিনব প্রবচনে পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণা এই চারিটি জেলার গভীর সম্বন্ধ। এই চারি জেলার ভাষণভঙ্গীর বৈচিত্র্যের সমন্বয় লাভ করিয়াছে ভারতের ভারতীতে। আজিও ইহাই বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ভাষা।

ভারতচন্দ্রের রচনায় classical শৈলীর সঙ্গে Romantic শৈলীর কলাসঙ্গত সমাবেশ ঘটিয়াছে। সংস্কৃতানুগ আলঙ্কারিকতার সঙ্গে খাঁটি বাংলার রঙ্গরসিকতা, অন্নপূর্ণার মুখের শ্লেষোক্তির সঙ্গে

নিরক্ষর পাটনীর বাঙ্গালীজনসুলভ সরল আকিঞ্চন, অবাঙ্গালী (?) বীরসিংহতনয়া বিদ্যার বৈদগ্ধ্যের পাশে খাঁটি বাঙ্গালী মালিনীর হাবভাব ঠারঠমক, অন্নদার রাজরাজেশ্বরী মূর্তির পাশে জরতীবেশে মহামায়ার মায়ারূপ—এই সমস্ত classical ঢঙের সঙ্গে Romantic ঢঙের মিলনের নিদর্শন।

রাজকবি কেবল রাজকীয় ঐশ্বর্যেরই বর্ণনা করেন নাই। বাংলার চিরন্তন দারিদ্র্যও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। হরিহোড়ের জননীর কাঙালিনী রূপ তূলিকার একটি পোঁচেই অনন্যসাধারণ হইয়া ফুটিয়াছে। রাজপুরীর অতি নিকটেই আমরা দেখিতে পাই হীরা মালিনীর কুটীর। ভারতচন্দ্রের রাজসভা যাহাই হউক—তাঁহার দেশ ভিখারী শিবের দেশ। সেই শিবের সব দিন ভিক্ষাও মিলে না। ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা ও ধনেশ্বরের মধ্যে কেবল অন্নদার কৃপার তারতম্য ছাড়া অন্য কোন প্রভেদ নাই, সন্তান দুধেভাতে থাকিলেই সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের চরম চরিতার্থতা—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মহাকবি রাজসভায় গৌরবাসন পাইয়াও এসব কথা ভোলেন নাই।

অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা—ইহাতে দেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্মদ্বন্দ্বের নিরসন হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলে চণ্ডীদেবীই সর্বদ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া তাঁহার রুদ্রাণী রূপ পরিহার করিয়া ভক্তবৎসলা অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করিয়াছেন। কোন দেবতার সঙ্গে তাঁহার আর দ্বন্দ্ব নাই। বরং কাহারো মনে সেরূপ দ্বন্দ্বের উদয় হইয়া থাকিলে তিনি তাহার নিরসন করিয়া দিতেছেন। যে ব্যাসকে হরি ত্যাগ করিলেন, হর নানাভাবে বিড়ম্বিত করিলেন, ব্রহ্মা আশ্রয় দিলেন না, গঙ্গা যাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না, ভক্তবৎসলা অন্নদা

তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। জননী সন্তানকে শাসন করিতে পারেন, কিন্তু ত্যাগ করিতে ত পারেন না।

"জগজ্জননী মাতা সবারে সমান। শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
হরিহর সকলেরই শত্রু মিত্র আছে। শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥"

অন্নদামঙ্গল পড়িলে মনে হয়, ভয়ের তাড়নায় যে ভক্তি তাহার দিন ফুরাইয়াছে—করুণা ও তজ্জাত কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়া সহজ স্বাভাবিক ভক্তির দিনের সূত্রপাত ভারতচন্দ্র হইতেই।

ভারতচন্দ্রের পর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে অপূর্ব্ব যুগান্তর, রূপান্তর ও বৈচিত্র্য ঘটিল, তাহাতে সবই ওলটপালট হইয়া গেল! জাতীয় জীবনধারা নূতন বেগ, নূতন গতি পাইল। যাহা কিছু সংস্কারবদ্ধ, (conventional), নিয়মকানুন বিধিগণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন তাহা ক্রমে লোপ পাইল। রামপ্রসাদের কবিজীবনেই নবীন যুগের শুকতারার আবির্ভাব হইয়াছে। রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন—অতএব তাঁহার জীবনেই প্রাচীন যুগের শেষ হইয়াছে। পদাবলীর রামপ্রসাদ যে গীতিধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, উপাখ্যানমূলক ভারতচন্দ্রের ধারা পাঁচালীর মধ্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের পর সাহিত্যে যুগান্তর আসিয়াছে—গদ্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তনে। জাতীয় সাহিত্য-জীবন দুটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কাব্যসাহিত্যকে একা যে ভার বহন করিতে হইত সে ভারের অংশ গদ্যসাহিত্য পাইয়াছে। কাব্যসাহিত্যের অনেক দায়িত্বই গদ্যসাহিত্য গ্রহণ ও বহন করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা জাতির যে কৌতূহল, যে রসতৃষ্ণা মিটাইত ঈশ্বরগুপ্তের পর হইতেই গদ্যে রচিত কাব্য ও উপন্যাস তাহাই করিতেছে।

ভারতচন্দ্রের ভাবধারা তাই গদ্যসাহিত্যের অরণ্যানীতে আত্মবিলোপ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে ভারতের সকল মিষ্টিক কবির কাছে অল্পবিস্তর ঋণী। বৈষ্ণব কবিদের কাছে তিনি যতটুকু ঋণী, রামপ্রসাদের কাছে ততটুকুই ঋণী। সহজ স্বাভাবিক এই ঋণকে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে কতকটা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু জ্ঞাতসারে তিনি যত দূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কবিতায় শান্ত ও দাস্যরসের প্রতিপত্তিই বেশি। সখ্য ও মধুর রস আছে বটে, তাহা কিন্তু ঠিক বৈষ্ণব ধরণের নয়। ব্রজরাখালদের অকপট আত্মহারা ভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যায় না—ব্রজগোপীদের উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, আকূতি, আত্মবিস্মৃতিও সুসংযত ভাবাবেগের কবি রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কবিতায় নাই। তাহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক কবিতায় পরকীয়া প্রীতির আনুরূপ্যকে (Analogy) সাবধানে এড়াইয়া চলিয়াছেন। রামপ্রসাদের কাব্যে যাহা মুখ্য রস অর্থাৎ বাৎসল্য রস, তাহা রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কবিতায় নাই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে বাৎসল্য-মাধুর্য্য প্রশস্ত স্থান লাভ করিয়াছে।

শান্তরসের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের mysticism এর মূল সূত্র খুঁজিতে হইবে উপনিষদে ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে।

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছে যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহারা বাঙ্গালী কবি নহেন—তাঁহারা হিন্দুস্থানী। ভগবান ও ভক্তের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রতীক, প্রতিমা, রূপক বা পৌরাণিক আখ্যানকে স্বীকার না করিয়া অপরোক্ষ-ভাবে যে রসময় ভাগবত সম্বন্ধ, তাহার সন্ধান যদি কবি কোথাও পাইয়া

থাকেন, তবে তিনি পাইয়াছেন—কবীর, নানক, দাদু, রজব, সুরদাস ইত্যাদির রচনা হইতে।

তবু স্বীকার করিতেই হইবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রামপ্রসাদের প্রভাব বরং কিছু আছে—ভারতচন্দ্রের প্রভাব মোটেই নাই।

ছন্দ, ভাষা ও বৈরাগ্যের সুরের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদের কাছে ঋণী। লোচনদাস ছাড়া রামপ্রসাদের আগে চল্‌তি বাংলার নিজস্ব, প্রাণবন্ত অবাধ সরল অকপট ভাষায় কোন বড় কবি কবিতা রচনা করেন নাই। রামপ্রসাদের পদে যে ছন্দ—তাহাই বাংলার নিজস্ব হসন্তবহুল ছন্দ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,—রামপ্রসাদের আগে এ ছন্দ লোচনদাস ছাড়া সৎসাহিত্যে কেহ ব্যবহার করেন নাই। স্বাধীনচেতা, সাহসী, বিদ্রোহী ও তেজস্বী জাতীয় মহাকবি রামপ্রসাদই প্রথম বাংলা মায়ের নিজস্ব ছাঁদে ভদ্রকালীর প্রতিমা গড়িয়াছেন। রামপ্রসাদের পরে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্য্যন্ত কোন কবি এ ছন্দকে সৎসাহিত্যে স্থান দিতে সাহসী হন নাই। গোপাল উড়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে এই ছন্দে অভিনবরূপ দিয়াছিলেন। শব্দালঙ্কারের ঘটা-সমারোহের যুগে রামপ্রসাদ পদাবলীতে সম্পূর্ণ মৌলিক অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর রচনায় যে রামপ্রসাদ অলঙ্কার প্রয়োগে সংস্কৃতকবিদের দাসত্ব করিয়াছেন—সেই রামপ্রসাদ পদাবলীতে প্রায় নিরাভরণ নিরাবরণ ভাষায় প্রাণের গভীর বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের পদাবলীর ভাষায় যে রূপক উপমা দেখা যায়—তাহা বাঙ্গালীর চিরদিনকার প্রাণের ভাষারই অঙ্গীভূত। রামপ্রসাদের এই রচনাভঙ্গী বাংলা গ্রাম্যগীতি-সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও রামপ্রসাদের কাছে ঋণী।

ভারতচন্দ্রের রচনায় অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের প্রতিপত্তি খুব বেশি। ভারতচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য অধিকাংশ স্থলে পুষ্পিত অলঙ্কৃত ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

অর্থান্তরন্যাস, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অসঙ্গতি; উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে ভারতচন্দ্রীয় কাব্যে মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্য বেশি। ইহা পূর্ব্বসূরিগণের অনুকৃতির ফল। ইহা কবি-হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না বলিয়া শিল্পীর লেখনীর কারুকার্য্য বলা যাইতে পারে। কবিতার ভাবময় জীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়। কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মত ইহা কবিতার অঙ্গীভূতও নহে। তাই অনায়াসে এগুলিকে মূল কবিতার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাগ্‌বিলাসকলার নিদর্শন বলিয়া চালান যায়।—সূক্তি, সুভাষিত, প্রবচন, oft-quoted lines, maxims হিসাবেও প্রয়োগ করা চলে।

আর এক শ্রেণীর অলঙ্কার আছে, তাহাকে ঠিক বহিরঙ্গীয় না বলিয়া অন্তরঙ্গীয় অলঙ্কার বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত কাব্যের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে ইহাকে কাব্যের লাবণ্য বলা যাইতে পারে। কবির মর্ম্মকোষ হইতে কাব্য এই অলঙ্কারের শ্রী অঙ্গে লইয়াই আবির্ভূত হয়। কবিতার অংশবিশেষে ইহার অবস্থিতি নহে, সমগ্র কবিতার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া ইহা বর্ত্তমান থাকে—কবিতার জীবনরাগও এই শ্রেণীর অলঙ্কৃত ভঙ্গিকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভাসিত হয়।

সাধারণতঃ বক্রোক্তি ও ব্যঞ্জনা-লক্ষণ-ক্রান্ত বাক্যভঙ্গিই এই শ্রেণীর অলঙ্কারের আশ্রয়। রামপ্রসাদের আলঙ্কারিকতা এই শ্রেণীর। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কৃত ভঙ্গীর রঙ্গতরঙ্গ মাইকেল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকটা মাইকেলেরই

অনুকরণ চলিয়াছে। রামপ্রসাদের অলঙ্কৃত ভঙ্গী যেন বাউল কবিদের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথে পৌঁছিয়াছে এবং শত শাখায় প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনেকগুলি সুভাষিত চরণ আছে। এইগুলির নিজস্ব সরসতা আছে, কিন্তু মূল রচনার রসের এক কণাও ইহাদের অঙ্গে লাগিয়া নাই—ভগ্ন মৃণালের তন্তুর মতও এই অংশগুলিকে সমগ্রের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে নাই।

এই যে আভাণক-সৃষ্টির কৌশল তাহাও পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে দেখা যায় না। ইংরাজ কবিদের মধ্যে Popeএর কাব্যে আভাণক যথেষ্ট আছে—কিন্তু Popeএর পরবর্ত্তী কবিরা Popeএর আভাণক-সৃষ্টির ভঙ্গী কেহই বড় অনুসরণ করেন নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবদেবীর স্তবের বাহুল্য ছিল। এই স্তুতির প্রথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন অনুসরণ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্য সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই স্তুতি করিয়াছেন, অন্যান্য দেবদেবীর নহে। মাইকেলের কাব্যের মঙ্গলাচরণ প্রাচ্য নহে, পাশ্চাত্য। তারপর এ প্রথা লুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র কতকগুলি নামাত্মক প্রতিশব্দ ও বিশেষণকে স্তবে সম্বোধন পদে ব্যবহার-প্রথা কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কেবল মাত্র কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্তই প্রবল ছিল।

এই তালিকা দেওয়ার প্রথা ঈশ্বরগুপ্তেও দৃষ্ট হয়। দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্যেও তালিকা আছে, তবে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যযোগে কতকটা অর্থগৌরব লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার জরতী রূপ বর্ণনায় যে বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া ঘৃণাজুগুপ্সাদির উদ্রেক করিয়াছেন তাহা চমৎকার। এই ধরণের রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী কোন কবির রচনায় দেখা যায় না। মাইকেলে

যেটুকু আছে, তাহা দান্তে হইতে আমদানী! উপন্যাসে আজকাল এইরূপ রসসৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পর সমাগত নব সভ্যতা নাকে কাপড় দিয়া এই শ্রেণীর রসসৃষ্টিকে পাশ কাটাইয়া গেল।

শ্লেষযমক অনুপ্রাসের প্রয়োগ এখনো চলে, চিরকালই চলিবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত রাশীকৃত শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস সংগ্রহ করিয়া একসঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়ার প্রথা গুপ্তকবি ও দাশুরায়ে আসিয়া শেষ হইয়াছে। অনায়াসে যাহা আসে বর্ত্তমান যুগের কবিরা তাহাই গ্রহণ করেন-- শ্লেষযমকের শোভাযাত্রা বাহির করার দিন গিয়াছে। নায়িকার রূপবর্ণনার চিরপ্রচলিত ভারতীয় ধারার ভারতচন্দ্রেই শেষ। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী শিল্পীরা রূপটিকে সত্যসত্যই স্পষ্টরূপে মানসচক্ষে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। বহুবিধ অলঙ্কারের উদাহরণের আতসবাজিতে চোখে ধাঁধাঁ লাগাইতে চাহেন না—অলঙ্কারের বাহুল্যে তাঁহারা মানসপ্রতিমার লাবণ্য ঢাকিতে চাহেন না। আদিরসের নির্লজ্জ বর্ণনাকে চরমে তুলিয়া ভারতচন্দ্র তাহাকে কাব্য হইতে চির বিদায় দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র ছন্দে যেটুকু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তেমন অনায়াস, সহজ, সরল, সাবলীল নহে বলিয়া ঈশ্বরগুপ্তও তাহাকে অনুসরণ করেন নাই। পরেও তাহা অনুসৃত হইতে পারিত, কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমিত্রতায় বোধ হয় তাহা আর চলে নাই। হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সফলকাম হন নাই। তারপর বৈষ্ণব কবিদের ছন্দোবৈচিত্র্য আসর জুড়িয়া বসিল। ভারতচন্দ্রের স্তবের ছন্দ পরে স্তবেই চলিয়াছে, কবিতায় চলে নাই।

ভারতচন্দ্রের ভাষা খাঁটি বাংলা, তবে তাহাতে ফারসী প্রভাব

প্রচুর। এত বেশি ফারসী শব্দ পূর্ব্বে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও কাহারও রচনায় দেখা যায় না। ভাষায় গ্রাম্যতাকেও তিনি দোষ মনে করেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে ফারসী প্রভাব একেবারেই গেল, ঈশ্বরগুপ্তের পর কাব্যে খাঁটি বাংলার আদরও কমিয়া গেল। ব্রাহ্মপ্রভাবে গ্রাম্যতা একেবারে নির্ব্বাসিত হইল। বাংলাভাষার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবুদ্ধ হওয়ায় এখন আবার খাঁটি বাংলা এমন কি ভাষার গ্রাম্যতাও কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা তাঁহার পরবর্ত্তী ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর-গুপ্তের পর ইংরাজি ভাষার প্রভাবে কাব্যের ভাষা কতকটা অস্বচ্ছ ও কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্য্যন্ত কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির কাব্যে স্পষ্টভাবে দৃষ্ট না হইলেও রামপ্রসাদের ধারাটি বেশ চলিয়া আসিয়াছে। মাইকেল যে যুগের প্রবর্ত্তক সে যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্য একদিকে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব, অন্যদিকে ইয়োরোপীয় প্রভাবে আবিষ্ট। খণ্ডকাব্যে রামপ্রসাদের প্রভাব থাকিবার কথা নয়। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যায় রামপ্রসাদের প্রভাব সামান্য আছে। কিন্তু গীতি-সাহিত্যে রামপ্রসাদের ভঙ্গী বরাবর অনুসৃত হইয়াছে। প্রসাদী ধারা কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশুরায়, রামদুলাল মুন্সী, রাজা রামমোহন, রাজা শিবচন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, রসিকচন্দ্র রায়, রূপচাঁদ পক্ষী, ছাতু বাবু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, নীলকণ্ঠ, বিষ্ণুরামচট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র ও রজনীকান্তের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগে চলিয়া আসিয়াছে। দেশের পাঁচালী গান, কবির গান, বাউল সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, দেহতত্ত্বের গান, যাত্রার গান

ইত্যাদি গ্রাম্য সাহিত্য রামপ্রসাদের প্রসাদে পুষ্ট। এমন কি ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলিতেও বৈদান্তিক রামপ্রসাদের প্রসাদ-কণা পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের রচনা বাংলাদেশের অন্তরের অন্তরঙ্গ—বাংলার মাটি চিরিয়া উহা মূর্চ্ছিত হইয়াছে—বাংলার হৃদয়ের রসানুভূতির অন্তরতম বৈশিষ্ট্য উহাতে ফুটিয়াছে। বাঙালী উহাতে আপনার ভক্ত ও আর্ত্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি লাভ করিয়াছে—সঙ্গীতের রূপ ধরিয়া উহা গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ভাষার ও ভাবের সহিত সুরের যেমন সামঞ্জস্য আছে, তেমনি বৈশিষ্ট্যও আছে। ভারতচন্দ্রের ঢঙ্গে লেখা সংস্কৃত সমাসবহুল রামপ্রসাদী গানগুলি কিন্তু বেশিদিন চলে নাই।

রাজসভায় রৌপ্যশৃঙ্খলে বন্দী ভারতচন্দ্রের রচনা এ দেশের অন্তরের সামগ্রী হইবার সুযোগ পায় নাই। রামপ্রসাদ সকল শৃঙ্খল এমন কি শৃঙ্খলা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সাধ করিয়া প্রচলিত কাব্য-রীতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া লেখনীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। কাব্যরাষ্ট্রের আইনকানুন মানিয়া চলাকে তিনি কবিধর্ম্ম মনে করিতেন। ভারতচন্দ্র দেশান্তর হইতে সুন্দরের আমদানী করিয়া বাংলার বিদ্যার সহিত মিলাইয়া অপরূপ শিল্পকলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নাগরিক কবির প্রভাব পল্লীর মুক্ত প্রান্তরে পৌছে নাই—রাজসভার গুণীর গুণ প্রজাসাধারণ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই—'বিদ্যার' কবির বিদ্যা বিদ্বৎসমাজের গণ্ডী পার হইতে পারে নাই। তাঁহার রচনায় সঙ্গীতের তারল্য না থাকায় কণ্ঠ হইতে কণ্ঠান্তরে প্রবাহিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই ভারতচন্দ্রের প্রভাব

কাব্যসাহিত্যে বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। ভারতচন্দ্রের ভাব নবজাগরিত গদ্যসাহিত্য কতকটা বহন করিতে লাগিল।

ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গী নগরের বাঁধা পথ ধরিয়া নাগরগণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। বিদেশী সভ্যতা পথ আটকাইল। রামপ্রসাদের ভঙ্গী গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল গ্রামপথ দিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে। মাইকেল দেশের গীতি-কাব্যের ধারার অবরোধক ছিলেন না, উপাখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যের ধারাকেই তিনি রোধ করিয়া নবধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সাহিত্যিক ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ছিল না, তখন কথক ও গায়নের কণ্ঠই এক মাত্র সাহিত্য প্রচারের সহায় ছিল। গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দরকে গানে ঢালিয়া নাগরিক সভায় কতকটা প্রচার করিলেও ভারতচন্দ্র সমগ্র দেশে এই সুযোগ পান নাই। বাংলাদেশে সাহিত্য চিরকাল ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ছিল। বাঙালীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও রসবোধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই ধর্ম্মাত্মকতা যাঁহার রচনায় প্রবল, তাঁহারই রচনা প্রতিপত্তি লাভ করিত। অবিমিশ্র সাহিত্যরসবোধ যখন দেশে প্রবুদ্ধ হইল তখন কাব্য-সাহিত্যের অভিনব রূপও প্রতিষ্ঠিত হইল। সাহিত্য আর ধর্ম্মের দাসত্ব করিতে রাজী হইল না। ধর্ম্মমূলক পুরাতন সাহিত্য থাকিয়া গেল, উপভোগ্য হইয়া রহিল বটে, কিন্তু অনুকরণীয় হইল না। ভারতচন্দ্র আজ উপভোগ্য, কিন্তু অনুকরণীয় নহেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব ভাসা-ভাসা ভাবে পড়িয়াছিল, অন্তর পর্য্যন্ত পেঁৗছে নাই। তাই ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচন্দ্রের শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারেরই অনুকরণ করিয়াছেন—ভাবভঙ্গী, রসাদর্শ এমন কি ছন্দোবৈচিত্র্য পর্য্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ভারত-চন্দ্রের শেষ ও প্রধান অনুকারক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহনের

বাসবদত্তার ভাবভঙ্গী, রস, ছন্দ সবই ভারতচন্দ্রের অনুস্মৃতির ফল। বাসবদত্তা আজ বিস্মৃতপ্রায়। রঙ্গলালের বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভারতচন্দ্রকে মনে পড়ে। আর দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্যে ও বঙ্কিমের উপন্যাসে ভারতচন্দ্রের মালিনী-চরিত্রের কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পর আর নায়ককে রক্ষা করিবার জন্য মশানে দেবীর আবির্ভাব হয় নাই,—নৌকার সেঁউতি বা ঘুঁটে আর সোনা হইয়া যায় নাই—প্রেমিক আর মায়ামন্ত্রে ও মায়াযন্ত্রে সুড়ং কাটিয়া প্রেমিকার ঘরে যায় নাই,—প্রতিপালক ভূস্বামীর আর নির্লজ্জ স্তব শোনা যায় নাই, দেশদ্রোহীর কেহ গুণ গান করে নাই বা বীরেরও কেহ অমর্য্যাদা করে নাই।

আদি রসের নির্লজ্জ বর্ণনা আর চলে নাই—এখনকার সাহিত্যে প্রচলিত নারী-রূপবর্ণনার পদ্ধতির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অত্যুক্তিমূলক নৈষধী বা বাণভট্টী পদ্ধতির কোন মিলই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে আসমানির রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্রীয় ভঙ্গীকে ব্যঙ্গই করিয়াছেন!

ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গির দিন মাইকেলের আবির্ভাবে ফুরাইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের কবিটিকে আসর হইতে সরাইবার জন্যই মাইকেল যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের রচনাভঙ্গির ধারা এখনও অন্তঃসলিলা হইয়া গীতিকাব্যের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

নিধু বাবু

নিধুবাবুর প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। ইহার জন্ম হয় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে। নিধুবাবু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, কারণ তাঁহার ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

নিধুবাবু খাস কলিকাতারই লোক ছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় হুগলী জেলার চাঁপতা গ্রামে। এদেশে সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখেন, নিধুবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। ৩৫ বৎসর বয়সের সময় নিধুবাবু ছাপরায় কালেকটারিতে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন এবং ১৮ বৎসর এই কার্য্য করেন। সেখানে ভাল ভাল ওস্তাদের সংস্পর্শে আসেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গানবাজনার সখ ছিল—এখন ভাল ওস্তাদ পাইয়া তিনি টপ্পা, গজল, খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সঙ্গীত শিক্ষা করিলেন। হিন্দীগান শিখিয়া তাঁহার মনে হইল, বাঙ্গলাতেও হিন্দীগানের অনুসরণে গান লেখা চলিতে পারে। অতঃপর তিনি শোরিমিঞার টপ্পার অনুসরণে বাঙ্গালায় সঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি তিনি নিজেই গাহিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

ওস্তাদরা যে সকল গান গাহিয়া থাকেন সেগুলিতে ভাষার ঐশ্বর্য্য থাকে না,—ছন্দোবন্ধের চমৎকারিতা থাকে না; সেগুলি হয় স্বল্পাক্ষর, সংক্ষিপ্ত, অল্প কয়েকটি কথায় সমাপ্ত। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গীতে কবিকে কৃতিত্বের ভাগ দিতে চাহেন না। সম্পূর্ণ মর্য্যাদাটা তাঁহারা নিজেরাই পাইতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়া লোকে যেমন সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা

করে, 'গানখানি কাহার রচিত?' তাঁহাদের গান শুনিয়া সেইরূপ প্রশ্ন কেহ করে না, করিবার প্রয়োজনও বোধ করে না, কে গাহিতেছে তাহাই জানিবার জন্য শ্রোতারা ব্যগ্র হয়। গানের বাণী সংক্ষিপ্ত হইলে ওস্তাদরা সুরকে খেলাইতে পারেন, গমক গিঠকিরির দ্বারা গানের সকল ফাঁক ভরিয়া দিতে পারেন। বাণীটা তাঁহাদের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার একটা অবলম্বন মাত্র।

নিধুবাবু হিন্দীর সেই স্বল্পাক্ষর গানের অনুকরণে গান রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গানগুলি এত সংক্ষিপ্ত—এবং তাহাতে ছন্দোঝঙ্কারের বা রচনাসৌষ্ঠবের প্রতিপত্তি নাই। কোনটিই পুরা গীতিকবিতার আকার ধারণ করে নাই। নিধুবাবু যদি বঙ্গদেশের কবিদের অনুকরণে গান লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গান পদাবলীর আকার ধারণ করিত। এইগুলি অর্দ্ধসৃষ্টি—গায়কের কণ্ঠে এইগুলি পূর্ণতা লাভ করে—তখন তাহা পূর্ণসৃষ্টিতে পরিণত হয়। গীতিকবিতার আদর্শে নিধুবাবুর সমস্ত সঙ্গীতের বিচার করিলে চলিবে না।

নিধুবাবুর গানগুলি এক একটি শ্লোকের মত। অমরু শতকের এক একটি শ্লোক যেমন অনুরাগের বৈচিত্র্যে ভাবঘন ও রসাঢ্য. এইগুলিও সেই শ্রেণীরই রচনা।

গানের বাণীর জন্যই নিধুবাবু খুব বড় নহেন। তিনি এই বাণীর মধ্য দিয়া এদেশে টপ্‌পা সঙ্গীতের সৃষ্টি, প্রবর্তন ও প্রচার করিয়াছেন। সেই হিসাবে তিনি কলাজগতে চিরস্মরণীয়।

বঙ্গদেশে যে সকল গান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাদের সবই ছিল ধর্ম্মসঙ্গীত, তত্ত্বসঙ্গীত, পরমার্থসঙ্গীত ও ভজনসঙ্গীত। তবে গানের পথ দিয়া দেশের লোকের প্রেমের তৃষ্ণা মিটিত কিসে? রাধাকৃষ্ণের

মারফতে হইলেও সে তৃষ্ণা মিটিত কীর্ত্তনসঙ্গীতে। কিন্তু তাহাদের স্থান ছিল নাটমন্দিরে। চণ্ডীমণ্ডপে, বৈঠকে বা মজলিসে সেগুলি পাওয়া সম্ভব হইত না। ভারতচন্দ্র কতকগুলি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন—সেগুলি ছিল তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্তর্গত। সেগুলির ততপ্রচার হয় নাই। নিধুবাবুর সঙ্গীত পাইয়া বাঙ্গালার বৈঠক-মজলিস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাহাই নয়, যে গায়কের জীবন শুচিসুন্দর নয়, অথবা যাহারা সঙ্গীতমাধুর্য্যে নাগরজনকে তৃপ্তিদান করিত, তাহারা এই গানগুলি পাইয়া বাঁচিয়া গেল। ঠিক এই জিনিসটিরই দেশে যেন বড়ই অভাব ছিল। নিধুবাবুকেই এদেশে অপারমাথিক সঙ্গীত ও প্রাকৃতপ্রেমের সঙ্গীত রচনায় অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

নিধুবাবুর উপর বঙ্গের অন্য কোন কবির প্রভাব বিশেষ দৃষ্ট হয় না। রচনার গঠন-পরিপাট্য ও বহিরঙ্গের দিক হইতে কবির ঋণ করিবার প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, তিনি ঐ ব্যাপার লইয়া একেবারেই মাথা ঘামান নাই। এ বিষয়ে তিনি হিন্দী ওস্তাদদের বিশেষতঃ শোরি মিঞার পানে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন

নিধুবাবু সম্পূর্ণ প্রেমের কবি—প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণের কোন কথাই তিনি সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত করিতে বাকি রাখেন নাই। যে সকল কথা সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে চিরন্তন সত্য, সেই কথাই যখন কবির উপজীব্য, তখন পূর্ব্বতন কবির কথা না তোলাই ভাল।

রচনার উপকরণ উপাদানের জন্যও নিধুবাবু কোন কবির নিকট ঋণী নন। কোকিল, ভ্রমর, কেতকী, শশী, কুমুদ, রবি কমল, চখাচখী ইত্যাদি লইয়া যে কবি-সময়-প্রসিদ্ধিগুলি প্রচলিত আছে—সেগুলি কাব্যজগতের সাধারণের সম্পত্তি, নিধুবাবু সেগুলিকে পরিহার করিলেও কাব্যাংশে কোন ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিরা প্রেমসঙ্গীত-রচনায় কতকগুলি প্রচলিত বিধিপদ্ধতি ও অনুশাসন মানিয়া চলিতেন—নিধুবাবু কোন বিধি বা কোন অনুশাসন অনুসরণ করেন নাই। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যকে রাগরসের উদ্দীপক বিভাবস্বরূপ স্বীকার করা হইত—এবং প্রকৃতির শোভাশ্রী ও বৈচিত্র্যকে প্রেমলীলার আবেষ্টনীস্বরূপ অবলম্বন করা হইত—নিধুবাবু সে পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই বলিলেই হয়। কোথাও বসন্তবর্ষার শোভাশ্রীর উল্লেখ নাই তাহা নয়, কিন্তু কবির প্রকৃতির প্রতি কোন মমতা নাই—কবি কোথাও মানবমনের উপর প্রকৃতির প্রভুত্ব বা প্রভাব স্বীকার করেন নাই। মানবহৃদয়ের মাধুর্য্যে কবি এতই মুগ্ধ যে তিনি বহিঃপ্রকৃতি বা সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই।

নিধুবাবু প্রাকৃত প্রেমের কবি। কিন্তু কবি প্রেমের নামে বৈষ্ণব কবি বা সংস্কৃত কবিদের মত কামলীলা বা কামার্ত্তিকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই। দেবতার স্বর্গীয় প্রেমকে তিনি কামনার ভোগবতীনীরে নামান নাই—নরনারীর রক্তমাংসময় প্রেমকেই তিনি স্বর্গের মন্দাকিনী তীরে উন্নয়ন করিয়াছেন। তাহাই পরে রবীন্দ্রনাথের গানে পুষ্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিধুবাবুই বর্ত্তমান যুগের প্রেমগীতি-রচনার গুরুস্বরূপ। ভারতচন্দ্রও প্রেমগীতি রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রেমের গভীর আন্তরিকতা তাঁহার গানে নাই। প্রেমিকহৃদয়ের গভীর বেদনাময় আর্ত্তি ও আকূতি নিধুবাবুর গানগুলিকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। নিধুবাবু প্রধানতঃ বিরহের কবি বলিয়াই বোধ হয় ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রধানতঃ ছিলেন সম্ভোগের কবি। সম্ভোগে প্রেমের গভীরতার পরিচয় বা পরীক্ষা হয় না এবং তাহা স্বভাবতই কামলীলার সহিত

বিজড়িত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের যে কয়টি পদ বিরহের তাহাই উচ্চশ্রেণীর প্রেমকবিতা বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। নিধুবাবুর কবিতায় চণ্ডীদাসের মত প্রেমিকহৃদয়ের বিরহার্ত্তি মূর্চ্ছিত। তাঁহার মতই নিধুবাবু পীরিতির প্রকৃত রীতির কথা বলিয়াছেন।

বিরহের যত প্রকার বৈচিত্র্য আছে—নিধুবাবুর গানে সকল প্রকারই স্থান হইয়াছে। নিধুবাবুর কাব্যের প্রণয়িণী কখনও মানিনী, কখনও প্রোষিতভর্তৃকা, কখনও খণ্ডিতা, কখনও কলহান্তরিতা। নৈরাশ্য, আত্মগ্লানি, আত্মবিস্মৃতি, অবসাদ, কাতরতা, মৃত্যুবাসনা ইত্যাদি বিরহিণীর জীবনের সকল সঞ্চারী ভাবই তাঁহার গানের পুষ্টিসাধন করিয়াছে—কোথাও রোষণা নাই।

কবি বারবারই বলিয়াছেন,—"আমি বিরহের তাপে ও অনুতাপে সারাজীবন পুড়িয়া মরিতেছি—আমি যতই উপেক্ষিত হই—যতই ব্যথা পাই—তাহার আঁচ যেন প্রিয়ে তোমার গায়ে না লাগে—"

"কিন্তু আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।"

কবি বলিয়াছেন—গভীর ভালবাসার প্রতিদান কখনও মেলে না—যাহার প্রতিদান মেলে তাহা গভীর ভালবাসাই নয়। যে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে তাহার প্রতিদান প্রত্যাশা বাতুলতা! না পাইলে ক্ষুব্ধ বিরূপই বা হইবে কেন? ভালবাসাই তাহার পুরস্কার, ভালবাসাই তাহার সান্ত্বনা। তবে বেদনা কেন? প্রেম unrequited বলিয়া নয়—un-appreciated বলিয়াই কবির দুঃখ।

দীনেশবাবু বলিয়াছেন—'নিধুবাবুর প্রেম সমস্ত দুঃখ নিজে সহিয়া প্রেমের পাত্রের গায়ে পাছে আঁচ লাগে এজন্য সতর্ক। ইহাতে দেহের লোভ নাই, প্রতিদানের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। নিজ সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতও নাই। কেবল আছে প্রেমের পাত্রের পায়ে আত্মদান।

নিধুবাবুর বিরহার্তিতে উচ্ছ্বাস নাই, উত্তাপ নাই, অস্থিরতা নাই—একটা অবসাদ, অভিভব ও বিহ্বলতার করুণ সুর সমস্ত গানেই ধ্বনিত হইতেছে। নিধুবাবুর গানের আয়তন, প্রকৃতি ও সুরের সহিত অবসাদ ও শান্তপ্রসন্ন ভাবেরই সামঞ্জস্য হয়—উহাতে উন্মাদনার অবসর নাই—

ভবভূতিকে যদি স্পর্শনেন্দ্রিয়ের কবি বলা যায়, নিধুবাবুকে তবে দর্শনেন্দ্রিয়ের কবি বলিতে হয়। নিধুবাবুর অধিকাংশ গানের সহিত নয়নের সম্পর্ক। নয়নের এমন মোহ, এমন মাধুর্য্য, এমন বিহ্বলতা কাহারও গানে দেখা যায় না। নিধুবাবুর গানে যদি কোন সম্ভোগের কথা থাকে-- তবে নয়নের সহিত নয়নের মিলনের সম্ভোগ। যে প্রেমে উষ্মা নাই—যে বিরহে অস্থিরতা নাই—তাহা যদি কোন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তবে তাহা নয়নকেই আশ্রয় করিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? নয়নের পথেই প্রেমের প্রবেশ—'নয়নে নয়নে আলিঙ্গন মনে মনে মিলিল।' 'উভয় প্রণয় সংযোগ নয়ন কারণ তার।' 'আগে কি জানিগো সই এমন হবে, নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে' আগে নয়নে নয়নে আলিঙ্গন তারপর মনে মনে মিল। কবি প্রেমের গভীরতা বুঝাইয়াছেন নয়নের গভীরতা দিয়া, 'নয়ন মন ডুবিল নয়নে তোমার।' সদা পরিপূর্ণ মোর নয়ন-কমল।' কবি বলিয়াছেন—'সুধা হলাহল সুরা নয়নের তিনগুণ।'' 'সুধায় নয়ন তৃষ্ণা মিটায়, সুরায় সে মাতাইয়া তুলে, হলাহলে প্রাণে জ্বালা ধরায়—এ জ্বালা আবার সুধা দিয়া নয়নই জুড়ায়.' 'সুধামুখে তোমার আঁখি অমিয় রাখিবে। কটাক্ষে জীবন পায় বিরহ বিষে।'

১। ও বিধুবদনে ধনি হের না নয়নে।

বধিতে কি আছে তব অনুগত জনে।

২। কাজল নয়নে আর দিওনা কখনো
শরে কেবা নাই মরে বিষযোগ তায় কেন ?

এইগুলি নয়নের হলাহল-ধর্মের কথা।

কবি অদর্শনের দুঃখকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন। দর্শনের বা নয়ন-গোচরের আনন্দকেই প্রেমজীবনের পরমানন্দস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন।

১। প্রবোধ কি মানে আঁখি না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন তার মত দেখে কারে ?

২। আমার নয়ন মানে না বল বুঝালে কি হবে সই।
তুমি বল সে আসিবে আমি বলি কই কই।

৩। নয়ন নিকটে রাখি সদা দিবানিশি দেখি।

৪। দেখিতে দেখিতে তোরে অনিমেষ হয় আঁখি।

৫। হৃদয়ে তাহার রূপ হেরিগো নয়নে,
সুস্থির কি হয় প্রাণ চাক্ষুষ বিহনে।

৬। ক্ষণ দরশনে আঁখি কদাচিৎ হয় সুখী।
তৃষ্ণা শুধু বেড়ে যায় মনে ঢুঁড়ে দেখ দেখি।

৭। নয়নে নয়নে রাখি
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুখী।
কি জানি অন্তর হও ঐ ভয় দেখি।

৮। সাধিলে করিতে মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহারে মুখ তখনি পাশরি।

৯। নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে,
দেখ দেখি কত সুখ দেখিতে তাহারে।

১০ নয়ন কাতর মোর তারে না দেখিলে
চতুর্ভুজ হই যেন সে মুখ হেরিলে।

মনে মনে মিলিয়া গেছে বলিয়া নয়নকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। 'নয়ন তৃষিত সদা দিবাবিভাবরী।' 'প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না' আঁখির তৃপ্তিই নিধিতুল্য।

কবির নায়িকার নয়ন তৃপ্ত হইলেই সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত। সর্বেন্দ্রিয় যেন নয়নেই কেন্দ্রীভূত। নায়িকা বলিতেছেন, চাতকী যেমন বারিবিন্দু না পাইলেও কেবল নবঘন দেখিয়াই সুখী তেমন—

যবে তারে দেখি অনিমেষ আঁখি হয়লো তখনি।
সুখে অচেতন হয় মোর মন শুনলো সজনি।

কবি দেহের সৌন্দর্য্যের কথা কোথাও বলেন নাই, সর্বাঙ্গের মধ্যে নয়নকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু কোথাও নয়নের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন নাই! নয়নের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া তাহার মনোহারিতা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন। নয়নই মনচোর—নয়নই নয়নকে মুগ্ধ করে।

১। আমার পরাণ করিয়া হরণ রাখিয়াছ প্রাণ নয়ন ভিতরে।
২। কি জানি কি গুণে ভুলালে নয়ন
তোমার বিরহে না দেখি কাহারে।

নয়নেই প্রিয়তমের বাস। নায়ক বলিতেছে—

মুকুরে আপন মুখ সতত দেখনা ধনি।
আপনার রূপ দেখি অপরূপ অধীনে ভুল কি জানি।

নায়িকা উত্তর দিতেছে—

মুকুরে আপন মুখ দেখিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার বাস যে তোমার তাহারি কারণে দেখি।

প্রিয়তমকে নায়িকা নয়নেই লুকাইয়া রাখিতে চায়—

এসহে নয়নে রাখি পলক মুদিয়া থাকি

না দেখ না দেখি কারে এই বাসনা।

নয়নই প্রিয়তমের বরণে মঙ্গলঘট।

নয়ন কলস মোর আনন্দসলিল পূর
ভ্রূযুগল আম্রশাখা তাহে শোভমান।

নয়নের কবির বিরহগীতে নয়নজলের অবসান নাই। নিধুর গান বিগলিত বিধুর নয়নের মধুর গান। নয়নজলেই প্রেমের মঙ্গলাচরণ, নয়ন-জলেই তাহার অবগাহন—নয়ন-জলেই তাহার মিলন—বিরহানলের উৎপত্তি নয়ন-জলে তাহার নির্ব্বাণও নয়নজলে। এই নয়ন-জলে অভিষিক্ত প্রেম গঙ্গাজলে স্নাতা পূজারিণীর মত শুচিতা লাভ করিয়াছে। নিধুর কবিপ্রতিভার যদি কোন মূর্তিকল্পনা করা যায়—তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমাদের চোখ পড়িবে সে মূর্তিতে মৃগের মত দুইটি ঢলঢল নয়নের দিকে। সে দুইটি নয়ন করুণার ও মমতার আকিঞ্চনে ও আর্তিতে ভরা।

কবিরা কবিতার শেষ পংক্তিকেই সবচেয়ে ঘোরালো করিয়া ছাড়িয়া দেন। নিধুবাবুর ছিল বিপরীত রীতি—তাঁহার গানের প্রথম পংক্তিই হইত সবচেয়ে রসঘন। তাহার ফলে গানগুলি পড়িলে anticlimax ঘটিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল গান পড়িবার জন্য রচিত হয় নাই—গাওয়ার জন্যই রচিত হইয়াছিল। যাহারা গান শুনিত তাহাদের anticlimax বলিয়া মনে হইত না, প্রথম পংক্তিই তাহারা বারবার শুনিত এবং প্রথম রসঘন পংক্তিটি শুনিয়াই তাহাদের গান শোনা সমাপ্ত হইত। কতকগুলি গানের প্রথম পংক্তি এখানে তুলিয়া দেখাই—

১। একি তোমার মানের সময় সমুখে বসন্ত।

২। পীরিত কি দূরে যায় কথায় কথায়।

৩। কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক !

৪। জলে কমলিনী জলে কোথা মধুকর ?

অনুভূতির গাঢ়তা যাহাতে প্রকাশিত হয়—প্রাণের কথা যাহাতে ধারালো বা জোরালো হইয়া অভিব্যক্ত হয়—সহজ সরলভাবে অনায়াসে প্রাণের গূঢ় আবেদন যাহাতে পরিস্ফূর্ত্ত হয়—তাহাকেই আমরা বলি রসঘন বাক্য। এ ক্ষেত্রে বাচ্যার্থই যথেষ্ট। অনেক সময় এইরূপ বাক্য লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। এক্ষেত্রে বাক্য অলঙ্কৃতই হয়। এই অলঙ্কার বাক্যের বহিরঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি বা কলাশ্রীবৃদ্ধির জন্য নয়—ইহা বাক্যের বক্তব্য রসঘন করিবার জন্য, তাহার অর্থকে জোরালো করিবার জন্য। এই সকল বাক্য কবির প্রয়াস বা আয়াসের সৃষ্টি নয়—কবির প্রাণের কথা স্বতঃই এইরূপ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারবিশেষের উদাহরণে এই উক্তিগুলিকে তুলিতে পারেন। কিন্তু ইহা হারবলয় কটকাদির মত অলঙ্কার নয়—ইহা বাক্যের অন্তর ও বাহিরের গঠনেরই অঙ্গীভূত। নিধুবাবুর রচনায় রসঘন এইরূপ পংক্তির সংখ্যা অনেক।

১। যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব সে নিল কি আমায় দিলে ?

২। রীতে রীতে চিতে চিতে মিলালে যে সুখ হয়।
ছাগে বাঘে সতাসতে কিসের প্রণয় ?

৩। বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা,
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না।

৪। দৈবের ঘটনা যাহা বল কে খণ্ডিবে তাহা
কমলে কণ্টক আছে মধুকর তা কি মানে ?

৫। তপন সবারে দহে না দহে কমলে
তব আঁখি-রবি হৃৎ-কমলে জ্বালায়।

৬। অনুগত দোষী হ'লে তার দোষ নাহি লয়।
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে ছেড়ে কি উদয় হয়?

৭। হরিলে যে মন সেই সে কারণ
চোরেরে নয়ন ছাড়িতে না চায়।

৮। আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে
আমারে দোষিণী তবে করিতে না পারে।

৯। সময়ে ধরিলে পায় তবে প্রাণ শোভা পায়
অসময়ে হাতধরা, কিবা সুখ আছে তায়?

১০। থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে
ভুজগেরে ভয় কেন করে সে মনে!

১১। কাজল নয়নে আর দিওনা যেন
শরে কেবা নাই মরে বিষযোগ তায় কেন?

এ'ত গেল পংক্তির কথা। সমগ্রভাবে নিধুবাবুর কোন কোন গান রসঘন। অতি অল্প কথার মধ্যে রস নিহিত ও পিহিত হইয়া আছে।

১। নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষ্ণায় চাতকী মরে অন্য কারে নাহি হেরে
ধারাজল বিনে তার সকলি বিফল।
যবে তারে হেরি সখি হরিষে বরিষে আঁখি
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল।

১। আগে কি জানি লো প্রাণ বিরহে যাবে?
জানিলে পীরিতি হেন করি কি তবে?

তাহার লাগিয়ে মরি গিছে আপনার করি
একদা নয়নে হেরি মানসে এবে।
পীরিতি সুখের নিধি করিয়ে এখন কাঁদি
অবলা করেছে বিধি সহিতে হবে।

যদি কবিমনের বিচার করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে নিধুবাবুর ছিল প্রকৃত কবির রসাবিষ্ট মন—তাঁহার অনুভূতি ছিল গাঢ় ও নিবিড়। কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশের ভাষা ছিল না। তিনি যে শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন—সেই শ্রেণীর সঙ্গীতে বহু কথার প্রয়োজন ছিল না—কিন্তু রসসৃষ্টির উপযোগী কথার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কবির ভাষা তাঁহার রসানুভূতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে খঞ্জপদে, ক্বচিৎ এক আধবার নাগাল পাইয়াছে —প্রায়ই পিছে পড়িয়া থাকিয়াছে। কবির রচনায় ছন্দোবন্ধের কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই—তাহার জন্য আমাদের বলিবার কিছু নাই—কারণ, উহা তাঁহার সুরের উপযুক্ত করিয়াই বিন্যস্ত—সঙ্গীতসৃষ্টির প্রয়োজনে পরিকল্পিত। গানগুলি পড়িয়া মনে হয় অনেকস্থলে কবির রসানুভূতি অপূর্ব, কিন্তু সরস ভাষা না পাইয়া বুঝি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। রসসৃষ্টির উপযুক্ত ভাষা যদি কবির লেখনীতে থাকিত, তাহা হইলে ছন্দোবন্ধের নিয়ম রক্ষা না করিয়াও কবি অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। গান-গুলির অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশের দীনতা কুণ্ঠিত হইয়া আছে সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কবিমানসটি বিরাজ করিতেছে তাহার রস- ভাণ্ডারে বিন্দুমাত্র দৈন্য নাই।

নিধুবাবুর সারাজীবন গান গাহিয়াছেন এবং গান রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ সঙ্গীতবিদ্যার সঙ্গে অর্থার্জনের কোন যোগ ছিল না। তিনি গানের দলও গড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা

ছিল সখের দল। তিনি তাঁহার গীতরত্নগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকান্তর্গত গীতসকল আপ্তবন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রচার করণের সেই মানস রহিল।"

নিধুবাবু'র রচনার অনেক রসভাষণ বর্তমানযুগের কবিদের রচনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি আমাদের এত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদের অসাধারণতা বা অপূর্বতা আর নাই। কিন্তু যখন আমরা ভাবিয়া দেখি, সেগুলির প্রথম স্রষ্টা বা প্রবর্তক নিধুবাবু, তখন সাহিত্যবিচারে তাঁহার প্রাপ্য সে গৌরব অস্বীকার করিলে চলিবে না। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য-রচনায় ভাবে, ভাষায়, সুরে, ছন্দে, গীতিরীতিতে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

নিধুবাবু ইংরাজী জানিতেন—হিন্দী উর্দু ও জানিতেন। হিন্দী ও উর্দু ভাষার গানই তিনি পশ্চিমে গিয়া শিখিয়াছিলেন। হিন্দী উর্দু ভাষার গান গাহিয়া ও গান শুনিয়া তাঁহার মনে হইত—'আহা যদি তাঁহার মাতৃভাষায় ঐরূপ গান থাকিত!' কবি সে সাধ মিটাইবার জন্য নিজেই লেখনী ধরিয়াছিলেন এবং সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় টপ্পাসঙ্গীত লিখিয়া ও গাহিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গভীর অন্তর্গূঢ় তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি সর্বজনবিদিত গানে :—

নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?
হ্রদনদে এত নীর কিবা বল চাতকীর?
ধারাজল বিনা তার মিটে তিয়াসা?

কবির গান

বাঙ্গালীর সঙ্গীত সাহিত্যে কবির গানের স্থান সুপ্রশস্ত নয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই গান বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে গীত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহা নগরেও খুব আদৃত হইয়াছিল। সাহিত্যের দিক হইতে ইহা প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যকার ফাঁক ভরিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল—ইহার কাজ ও কাল ফুরাইয়া গেলে ইহা বিদায় লইয়াছে।

এদেশে ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পল্লীসমাজে একটা নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততার ভাব আসে এবং সুশাসনগুণে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দতার সঞ্চার হয়। পল্লীবাসীরা দেশের নব দশান্তরে একটা উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। তাহারা ঢোল-কাঁসি বাজাইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া যেমন তেমন করিয়া ছন্দ মিলাইয়া গান রচনা করিয়া গাহিতে থাকে। ইহাই কবির গান। এই গানে মৌলিকতা কিছু নাই।

বহুদিন হইতে মঙ্গলকাব্যগান, বৈষ্ণবপদাবলী এবং কিছুকাল পাঁচালী ও শাক্তসঙ্গীত প্রবাহের যে অমার্জ্জিত ও স্থূলাংশ পল্লীর অশিক্ষিত লোকদের মনে তলানীরূপে জমিতেছিল—সেই উপাদানেই এই গানগুলি রচিত। প্রাচীন কবিদের রচনার টুকরাটুকরা অংশ পল্লীর প্রচলিত ভাষার সহিত মিলিয়া এই গানের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে। কবির গান ছন্দ ও শব্দালঙ্কার প্রয়োগের রীতি পাইয়াছে পাঁচালী গান হইতে এবং রাগ-রাগিণীর রীতি-প্রকৃতি পাইয়াছে সেকালের লোকসঙ্গীত হইতে। রাধাকৃষ্ণ ও হর-গৌরীর লীলাবর্ণনাই এই গানের প্রধান উপজীব্য। গৌণ ও অবান্তর উপজীব্য সেকালের

লোকযাত্রা, মূলগায়ন ও পৃষ্ঠপোষকের ব্যাক্তিগত চরিতকথা।

"ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসররঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্ত্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রবর্ত্তন করেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

কবির গান শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত—তিন শ্রেণীর লোকের রচিত। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইতে নিরক্ষর মুচি পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর গান রচনা করিত এবং দল বাঁধিয়া গাহিত। কবির গানগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক শ্রেণী ভবানী-বিষয়ক। এই শ্রেণীর মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত উমাসঙ্গীত দুইই পড়ে। সাধারণতঃ দুর্গোৎসবের আগমনী বিজয়ার গানই এই শ্রেণীর অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়—রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বা সখীসংবাদ। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, মাথুরসঙ্গীত ও গোষ্ঠসঙ্গীত। সাধারণ প্রাকৃত প্রেমের গীতও এই শ্রেণীতে পড়ে। তৃতীয়—লহর, এই শ্রেণীতে নানাবিষয়ক শ্লেষাত্মক গীত পড়ে। চতুর্থ—খেউড়—ইহাতেই দাঁড়াকবির গানের পালা সমাপ্ত হয়। ইহা নিছক গালাগালি—দুইদল কবিওয়ালা থাকিলে একদল অন্য দলকে গান গাহিয়া আক্রমণ করে—অন্য দল তাহার উত্তর দেয়। যাত্রার শেষে যেমন সঙ, কবিগানের শেষে তেমনি খেউড়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কবির গান করিত। তাহাদের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণের ভাষা যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক তেমনি হইত। ভোলা ময়রা ও এণ্টুনি সাহেবের খেউড় গান প্রসিদ্ধ। অপেক্ষাকৃত অল্প কদর্য্য গানগুলি খেউড়ের নিদর্শনস্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঝগড়াই উদ্দেশ্য নয়—সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে মুখের মত পাল্টা জবাব তৈয়ারী করিয়া উত্তর দেওয়ায় যে বাহাদুরি—তাহাই দেখানোর জন্য খেউড় গাওয়ানো হইত।

তাহা ছাড়া, সেকালের লোকের রুচিতে উহা বাধিত না—অশ্লীলতা বা কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ তখনকার দিনে রসিকতার প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রোতারা রস উপভোগ করিত বলিয়াই খেউড়ের প্রচলন হইয়াছিল। ইউরোপের লোকেরা প্রাচীনকালে ষাঁড়ের লড়াই বাধাইয়া বা মুরগীর লড়াই বাধাইয়া যেমন আমোদ পাইত, বাঙ্গালা দেশের জমিদাররা তেমনি আমোদ পাইত কবির লড়াই-এ।

কবির গানের একটি বিশেষত্ব—চাপান ও উতোর। শুধু খেউড়ে নয়—সকল প্রকার কবিগানেই দুই দলে লড়াই বাধিলে এক দল একটি গান গাহিয়া চাপান দিত—অন্য দল তাহার বিপরীত ভাবের কিছু গাহিয়া তাহাব উতোর দিত। এই উতোর মুখে মুখে রচনা করিয়া গাহিতে হইত। যে কবিওয়ালা মুখে মুখে চমৎকার জবাব দিত সেই কবিওয়ালাই বাহাদুর,—পুরস্কারের যোগ্য। এক দল হয়ত শ্যামের গুণগান করিয়া চাপান দিল—আর এক দল শ্যামা বা রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া উতোর দিল—আবার প্রথম দল তাহার উতোর দিল। এইভাবে কবির গানের রস জমিয়া উঠিত।

কবির গানের কবিত্ব উচ্চশ্রেণীর নয়। কবির গান জনসাধারণের রুচির অনুগত করিয়া লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ইহাতে ভাবের গাঢ়তা বা গঠনের পারিপাট্য নাই। সে-কালের লোকে শব্দ-ঝঙ্কারের চাতুর্য্যকে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব মনে করিত—সেজন্য কবির গানে শব্দঝঙ্কারের ঘটাছটার সৃষ্টি-চেষ্টাই বেশী দেখা যায়। কবির গানের অনুপ্রাসকে 'অনু-প্রয়াস' বলা যাইতে পারে।

অনুপ্রাস-ভক্ত গুপ্তকবি কবির গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তিনি বহু কবির গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কবির গান সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা কিংবা হর-গৌরীর কথা লইয়া রচিত হইত। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের প্রচলিত টুকরা টুকরা কথা বা গর্ভবাক্য কবির গানে ছড়ানো আছে। অনেক সময় এই লীলার কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতার ভাব নষ্ট করিয়াও গ্রাম্যতার দ্বারা তাহাকে বিকৃত করা হইয়াছে।

যে সকল গান লৌকিক জীবন, ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনাবিশেষ লইয়া রচিত—সেগুলিতে কিছু মৌলিকতা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন কবিত্ব নাই।

কবির লড়াইএ মুখে মুখে ছন্দ রচনা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হইত। তাহাতে কবি-গায়কদের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত সত্য, কিন্তু কাব্যাংশে তাহা প্রায়ই অপকৃষ্ট হইত, মিল ইত্যাদি ভালো হইত না, ছন্দও সব সময়ে ঠিক থাকিত না এবং রচনা সাধারণতঃ তালিকামূলক হইত। স্থান, ব্যক্তি, বস্তু ও ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তি অকীর্ত্তির তালিকাই প্রবল হইয়া উঠিত।

কবির গানে ভাবের গাঢ়তা. গঠনের পারিপাট্য ও রুচির পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণ নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"দেবতার কাছে অথবা বিদগ্ধ রাজা ও রাজসভাসদ্‌গণের সম্মুখে যে রচনা পঠিত বা গীত হয়, তাহাতে লেখকের যত্ন, সতর্কতা, শালীনতার সংকোচ থাকে, শ্রোতারাও অপরিচ্ছন্ন ভাষা, ছন্দ বা রুচিতে তুষ্ট হয় না। পল্লীর জন-সাধারণ অথবা ভোগবিলাসী জমিদারদের সম্মুখে গাওয়ার জন্য রচনায় কোন সতর্কতা, শৃঙ্খলা, সংকোচ বা সুরুচির বালাই থাকে না।"

কবির লড়াইকে একপ্রকারের রসকলহ বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে ধামালী গানে এইরূপ রস-কলহ থাকিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে

রাধা-শ্যামের মুখে এই রস-কলহ বসানো হইয়াছে। শুক ও সারীর মারফতে ও জবানীতে কৃষ্ণরাধা লইয়া এক প্রকার রস-কলহ প্রচলিত ছিল। কবির লড়াই অনেক সময় এইরূপ কৃত্রিম রসকলহের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের আমোদবিধান করিত।

কৃত্রিম কলহ অনেক সময় আসল কলহে পরিণত হইত, তখন কবিগান হইত তরজা। ইহাতে যে যত পারে ছন্দে ও সুরে গালাগালি করিত পরস্পরকে। ইহাতে শ্রোতাদের আরও আনন্দ হইত। ভোলা ময়রা ও এণ্টনি সাহেবের রস-কলহ রীতিমত রোষ-কলহে পরিণত হইত।

আসল কবির গান ইহা নয়—আসল কবিব গান লিখিয়াছিলেন—হরু ঠাকুর, রাম বসু ইত্যাদি। এগুলি—উনবিংশ শতাব্দীর পদাবলী।

কবি-শক্তি বেশী লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে না, ইহা একটি দেবদত্ত শক্তি। কবির গানের কবিদের প্রতিভা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু ছন্দোরচনার শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ইহারাও একশ্রেণীর আর্টিষ্ট। সাজাইয়া গুছাইয়া কথাকে গানের অঙ্গীভূত করার এবং অসামান্য সুরজ্ঞানের পরিচয় ইহারা দিয়াছে। ইহা প্রতিভা না হইলেও অসামান্য শক্তি, এই শক্তি ভদ্রশিক্ষিতেরই একচেটিয়া নয়। অনেক অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কবির গানের মধ্য দিয়া। সরস্বতীর কৃপালাভ করিলে ইহাদের অনেকেই বড় কবি হইয়া উঠিতে পারিত, শিল্পিদৃষ্টি ইহাদের ছিল, সূক্ষ্ম রসবোধও ছিল। বাংলার এই সকল Inglorious Miltonদের দানই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গীতি-সাহিত্যের একমাত্র অবদান। প্রাচীন

সাহিত্যের ভাবধারা ইহারাই আনিয়া নব যুগের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহার পথপ্রদর্শিকা।"

নিম্নে কতকগুলি বিখ্যাত কবিওয়ালার পরিচয় দেওয়া হইতেছে :

১। হরু ঠাকুর—ইহার পূরা নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। প্রথমে ইনি সখের দল করেন, পরে তাহাকে পেশাদারী দলে পরিবর্ত্তন করেন। ইনি কবির লড়াইয়ের বিচারকের কাজও করিতেন। ইহার একটি গান—

এ কি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরে ভাসি অকূলে।
অক্রূর সহিতে কৃষ্ণ রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে।
রাধার চরণ ত্যজিলে।
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাই অন্যভাব শুনহে মাধব তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
অন্ধকার নিশি যথা বাজে বাঁশী তথা আসি গোপী সকলে,
বিসর্জ্জিয়া কুলশীলে,
এতেই হ'লাম দোষী তাই তোমা জিজ্ঞাসি
এই দোষে শশী ডুবিলে।
শ্যাম, যাও মধুপুরী নিষেধ না করি থাক যথা হরি সুখ পাও।
একবার, হাস্যবদনে বঙ্কিম নয়নে

ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥
জনমের মত চরণ দুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব সে আশা না করি।
হৃদয়ের ধন হে গোপীরমণ হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥

এই সকল গানে কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও সুরের উত্থানপতন অনুসারে খাদ, চিতেন, পাড়ন, ফুঁকা, মেলতা, অন্তরা ইত্যাদি ভাগ আছে।

ইহা একটি মাথুর সঙ্গীত। হরুঠাকুর এইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনায় খণ্ডিতা রাধার সখীদের সঙ্গে শ্যামের রস-কলহটিকে রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান করিয়াছিলেন।

ইঁহার কোন কোন গানের বাঁধুনী এমনই চমৎকার যে ছন্দের একটু পরিবর্ত্তন এবং বাক্যবিন্যাস একটু বদলাইয়া লইলে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান যুগের গীতিকবিতায় পরিণত হইতে পারে। ইনি লৌকিক প্রেম অবলম্বনেও গান রচনা করিয়াছিলেন।*

২। রাম বসু (১৭৮৭—১৮২৯)—ইনি হাওড়ার লোক। কবির গান রচনায় রাম বসু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি কবির গানে লহর অংশের প্রবর্ত্তক—চাপান ও উত্তর-প্রত্যুত্তর দানের প্রথা ও কবির লড়াই রাম বসু হইতেই সূত্রপাত হইয়াছিল: রামবসু বিরহের কবি। নায়িকার গভীর মর্ম্মবেদনা, নায়কের প্রতি নিষ্ঠুরতার অনুযোগ তাঁহার গানে অতি সরস ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে

* রঘুনাথ দাস— হরু ঠাকুরের ওস্তাদ ছিলেন। ইনি দাঁড়া কবির প্রবর্ত্তক। হরুঠাকুরের অনেক গানে ইহার ভণিতা আছে।

রাসু—নৃসিংহ (১৭৩৪-১৮০৭)—রাসু ও নৃসিংহ দুই ভাই। ইঁহাদের গানে দুইজনেরই ভণিতা আছে। ইঁহাদের কোন কোন গানের ছন্দ একেবারে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ছন্দের মতই। ইঁহাদের সখীসংবাদ গানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

তিনি অপরের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, পরে নিজেই দল করেন। বৃন্দাবনলীলার পূর্ব্বরাগ, বিরহ ও মাথুর, আগমনী বিজয়া ও লৌকিক প্রেমবিরহ তাঁহার গানের উপজীব্য ছিল।

৩। নিত্যানন্দ বৈরাগী বা নিতাই দাস—ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন—ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভবানী বেণে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।" একথা অত্যুক্তি নয়।

নিত্যানন্দের লৌকিক প্রেমের বিষয়েও অনেক গান আছে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন—"একদিবস দুই দিবসের পথ হইতেও লোকসকল নিতাই ভবানীর লড়াই শুনিতে আসিত। যাহার বাড়ীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত লোক ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিতাই দাস জয় লাভ করিলে তাহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইত। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইত, এমনি জ্ঞান করিত।"

এখনকার দিনে মোহনবাগানের খেলায় হারার মত!

নিতাই সকলের হৃদয় বিগলিত করিতে পারিত।*

* সাতু রায়—সাতকড়ি রায় চাকরি ও পরে মোক্তারি করিতেন, ইঁহার নিজের দল ছিল না—অন্যের দলের গান লিখিয়া দিতেন। ইঁহার রচিত মাথুর সঙ্গীতগুলি চমৎকার। ইঁহার—নিম্নলিখিত গানটি মর্ম্মস্পর্শী—

"কথা কও বদন তুলে হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
তোমার ও কংসরাজ্যের অংশ নিতে আসি নাই।"

গদাধর মুখোপাধ্যায়—ইনি বহুদলের গান বাঁধনদার ছিলেন। ইনি যে দলের বাঁধনদার

৪। ভোলা ময়রা—ভোলা ছিল হরুঠাকুরের চেলা। কবির লহর ও খেউড় অঙ্গের গান রচনা করিয়া ভোলা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভোলা মুখে মুখে খুব সরস গান রচনা করিতে পারিত। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পোর্ত্তুগীজ এণ্টুনী সাহেব। সেকালের লোকের যেরূপ রুচি ছিল—ভোলার গান তদুপযোগীই ছিল। সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল ছন্দে অকথ্য গালাগালি দিলে এবং মুখে মুখে অশ্লীল পদ্য রচনা করিতে পারিলে রসিকতার চরম হইল। ভোলা এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিল। ভোলার যে সকল গান প্রসিদ্ধ সেগুলি এণ্টুনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলার নির্ভীকতার বা প্রগল্‌ভতার সীমা ছিল না; দেশের বড়বড় ভূস্বামীদের সম্মুখে অম্লান বদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড় গাহিত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকেও দুইকথা শুনাইয়া দিত। রসের আবহাওয়ায় সবই চলিত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোলা আদর করিয়া 'শালা' সম্বোধন করিত।

৫। এণ্টনি সাহেব—পর্ত্তুগীজ হেন্‌স্‌ম্যান এণ্টনি এদেশে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাংলা বুলি শিখিয়া কবির দল খুলিয়াছিলেন। তিনি ভোলা, ঠাকুরসিংহ ইত্যাদি কবিওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভোলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া এণ্টনিকেও কুরুচির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনিও মুখে মুখে উত্তর দিতে পারিতেন। এণ্টনি ভোলার মত

থাকিতেন—সেদলের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যাইত—সে দল অপরাজেয় হইয়া উঠিত। ইঁহার রচিত উমা সঙ্গীত—

পুরবাসী বলে উমার মা তোর হারা তারা এল অই।
শুনে—পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায় বলে কৈমা উমা কই॥

অশ্লীলতা চালাইতে পারিতেন না. দেশী অশ্লীলতা তাঁহার তেমন জানাও ছিল না। ভোলার মত অত সাহসও তাঁহার ছিল না, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হইত। এণ্টনির গানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ভাবের ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খ্রীষ্টান হইলেও হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন।

এণ্টনির একটি গান—

জানি তোমার চরণ সাধন করি ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী।
দেখ—সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী—
শিবকে সাজিয়ে সন্ন্যাসী করলে তারে শ্মশানচারী।

এণ্টনি একবার স্বয়ং দুর্গা সাজিয়া ও ভোলানাথকে "ভোলানাথ" কল্পনা করিয়া এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে বলিলেন :—

"যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি,
সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ ?
কহ দেখি, ভোলানাথ, এর বিশেষ বিবরণ।
জান না কি শিব ! আমি তোমার গৃহিণী.
তোমায় গর্ভে ধ'রে আমি,
এখন হ'লেম তোমার রমণী ॥
সমুদ্র-মন্থন-কালে, বিষপান ক'রেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে, রক্ষা কর আপনি ॥
ঢ'লেছিলে বিষ-পানে, বাঁচালেম স্তন্য-দানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় ব'লেছিলে জননী ?

ভোলানাথ শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে পৌরাণিক উক্তির পুরাণ সম্মত উত্তর দিতে না পারিয়া গাহিল :—

ওরে আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই :
চিন্তামণির চরণ চিন্তি ভাজনা খোলায় ভাজি খই ॥
আমি যদি সেই ভোলানাথ হই,
(অশ্লীল অংশ বাদ দেওয়া হইল)
নে যা আমার খই, নে যা ঘাঁটালের দই,
পেরিং-এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই,
(কাছে) বাগবাজারের খাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল,
দড়ি কল্সী নিয়ে ব্যাটা হোগে জল-সই ॥

বলাবাহুলা, ইহাতে কবিত্বের বালাই নাই, কিন্তু সেকালের লোকে এই সমস্ত উপভোগ করিত !

উপরিলিখিত কবিওয়ালা ছাড়া—ভবানী বেণে, (ভবানী বেণের কথা নিতাই দাসের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে) ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, নীলমণি পাটনী, নীলুঠাকুর, গোঁজলাগুঁই, লালুনন্দলাল, রাধানাথ দাস, বনওয়ারি চক্রবর্ত্তী, রাজারাম, যজ্ঞেশ্বর ধোপা, ঠাকুর সিংহ, বলহরি রায় * রামপ্রসাদ ঠাকুর, কৈলাস ঘটক ইত্যাদি বহু কবিওয়ালার রচিত গান পাওয়া যায়। মাধবীলতা; সহচরী, যজ্ঞেশ্বরী, অক্ষয়া বায়তিনী, মোহিনী দাসী ইত্যাদি অনেক রমণীরও কবির দল ছিল— তাঁহারাও গান বাঁধিতে পারিতেন।

* বলহরি রায় - ইনি ছিলেন রাজপুতবংশীয়। বীরভূমে বকুল গ্রামে ইঁহার জন্ম—১০৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ইনি বীরভূম জেলার কবিওয়ালাদের গুরু ছিলেন। ইঁহার সমসাময়িক কবিওয়ালা ছিলেন—রামাই ঠাকুর, রাজারাম, গণক, কৈলাস যোগী, বনওয়ারি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। স্থষ্টি ঠাকুর, নিতাই দাস, রাইচরণ ইত্যাদি ইঁহার শিষ্য।

কবির গানে লহর অঙ্গে সমস্যাপূরণের ও হেঁয়ালি সমাধানের চাপান দেওয়া হইত। লহরের রুচি খেউড় অপেক্ষা অনেকটা ভাল। এই অঙ্গ ক্রমে কবির গান হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। তাহাতে কোন পৌরাণিক চরিত্রের জবানী অভিনয়ের ভঙ্গীতে চাপান দেওয়া হইত; অন্য একটি পৌরাণিক চরিত্রের জবানীতে মুখে মুখে জবাব দিতে হইত। এই প্রশ্নোত্তরের গানকে তর্জা গান বলে। হোসেন খাঁ এই তর্জা গানের প্রবর্ত্তক। পৌরাণিক চরিত্র ছাড়া অন্য লৌকিক চরিত্রেরও অভিনয় করা হইত—ইহা একপ্রকার রসকলহ। ইহাও ক্রমে গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতায় পরিণত হইয়াছিল।

সেকালে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদেরও কবির দল থাকিত। অক্ষয়া নাম্নী একটি বায়তিনী নারীর কবির দলে দাশরথি রায় ছিলেন বাঁধনদার। তিনি তখনও পাঁচালি লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। পুরুষোত্তম বৈরাগীর দলের সঙ্গে দাশুর দলের প্রায় লড়াই বাধিত। পুরুষোত্তমের ছড়াদার রাধামোহন দাশুকে লক্ষ্য করিয়া গাইলেন—

আমার গানের গুরু কল্পতরু হরুর তুল্য গণি।
হাঁরে পাগল ছাগল মধ্যে আসরে নামবেন তিনি।
আজ মোষ কাটব ব'লে আমি খাঁড়ায় দিলাম বালি,
আসরে এসে দেখি দেশো পুড়কুমড়োর জালি।

দাশু তক্ষনি মুখে মুখে উত্তর দিলেন—

তিনপোণের জন্য খেটে পুরো কল্পতরু,
তিন কড়া যার মূল্য তুই তার তুল্য করিস হরু?
পুরোর নিজের মুরোদ তিনকড়া, শিষ্য দিয়ে বলান ছড়া,
কানার যেমন ঠেঙ্গাধরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে—

বড়কর্ম্ম মহাশয় ঢাকীর একজন ঢাক বয়,
লাঙ্গলের সঙ্গে যেমন জোতালে যায় মাঠে।
ও কুড়ানীর বেটা নিড়ানী হাতে ভুঁয়ে ঝাড় ছ হুড়ো।
ওর জন্ম গিয়েছে ঘাস ক'রে পড়ো জমিতে পড়ে পড়ে,
আজ হয়েছে 'পুরো বোরেগীর' প'ড়ো।
ভাতরাঁধুনীর আথাজ্বালানী তার আবার ফেনগালানী
তার কথা কি সাজে ?
বাজে ঘরে ওর জন্ম হয় বাজে লোক আর কারে কয় ?
ওর কথা গায়ে বড় বাজে।
(হরু—হরু ঠাকুর। দেশো--দাশরথি, পুরো—পুরুষোত্তম)

পুরুষোত্তম বৈরাগীকে কাবু করিবার জন্য দাশু বৈরাগীজাতিকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ধন্যরে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসীর ছেলে।
তুমি হাড়ি মুচি বৈদ্য বামুন একত্র মিশালে।
বৈরাগীর পিতৃকুল ক্ষুদ্র মাতৃকুল নমঃশূদ্র দুইএক খুঁটে।
শ্বশুরকুলের কসুর নেই বাগ্‌দী কুস্‌মিটে।
মাসতুতো-ভাই মুদ্দোফরাস পিস্‌তুতো ভাই বেদে।

পুরো উত্তর দিল—

উনি কুলীনের গরব করেন নিত্যি শুনে জ্বলে যায় পিত্তি
মামা যার চক্রবর্ত্তী পিতা যার রায়।
তিনি আবার নিয়ে বেড়ান নৈকষ্যের দায় !
তাঁর মাস্‌তুতো ভাই দৈবজ্ঞ পিসতুতো ভাই ভাট,
কন্যা বিয়ে ক'রে পণে মারেন মালসাট।

নিধিরাম শুঁড়ির কবির দলের সঙ্গে দাশুর দলেরও লড়াই হইত।

নিধিরাম শুঁড়ি—গন্ধেও গালি দিত দাশুকে। সে একবার চাপান দিয়াছিল—

হয়ে বামুনের ছেলে শুদ্ধকুলে কালি দিলে, কবির মুহুরী মাথায় বাঁধা ফোতা,
গায়ত্রী শিবপূজা সন্ধ্যা তোমার কাছে জন্মবন্ধ্যা হায়রে কবির চোতা।
কিবা সাজ কিবা পাগড়ী কবি গাইতে রাঢ় বাগড়ী যাও অক্ষয়ার পাছে,
আমি জেতে শুঁড়ী খাই ভিজে চাল মুড়ি বিদ্যে ছড়াও আমারই কাছে!

ইহার উত্তর দাশু কি দিয়াছিলেন জানি না। নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কবিওয়ালার তরজার লড়াইয়ে ব্রাহ্মণেরই পরাজয় হইত। জাতিকুল পারিবারিক জীবন লইয়া গালাগালিতে নিম্নশ্রেণীর কবিওয়ালার চেয়ে ব্রাহ্মণ কবিওয়ালারা বহুগুণ বেশি অপমানিত বোধ করিত। ইহাতেও দাশুর চৈতন্য হয় নাই। তারপর কড়ুইগ্রামের নদেরচাঁদ শুঁড়ির গালাগালিতে দাশুর চৈতন্য হইল। নদের চাঁদ সহচরী নাম্নী কবিওয়ালীর দলের বাঁধনদার ছিল। বার বার শুঁড়ি বাঁধনদারদের কাছে অপমানিত হইয়া দাশু কবির দল ছাড়িয়া দেন! বামুনকে গালাগালি যেমন চোখা ও ধারালো হয়, যতই কবিত্ব থাকুক, যতই ভাষার চাতুর্য্য থাকুক; নীচজাতীয় কবিওয়ালাকে গালাগালি ত তেমন হয় না। তারপর দাশু পাঁচালী রচনা করিয়া পাঁচালীর দল খুলেন।*

---

* এই নিবন্ধরচনায় সুহৃদ্বর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের একটি প্রবন্ধ হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

দাশু রায়ের পাঁচালি

দাশু রায় শুঁড়ি কবিওয়ালার গালি খাইয়া কবির দল ছাড়িয়া পাঁচালির দল খুলিয়াছিলেন। তাঁহার কবির গান পাঁচালি সাহিত্যের রূপ ধরিল। ক্রমে দাশুর পাঁচালির দল সারা বাংলাদেশের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিল। দেশের সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাঙ্গালা সাহিত্যের খোঁজ রাখিতেন না. তাঁহারা দাশুর রচনায় অনুপ্রাস ও শ্লেষ যমকের ঘটাছটা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দাশুর পাঁচালির প্রধান প্রধান বিষয় বস্তু পৌরাণিক।*

বাংলা ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশে যে সকল বিষয় বস্তু লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছিল, দাশু রায় সেই সকল বিষয়বস্তু লইয়া নূতন ঢঙে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে পাঁচালি সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। বিষয় বস্তু পুরাতন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী নূতন বলিয়া দাশু বাংলাসাহিত্যে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালি পাঠ করুন।" ইংরাজি শিক্ষাপ্রচারের আগে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী

* কালিয়দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, কলঙ্কভঞ্জন, নরনারীকুঞ্জর, মানভঞ্জন, গোষ্ঠ, অক্রূর সংবাদ, নন্দবিদায়, মাথুর, উদ্ধবসংবাদ, রুক্মিণীহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দুর্ব্বাসার পারণ। রামায়ণের কোন কোন উপাখ্যান। দক্ষযজ্ঞ, গঙ্গাভগবতীর কোন্দল, শিববিবাহ, আগমনী বিজয়া। বামনভিক্ষা, প্রহ্লাদচরিত্র, মহিষাসুরবধ ইত্যাদি। এইগুলি ছাড়া প্রাকৃত বিষয়বস্তুও ছিল. যেমন—শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবাবিবাহ, বিরহ, নবীনচাঁদ ও সোনামণির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

নরনারী যে ভাষায় ভাবপ্রকাশ করিত, কথাবার্ত্তা বলিত, কলহবিবাদ করিত, রঙ্গরসিকতা করিত দাশুর পাঁচালি সেই আসল বাংলা-ভাষায় রচিত। দাশুর পাঁচালিই এদেশে অনন্যসাধারণ গণসাহিত্য, বিদ্বৎসমাজ বা বিদগ্ধসমাজ তাঁহার রচনাতে মুগ্ধ হইলেও, তিনি অশিক্ষিত জনগণের জন্যই পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন। সেকালের বাঙ্গালী জনসাধারণের প্রাণের কথা, মর্ম্মের ব্যথা, আশা আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাশীরাম কৃত্তিবাসের মত দাশুও ছিলেন লোকশিক্ষক। সেকালে লোকশিক্ষা বলিতে ধর্ম্মশিক্ষাই বুঝাইত। দাশু আনন্দদানের ছলে ভক্তিমূলক ধর্ম্মশিক্ষাই দিয়াছেন। সেকালের লোক দাশুকে কেবল মহাকবি নয়, মহাভক্তও মনে করিত।

সেকালের লোকে অনুপ্রাস-যমকের ঘটাছটাকে সৎকাব্যের লক্ষণ মনে করিত। দাশুর রচনায় অর্থালঙ্কারেরও প্রাচুর্য্য ছিল। শ্লেষালঙ্কারের প্রয়োগে দাশু সুদক্ষ ছিলেন। কলঙ্কভঞ্জনে হরি-বৈদ্যের আত্মপরিচয় শ্লেষাঢ্যতায় শ্রীমন্তের মশানে জরতী ভগবতীর ও গাঙ্গিনীতীরে অন্নদার আত্মপরিচয়ের কথা মনে পড়ায়।

ভক্তিগর্ভ রচনাতেও দাশু রঙ্গরসিকতার সমাবেশ করিতেন। ভক্তিধর্ম্ম প্রচার ইহাতেই সরস সাহিত্য হইয়া উঠিত,—শিক্ষার সহিত অনাবিল আনন্দের সংযোগ ঘটিত। সাধারণ লোককে আনন্দের উৎকোচ না দিলে ধর্ম্মের কথাই বা শুনিবে কেন? এদেশে ধামালি বা রসকলহের মধ্য দিয়া রঙ্গরস পরিবেষণ করা হইত। দাশুও তাহাই করিয়াছেন। কৃষ্ণ-রাধার, হরগৌরীর, বৃন্দা-কৃষ্ণের, গঙ্গা-গৌরীর, হনুমান-গরুড়ের রসকলহগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙ্গ-রসিকতা মাঝে মাঝে শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে—তবে তাহা পৌরাণিক পালায় নয়, প্রাকৃত-বিষয়ক পালায়। দাশুর রচনায় অশ্লীলতার চেয়ে

গ্রাম্যতাই বেশি। তবে যে সকল পালা গ্রাম্য লোকদের জন্য রচিত হইত, সেই গুলিতেই গ্রাম্যতা-দোষ থাকিত। এই সব পালার নাগরিক সংস্করণও থাকিত,—তাহাতে এই দোষ বৰ্জ্জিত হইত।

কবির গানের তুলনায় দাশুর পাঁচালির ভাষণ অনেকটা মাৰ্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। ছন্দোবন্ধে পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতাও পাঁচালিগানে কবির গানের চেয়ে বেশি। কবির গানের মিলের দৈন্য পাঁচালিতে নাই।

দাশুর বৃন্দাবন, মথুরা, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, কৈলাস বাংলারই মাঠ, ঘাট, ক্ষেত-খামার, চণ্ডীমণ্ডপ, ঘরসংসার। রস-কলহের ক্ষেত্রে পৌরাণিক নরনারীরা কাটোয়া মহকুমার নরনারীতে পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবন আমাদের গোয়লাপাড়ায় এবং নন্দযশোদা গোয়ালসৰ্দ্দার ও সৰ্দ্দারণীর রূপ ধরিয়াছে। যশোদা নন্দকে বলিয়াছেন—'ভেতের স্বভাব হ'লেও নবাব যায় না'। শুকসারীর দ্বন্দ্বে যেমন চিরদিন শুকেরই পরাজয় হয়। দাশুর রসকলহে সব ক্ষেত্রেই পুরুষের পরাজয় হইয়াছে। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কলহ কালোরূপ লইয়া, তাহাতেও কৃষ্ণের পরাজয়। অক্রূরসংবাদের মতন করুণ ব্যাপারটাকেও দাশু রঙ্গরসিকতায় নবরূপ দিয়াছেন। কবি রাজপুরুষ অক্রূরকে নামাবলীধারী জটামণ্ডিতমুণ্ড বৈষ্ণব বানাইয়াছেন, আর ব্রজগোপীরা ফারসীমিশ্রিত আদালতী ভাষায় তাঁহার সঙ্গে কলহ বাধাইয়াছে। রুক্মিণীর সঙ্গে সত্যভামার দ্বন্দ্ব কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ীর একটা দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

দাশুর রচনায় সুন্দর রূপের বর্ণনা নাই—বরং রূপবর্ণনার পদ্ধতির নিন্দা আছে। গুণবর্ণনা অবশ্যই আছে। তবে তাহাতে দাশু তেমন রস জমাইতে পারেন নাই—দোষ বর্ণনাতেই তিনি রস জমাইয়াছেন। দাশুর পাঁচালির অনেকাংশই বিদূষণ-সাহিত্য। দাশু উৎসাহের সহিত

কৃপণ, কলি, পুরুত, গণক, হাতুড়ে বৈদ্য, কুলীন ব্রাহ্মণ, ফলারিয়া ব্রাহ্মণ ,নেড়ানেড়ী, তরুণী, ভণ্ড, কর্ত্তাভজা ইত্যাদির দোষ বর্ণনা করিয়াছেন।

কবির রচনার অনেকাংশ কেবল তালিকা। তবে এই তালিকা দৃষ্টান্তের মালিকা। ইহাতে কবির মানবচরিত্রের ও লৌকিক জীবনের অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ইহা উৎকৃষ্টের বদলে অপকৃষ্টকে আদর করার দৃষ্টান্ত—

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষেন কাক।
ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব ইতুপূজায় ঢাক।
ফেলে হীরে বাঁধেন জিরে সোনা বাইরে আঁচলে গিরে
ঘোড়া ফেলে জয় পতাকা রাম ছাগলের শিরে।
ডুবিয়ে জাহাজ ডোঙায় চড়া জিলিপি ফেলে তালের বড়া
অরগ্যানেতে মন তুলেনা মন ভুলালো শিঙে।
আম কদলী ফেলে ধূলোয় ডালায় ভরেন ঝিঙে।

দাশু রচনায় যমকের জমক খুব বেশি—যেমন—

ললিতে তোর স্ববাসনা পূরাইবেন শবাসনা।
নৃত্য করেন নিত্যগোপাল গোষ্ঠে লয়ে নিত্য গো-পাল।

যমকের বাড়াবাড়ি ও আছে—

নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ,
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা।

উৎকৃষ্ট মিল ও অনুপ্রাসের চাতুর্য্য-প্রায় সমস্ত রচনাতেই অনুস্যূত। যেমন—হরি বলেছেন নিজমুখে ভোজন আমার দ্বিজমুখে

গোকুলে গোপ পরিবারে হরি যান কাল হরিবারে।
আনি তার দুগ্ধ কাড়ি কয় কোথা যাও দুগ্ধ রাঁড়ী।

দাশুর রচনায় শ্লেষ ও বক্রোক্তিও প্রচুর—'ধনি, আমি কেবল নিদানে'—গানটি শ্লেষের চমৎকার নিদর্শন।

কুটিলার নিম্নলিখিত উক্তি দ্ব্যর্থক ব্যঙ্গোক্তি।

সে পথে-বা চল্লি কই ঐহিকের সুখ কল্লি কই
নন্দসুতের ক'রে আরাধনা
ঘুচালি ঐহিক পরমার্থ দিন কতক সুখ হ'তে পার্‌ত
পাত্র বুঝে কর্‌লে বিবেচনা।

যে সকল ছন্দ আজকাল চলে তাহার অনেকগুলিরই নিদর্শন পাওয়া যায় দাশুর রচনায়। দাশুর পয়ারের নমুনা এই—

এমন দরিদ্রনারী ছিল ক্ষুধাভরে। নিঙ্গুড়ে খেয়েছে সুধা শ্যামসুধাকরে॥
চলে যেতে পায়ে লাগে পড়িতেছ ভূমে। কেন উঠে কালাচাঁদ এলে কাঁচা ঘুমে।

যুক্তাক্ষরবর্জিত লঘু ত্রিপদীই দাশুর রচনায় পাওয়া যায় বহু স্থলে।

যদি—না কর শ্রবণ না যাও সে বন না দেখাও বনমালী।
তবে—কি কাজ ভবনে কি কাজ জীবনে জীবনে জীবন ঢালি।
হরি—জীবন ছলনা চল না চল না তবে গো জীবন থাকে।
সখি—চল লো সে বন সে পদসেবন করিগে মনের সুখে।

দাশুর ছড়ার ছন্দে দৃষ্টান্তগুলি লোকের মুখস্থ হইয়া যাইত। যেমন—

বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল,
মহাজনকে খাতক বৈশাখী রোদ চাতক।

ধামালী বা ছড়ার ছন্দের পয়ার দাশুর হাতে কী রূপ ধরিত তাহার নিদর্শন—

কিযে—রূপের ছিরি আহা মরি ভ্রমর বরং ভালো॥
নব—কাদম্বিনী বরণ জিনি এমনি আঁধার কালো॥
তখন—মিষ্ট বোলে কৃষ্ণ বলে কংসেরে না ডরি।
আমার—কি দোষ পেয়ে রুষ্টা হয়ে ভৎ‌র্সলো সুন্দরি।

ধামালী বা ছড়ার ছন্দের (১ম পাদকে একমাত্রা কম) যে স্তবকরূপ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় দেখা যায়—দাশুরায়ের রচনায় তাহারই প্রাধান্য বেশি।

যাদের সব টেড়িকাটা ইষ্টকিনে দু'পা আঁটা
রঙটা কটা মেজাজ চটা তাদের কর উপাসনা।
যদি পাও বঙ্গদেশী লাভালাভ হবে বেশি
করলে দর কষাকষি মিলবে তবেই রূপা সোনা॥

পদাংশমাত্রা ও অক্ষরমাত্রার মিলিত দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপে—সকল চরণে মাত্রাসংখ্যা সমান নাই। আবৃত্তিকালে ফাঁক থাকিলে সুরে ভরিয়া লওয়া হইত—মাত্রাধিক্য থাকিলে জলদ উচ্চারণে সুর ঠিক রাখা হইত। ইহাই হইল পাঁচালীর আসল ছন্দ।

হরি ডাকিছেন কুবুজায় কুবুজাকে তা কু কুঝায়
ব্যঙ্গ কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে।
মনের দুঃখে একাকী যায় বসনে মুখ ঢাকি
একবার দেখে না সে মুখ তুলে॥
বলিছে কত দুঃখ পেয়ে ওরে ছোঁড়ারা অলপ্পেয়ে
তোদের জ্বালায় কি করি তাই বল।
জলে যাব কি খাব বিষ তাই করিব যা বলিস্
এ পথে আর হয় না চলাচল।

দাশুর—ঐ দেখ—আসছে আয়ান বংশীবয়ান বনমাঝে,
বিপদে—যায় যে জীবন মধুসূদন তোমায় ভ'জে—এই ছন্দ আর
রবীন্দ্রনাথের—আর—নাইরে বেলা নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে।
এখন—চল্‌রে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে॥—গানের ছন্দ এক।

স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রাকৃত ছন্দের অনুসরণে দাশু, গোবিন্দ দাস জগদানন্দের মত স্তবকবদ্ধ ত্রিপদীও রচনা করিয়াছেন—

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দন্তিতা ধনী মুখ করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।
দিগ্বসনী চন্দ্র ভাল আলুলিয়ে পড়ে কেশজাল
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরিনন্দিনী॥

বাউল-সঙ্গীত

বাউলদের জিজ্ঞাসা করিয়াও ঠিক কি তাহাদের সাধনবস্তু তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় না। হয় তাঁহাদের ভাষা নাই অপরকে বুঝাইবার, নয়ত তাঁহারা সাধনভজনের গূঢ় কথা অপরকে বলিতে চান না। বাউলরা আমাদের সমাজ, সংসার, শাস্ত্র, ঐতিহ্য বেশভূষা সবই ত্যাগ করিয়াছেন ; সেই সঙ্গে আমাদের চিরপ্রচলিত ভাষাও ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষাই আলাদা। শব্দগুলি খাঁটি বাংলাই বটে, কিন্তু সে শব্দগুলির বিন্যাস যতটা ভাবপ্রকাশ করে, তাহার চেয়ে ভাব গোপন করে অনেক বেশি। ভাষার ঐরূপ বিন্যাস, হেঁয়ালি, রূপক ইত্যাদির আবরণ, ব্যঞ্জনাগর্ভ পদপ্রয়োগ ইত্যাদি হইতে ঠারে ঠোরে কতকটা বুঝিয়া লইতে হয়। রূপক ও ব্যঞ্জনা, রসের ইঙ্গিত, বক্তব্যের আধনগ্নতা, আধমগ্নতা ইত্যাদি সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে বলিয়া বাউলের গান এক শ্রেণীর সাহিত্য।

বাউলরা রাগাবেশের সাধনা কবেন, এবং রাগাত্মিক সঙ্গীতই তাঁহাদের সাধনভজনের অঙ্গ—সেজন্য বাউলের গান মিষ্টিক সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্র অপেক্ষা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাউলের দান অনেক বেশি। ভারতীয় সঙ্গীতে বাউলের সুর বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট দান। ভাব অপেক্ষা সুরের মিষ্টিসিজ্‌মই বেশি।

বাউলিয়া সাধনার মূলসূত্র হয়ত আদিকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে। কারণ, ইহা মানুষের পক্ষে সহজধর্ম্মসাধনা। আচার্য্য

ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী-ত বেদ হইতেই এই অবৈদিক ধর্ম্মসাধনার সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাংলায় যে বাউলসাধনার ধারা পরিণতি লাভ করিয়াছে—তাহাতে বহু ধর্ম্মমতের গৈরিক রূপ বাউলের পলিমাটির অঙ্গীভূত হইয়াছে।

জলের উপরে যাহা কিছু আসিয়া মিশে তাহার সারাংশ তলায় গিয়া জমা হয়। আমাদের দেশে যে সব ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির সবই সমাজের নিম্নস্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। সেই সমস্তই সমাজ-তড়াগের নিম্নতলের পঙ্কে গিয়া মিশিয়াছে—সেই পঙ্ক হইতে বাউলিয়া ভাবের শতদল যেন জলের উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই শতদলকে একাধিক তত্ত্বের প্রতীক মনে করা যাইতে পারে।

বাউলধর্ম্মমত বৈদিক বর্ণাশ্রমী ধর্ম্মমতের বিরোধী। এদেশে বেদবিরোধী যে কতকগুলি ধর্ম্মমতের আবির্ভাব হইয়াছে, সবগুলির কোন-না-কোন অঙ্গ বাউল সাধনার মধ্যে পাওয়া যায়।

অবৈদিক ধর্ম্মগুলির একটি সাধারণ অঙ্গ সর্ব্বসংস্কারমুক্তি। সমাজ, সংসার, শাস্ত্র, লৌকিকতা ইত্যাদির সমস্ত শাসনবন্ধন হইতে মুক্তিই ধর্ম্মসাধনার প্রাথমিক স্তর। বাউলরা কোন শাসনবন্ধনই মানে না। সংস্কারের বন্ধনের ফলেই মানুষের যত মায়া, মোহ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, রোষ, অহঙ্কার ও ভোগবাসনা। সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তিই আসল সন্ন্যাস, ইহাই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায় এবং চরম মুক্তিসাধনার পূর্ব্ব কাণ্ড।

বাউলদের দেহ লইয়াই সাধনা, সেজন্য দেহকে যতদিন সম্ভব বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন তাহারা স্বীকার করে। এজন্য তাহারা লোকালয় হইতে বেশি দূরে যায় না। বনে পাহাড়েত মাধুকরী মিলিবে না। তাহা ছাড়া, দীর্ঘায়ু লাভের জন্য কায়সাধনও করিতে

হইবে। এই কায়সাধন একপ্রকারের যোগসাধন। এমন কি এই যোগসাধনের জন্যই ইহাদের নাম 'বায়ুল', একথাও কেহ কেহ বলেন। 'বায়ু' অর্থে নাসার শ্বাসপ্রশ্বাস। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ধারাকে নিয়মিত করে বলিয়াই এইরূপ যোগসাধনার 'বায়ুল' বা বাউল নাম হইয়াছে।

বাউলরা প্রেমপথের সাধক। প্রেম সাধনার জন্য-ত যোগের প্রয়োজন নাই, দীর্ঘায়ুলাভের জন্যই এই যোগসাধন। দীর্ঘায়ু লাভের প্রচলিত উপায়গুলি সর্ব্বত্যাগী বাউলদের হয় অবিদিত, নয় অসম্যক্ বলিয়া বিবেচিত, সেইজন্য যোগসাধনের দ্বারাই যতদূর সম্ভব জরা, পীড়া ইত্যাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করা হয়।

বাউলদের সাধনা প্রেমের সাধনা। এই প্রেম কাহার প্রতি? ভগবানের প্রতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ভগবান কোথায়? সে ভগবান বিশ্বে ব্যাপ্ত নয়, বিশ্বের বাহিরে নয়, তীর্থে নয়, মন্দিরে নয়, সে ভগবান মানুষের মধ্যে। সহজিয়াদের মত বাউলরাও বলে—

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

এ মানুষ বলিতে বুঝায়—মনের মানুষ। বাউলরা বলেন,—এই মনের মানুষ বিরাজমান এই মানবদেহেই, মানুষে তিনিই উপাস্য, মানবদেহই পরম সত্য। কারণ, এই মানবদেহেই রক্তমাংসের অতীত চিদানন্দময় নিত্য সত্য অধিষ্ঠান করিতেছেন।

"কারে বল্‌ব কে করবে বা প্রত্যয়!
আছে—এই মানুষে নিত্য সত্য চিদানন্দময়।"
"যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস এই দেহে সে রয়।"

ইষ্টধনকে বিশ্বেশ্বর বানাইয়া, তাহাকে দেবতার রূপ দিয়া তাহার সঙ্গেও প্রেম হয় না। মাটি, পাথর বা কাঠের তৈরী

দেবমূর্ত্তির সঙ্গেও প্রেম হয় না। মানুষের সঙ্গেই প্রেম সম্ভব। যে মানুষ দেহের বাহিরে—তাহার চেয়ে যে মানুষ দেহের মধ্যে সেইত অন্তরঙ্গ বেশি। সেইত আমার মধ্যে ভগবান—অন্যের মধ্যেও সে-ই আমার ইষ্টধন, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, সেই ত আসল মনের মানুষ। তাহার সঙ্গেই প্রেমই ধর্ম্ম সাধনা।

নিজের দেহটার প্রতি এ প্রেম নয়। এই দৈহিক জীবনটাই মন্দির। দেহ যদি মন্দির হয়, মন তবে বেদী, মন্দিরকে শুচিসুন্দর রাখিতে হয়, সে জন্য প্রয়োজন দেহমনকে পবিত্র ও নিষ্পাপ রাখা। মন্দিরের মেরামতের প্রয়োজন, সে জন্য চাই কায়সাধন।

এই কায়সাধন ব্যাপারেই বাউলসাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ করিয়া নাথযোগীদের সাধনার সংযোগ। বাউলের প্রেম নিষ্কাম, কামনাবিরহিত অর্থেও বটে, ঐন্দ্রয়িক-স্পর্শশূন্য অর্থেও বটে। বাউলের প্রেমের পাত্র—দেহের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামী মনের মানুষ। তাহার সঙ্গে প্রণয়ে কামভাব থাকিতে পারেনা। ইহাত কিশোরীভজন নয়—বা কামিনীর মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান নয়, যে কামভাব আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে! বাউলের আকাঙ্ক্ষার বস্তুও কিছু নাই। যে সাধ করিয়া সব আকাঙ্ক্ষার ধন ত্যাগ করিয়াছে—তাহার আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকিবে? বাউল মনের মানুষের সঙ্গে অহৈতুক প্রেমের মধ্যে জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়।

ইহাদের ধর্ম্ম সকল জীবের চিরদুঃখবরণ। বাউলের কাছে সকল জীবের মধ্যেই মনের মানুষ বর্ত্তমান।

"জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার।"

তবে ত জীবসেবাই বাউলের ধর্ম্ম হইবার কথা। বাউলের ধর্ম্ম জীবের দুঃখ হরণ বটে; কিন্তু পথ অন্যরূপ—বুদ্ধদেব কিংবা বিবেকানন্দের

প্রদর্শিত পথ নয়। বাউল বলিবে—"সর্ব্বজীবের মধ্যেই যিনি বর্ত্তমান,—যিনি আমার মধ্যে মনের মানুষের রূপে অধিষ্ঠিত, তাঁহারই সেবা করি প্রেম দিয়া। আমার এই সেবাসাধনাতেই অচ্যুত পরমাত্মা তৃপ্ত হইয়া জীবের দুঃখ দূর করিবেন। আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে কতটুকু দুঃখ হরণ করিতে পারি! সর্ব্বজীবের দুঃখ বরণ করিয়া তাঁহায় প্রেমেই সমূলে দুঃখ হরণ করিতে পারি।" এ যেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের সেই কথা।

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন—তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

তরুর স্কন্ধ, ভুজ, শাখা, উপশাখাকে সুস্থ সবল করিতে হইলে ঐ গুলিতে জল ঢালিতে হয় না, জল ঢালিতে হয় মূলে—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি বাড়াইতে হইলে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পুষ্টি সাধন চলে না—প্রাণশক্তিকেই বর্দ্ধন করিতে হয়। বাউলের ধর্ম্মসাধন জীবতরুর মূলে রসসেচন—বাউলের সাধনায় সর্ব্ব জীবেরই কল্যাণ হয়।

বাউলের ধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম। যে চিন্ময় মানুষটি আত্মারূপে দেহের মধ্যে বিরাজমান, তিনি জন্ম হইতেই নিত্য সঙ্গী হইয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই বাউলের পরিচালক, নিয়ন্তা ও আসল গুরু। অতএব বাউল বলিবে মাতৃগর্ভ হইতেই আমি দীক্ষালাভ করিয়াছি।

আমার যেদিন জনম সে দিন আমি দীক্ষা পেয়েছি।
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।

মাতৃক্ষীরের সঙ্গেই বাউলের সাধকজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাই হইল বীজমন্ত্র। সকল বীজের পক্ষেই অঙ্কুরিত হইয়া ফল-প্রসব করিয়া উদ্ভিদ্‌জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে বায়ু, জল, রৌদ্র, শিশির, মৃত্তিকার রস—অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এইগুলি বীজের পরিপোষক। সাধনবীজের পরিপোষকও অনেক।

পরিপোষকরাও একশ্রেণীর গুরু। এই হিসাবে বাউল বলেন—সাধনার ক্ষেত্রে গুরু অসংখ্য।

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি ওরে মন।
তোর—অতিথ গুরু পথিক গুরু ও তোর গুরু অগণন ॥
গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর মরণ জালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা—যে ঝরায় দুনয়ন ॥

বাউল বলে—দীক্ষা সহজ অর্থাৎ জন্ম হইতেই পাওয়া, কিন্তু এই ইহজীবন দীক্ষার সাধনাভূমি—এই বিশ্বসংসার শিক্ষার ক্ষেত্র। দীক্ষাগুরু একজনই বটে, কিন্তু শিক্ষাগুরুর কি অন্ত আছে ?

প্রেমধর্ম্ম নূতন বস্তু নয়। প্রেমাস্পদের ধারণা সম্বন্ধে বাউলদের রচিত গীতগুলির ভাষাভঙ্গী ও সুরে। বৈশিষ্ট্য আছে বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে এ সুরের মিল নাই—ভাষারও মিল নাই। * বরং বৌদ্ধ চর্য্যাপদের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে ইহার কিছু কিছু মিল আছে। বাউলদের দেহতত্ত্ব যোগসাধনতত্ত্বের গানগুলির রচনাভঙ্গীর সঙ্গে শাক্তপদাবলীর এক শ্রেণীর পদের কিছু সাদৃশ্য আছে। কায়সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে রচিত গীতিগুলিতে তত্ত্বকথা ও রূপকের বাহুল্য, ভাষাও সাংকেতিক, সেজন্য সাহিত্যাংশে সেগুলি উৎকৃষ্ট নয়। যে গানগুলিতে মনের মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগ ও আর্ত্তি প্রকট হইয়াছে—সেইগুলি সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট। আত্মদেহস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার উপলব্ধি ও তাঁহার সহিত মিলনানন্দে আত্মবিস্মরণ—ইহাই বাউলমতের দার্শনিকতা।

---

* শ্রীচৈতন্য হইতে শিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্য—স্বরূপ দামোদর—রূপগোস্বামী—রঘুনাথ দাস—কৃষ্ণদাস কবিরাজ—মুকুন্দদাস—তারপর মুকুন্দদাসের এক শিষ্য হইতে বাউলমতের ধারাবাহিকতা ও ক্রমোন্মেষ দেখানো যাইতে পারে।

এইবার ২।১টি বাউলের গান উদ্ধৃত করিয়া বাউলসাধনার আভাস দিই—

মঠমন্দির, তীর্থপরিষদ্. গুরু, মুরশিদ, কোরাণ, পুরাণ, বেদ, লোকাচার, শাস্ত্রশাসন ইত্যাদি সংস্কারের শাসন লইয়া সহজ পথে বাধার সৃষ্টি করে, এই কথা বাউল কবি নিম্নলিখিত গানে বলিয়াছেন।

তোমার—পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
ও তোর—ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই,
আমায়—রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে—অভেদ সাধন মরল যে ভেদে॥
ওরে—প্রেমদুয়ারে নানান তালা পুরাণ কোরাণ তস্‌বী মালা,
হায় গুরু এই বিষম জ্বালা কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে॥

শ্যামের বাঁশীর মত সাঁইএর (স্বামীর) বাঁশী আহ্বান করিতেছে—যেখানেই যতদূর আমরা যাই না কেন, সে বাঁশী শুনিতে পাই—কারণ, বাঁশী যে আমার ভিতরেই বাজিতেছে। আমরা কেবল বাহিরে বাজিতেছে মনে করিয়া কস্তুরী মৃগের মত বাহিরে গন্ধের উৎস খুঁজিয়া মরি। 'বাহিরের ধূলামাটি ছাড়িয়া প্রাণরসনায় অন্তরের সুধা উৎসের রস চাখিয়া দেখ। অন্তরে সাঁইএর বাঁশী বাজিতেছে, তাহাই বিশ্বজগতে ধ্বনিত হইতেছে' ইহা উপলব্ধি করিলে আর ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। বিশ্বও ত সাঁই ছাড়া নয়। ঐ বাঁশীর ধ্বনিতে বাহিরে রূপের ফুল, অন্তরে রসের ফুল ফুটিতেছে। এক সুতায় দুই শ্রেণীর ফুল গাঁথিয়া মাল্য রচনা করিতে না পারিলে সাঁইএর গলায় কি দুলাইবে?

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি,
প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখরে রসের সাঁই খাঁটি॥

রূপের রসের ফুল ফুট্যা যায় মর্ম্ম সুতা কই ?
বাইরে বাজে সাঁইএর বাঁশী আমি শুইন্যা আকুল হই।
আমার মিলনমালা হৈলনা রে আমি লাজে পথ হাঁটি।
আমি—চালি দূর আর দূর তবু—সমান শুনি সুর
কতদূর আর যাইবি বান্দা সবই সাঁইএর পুর।
আরে—যেই সমুদ্র সেই দরিয়া সেই ঘাটের ঘাঁটী।

সাধনার সার্থকতা বহুদিনের অধ্যবসায়ের ফল। পুষ্পের বিকাশের মত, আত্ম বিকাশ হয় ধীরে ধীরে জীবনের ভিতর বাহিরের আবেষ্টনীর প্রভাবে। কোন গুরু, শাস্ত্র বা যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহা সময় না হইলে মিলে না। অধীরতা আগুনের মত মুকুলিত অনুরাগকে ঝলসাইয়া দেয়।

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল, ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই ;
সে যুগ যুগান্ত ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।

আত্মোপলব্ধির জন্য মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য আরতি আকুতি আকুলতা পরিস্ফুট হইয়াছে এই গানটিতে—

আমি—কোথায় পাব তারে। আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে—সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥
লাগি যেই হৃদয় শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশী দেখ্‌তাম নয়ন ভ'রে॥
আমি—প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন ক'রে;
মরি হায়, হায় রে।
ও তার—বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে—দেখনা তোরা হৃদয় চিরে।

দিব তার তুলনা কি যার প্রেমে জগৎ সুখী.
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কে তায় দেখতে পারে।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে ॥
মরি হায় হায়রে।
ওসে—না জানি কি কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুলমান সব গেলরে তবু না পেলাম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে ॥
তাই ত মোরে দেয়না দেখা-সে রে।
ও তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন ভেবে মরে।
মরি হায় হায় রে ॥
ও সে—মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস্, কৃপা ক'রে
আমার সুহৃৎ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আমায় বলে দেরে।
(গগন হরকরা)*

আর একটী গানের অংশ—

ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশী আমি তোমার ফুঁক
ভালমন্দ রঙ্গে বাজি বাজি দুখ আর সুখ।
সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুৎ রাত,
ফাগুন বাজি শাঙণ বাজি তোমার মনের সাথ।

এই সব গান নেহাৎ অশিক্ষিত বাউলের লেখা বলিয়া মনে হয় না। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই কিছু অশিক্ষিত ছিল না। সুফীমতের সঙ্গে বাউল মতের মিলনে বাউলদের মধ্যে হিন্দুমুসলমান দুইএরই মিলন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মিলন হইয়াছে অনেক ধর্ম্মমতে। বাউলসম্প্রদায়ের মত এমন চমৎকার মিল আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাউলরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, ইঁহারা মানবধর্ম্মী। ইহারা যখন সর্ব্বসংস্কারমুক্ত, তখন মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকিবার কথা

নয়। আচার অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক সংস্কার ত্যাগ করিলে হিন্দুমুসলমানে শুধু কেন, কোন জাতির মানুষের সঙ্গেই তফাৎ থাকিতে পারে না। ইহাদের কাছে এ জগতে এক জাতিই আছে—তাহা মানুষ। সকল মানুষের মধ্যেই মনের মানুষ বিরাজ করিতেছেন, কোথাও তিনি সুপ্ত—কোথাও তন্দ্রিত—কোথাও প্রবুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বাউলের গানে উপনিষদের বাণী শুনিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে শুনিয়াছিলেন আসল মানবধর্ম্মের বাণী। তিনি প্রচলিত বাউলের সুরে অনেক গান রচনা করিয়াছেন—সেগুলি বাউলসঙ্গীত নয়। বরং তাঁহার কোন কোন—ভজনসঙ্গীতে বাউল ধর্ম্মমতের আভাস পাওয়া যায়। সব চেয়ে তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল, বাউল গানের মিষ্টি সুরটিই।

---

* বাউল কবিদের মধ্যে পাঁচু ফকির, সিরাজ সাই, মদন বাউল আবদুল্লা, আবদুর রহমান, জগা কৈবর্ত্ত, ঈশান যুগী, পদ্মলোচন, বিশা ভুঞিমালী মনোমোহন, লালন ফকির ও গগন হরকরার নাম প্রসিদ্ধ।